রবীন্দ্র-উপন্যাস ঃ এক কবির সন্ধানে

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ. ডি (বাংলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

উত্তীয় দে

তত্ত্বাবধায়ক ঃ ড. দিলীপ নাহা
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা-৭৩

NBU, DARJEELING · LIBRARY ·

বাংলা-বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং

২০০৭

Ref
80.37
উজ্জী/ রবী

216608
11 JUN 2009

STOCK TAKING - 2011

ভূমিকা

রবীন্দ্রসাহিত্যের ক্ষেত্রে গবেষণা করার একটা বড় গোলমাল আছে। শিল্পীর বহুবিচিত্র সৃষ্টির সম্ভার যেমন রয়েছে, তেমনি বহু গুণীজন সেই সৃষ্টি সম্ভারের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে বেড়িয়েছেন কখনো দেশি বিদেশি, আবার কখনো খন্ড খন্ড আয়োজনের মধ্যে দিয়ে। ফলত, বহুচর্চিত, বিশ্লষিত এই সাহিত্যসম্ভারের আলোচনাতে দ্বিধা ছিল। বোধ করি এই দ্বিধা থেকেই জন্ম হয়েছিল রবীন্দ্রমননের স্বরগ্রাম খোঁজার। শেকস্‌পীয়র সম্বন্ধে অভিযোগ, তাঁর অধিকাংশ নাটক কাব্যমিশ্রিত।ঠিক এখানটিতেই মনে হল, রবীন্দ্রনাথ আদপে কবি।তাঁর চিত্রকলায়, সংগীতে, প্রবন্ধে, ছোটগল্পে, চিঠিপত্রে সৃষ্টির বহু ক্ষেত্রেই প্রকরণ বা নির্মিতি যাই হোক না কেন নিঃশব্দে পাশটিতে দাঁড়িয়েছে এক কবি। উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেই দ্বিধা থেকে চলার পথ পেলাম খুঁজে।শুধুমাত্র প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে বা প্রকৃতির যেখানে চরিত্র হয়ে উঠেছে বা ঘটনার অনুষঙ্গ, সেখানেই ছোটগল্পের মতো কবিত্বের জগৎ অনুভূত হয়েছে তা নয়। এক ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে, সেই সলতে পাকানোর সময় থেকে কবিতার পালাবদলের পাশাপাশি পালাবদল ঘটেছে উপন্যাসে এবং তা কাব্যের শিকড় ধরে এগিয়ে চলেছে মাটির গভীরে। রবীন্দ্র-উপন্যাসকে চারটি পর্বে ভাগ ক'রে 'সৃষ্টির প্রথম পর্ব' যেখানে ইতিহাস এবং ইতিহাস থেকে উত্তরণে পথপরিভ্রমণ, পাশাপাশি ইতিহাস আশ্রয় অথবা স্বল্পাশ্রয়ে নতুন অভিমুখের বৈপ্লবিক পদসঞ্চার — সেখানে উপন্যাস-কবিতার বৃক্ষশাখে কবিত্বের কিশলয়ের জন্ম। দ্বিতীয়পর্বে অনুভূত জগৎ বিবর্তিত হল চরিত্রসৃজন, মনস্তত্ত্বের গহন রহস্য এবং নারীত্বের আত্মজিজ্ঞাসা নিয়ে — 'সংবেদন আত্মার প্রেক্ষিতে উপন্যাসের পালাবদল।' সেখানে চরিত্র যেন কাব্য নির্ঝরিণীর মতো কখনো ফুলে ফেঁপে শরীর-মনের পসারি, আবার কখনো সমাজের অনুশাসনে ডানা ঝাপটানো খাঁচার পাখি। ওই পথেই সৃষ্টি হল উপন্যাসের মহাকাব্য। মাঝে নৌকাডুবিতে কবিত্বের তরণী ডুবে গেলেও সোনারতরীর মাঝিটির প্রাণ যায়নি। নতুন সম্ভাবনায় যেন বুক বাঁধল। তৃতীয় পর্ব —'প্রস্তুতির পরিণতি'। সেখানে জন্ম নেয় সন্ধানী কবির পূর্ণ রূপ, ভাষা হয়ে ওঠে শাণিত, আগুনে সময়কে বুকে নিয়ে চরিত্রগুলিও বাস্তবোপযোগী। এখানে ঔপন্যাসিকের কাব্যায়োজনের আরতি-সন্ধ্যা। শেষপর্ব — 'আয়োজন শেষে নির্মিত ভিন্নরূপ'। আবার বৈচিত্র্য, আবার স্বাতন্ত্র্য, নারীস্বাধীনতার 'শেষের কবিতা'-র ওপার ('যোগাযোগ') আর এপার ('দুইবোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়')। কবি যখন রাজর্ষি ছিলেন তখন কাব্যের সূতিকাগারে রোম্যান্টিকতা গুরুত্ব পেয়েছে। পরবর্তিতে চোখের বালিতে কবিত্বের সৈকতে মুগ্ধ বিস্ময়ের মুক্তা বিন্দু চিকচিক করেছে। উপন্যাস-কবিতার পরিণতিতে ঘরকে বাইরে, বাইরেকে ঘরে এনে চতুরঙ্গের আয়োজন ঘটিয়েছেন। পরিণামে যোগাযোগ ঘটাতে চেয়েছেন শেষের কবিতাতে যেখানে কবিতার মালঞ্চ যেন রবীন্দ্র উপন্যাসের চার অধ্যায়।

এই সম্ভাবনার পথে জীবনানন্দ দাশ, জয় গোস্বামী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য — এরকম বহু লেখক-লেখিকা কথাকার হয়ে উঠেছেন, তাদের শৈল্পিক অভিজ্ঞানে রবীন্দ্র-উপন্যাসের কবি-আত্মা যেন এক বোধ হয়ে দেখা দিয়েছে। যে কারণে রবীন্দ্র-উপন্যাস নিয়ে বিরুদ্ধ সমালোচনা ছিল, সেই কারণটি তুচ্ছ হয়ে যেন এক নতুন শৈলীতে রবীন্দ্র-উপন্যাস সাম্প্রতিক হয়ে ধরা পড়ল।

এই গবেষণা কখনোই সম্ভব হত না আমার তত্ত্বধায়ক অধ্যাপক দিলীপ নাহা (প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ)-র উৎসাহ, তথ্য সরবরাহ, আলোচনা এবং পরিমার্জন সহায়তা না পেলে। আমি কৃতজ্ঞ আমার কলেজ (ইউনিভার্সিটি বি.টি. এন্ড ইভ্‌নিং কলেজ)-এর অধ্যক্ষ ড. মলয়রঞ্জন সরকারের কাছে ; গবেষণা কাজে সময় বের করে দেওয়ার জন্য। এছাড়া, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, সাহিত্য পরিষদ, নর্থবেঙ্গল ষ্টেট লাইব্রেরির কর্মীরাও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ঋণী সঙ্ঘমিত্রা সেন, অর্জুন ব্যানার্জীর কাছেও সহযোগিতায় কাজটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

উত্তীয় দে
ইউনিভার্সিটি বি.টি. এন্ড ইভ্‌নিংকলেজ
১৯/১১/২০০৭
কোচবিহার

রবীন্দ্র-উপন্যাস ঃ এক কবির সন্ধানে

সূচীপত্র

১/ আরম্ভের পূর্বে

২/ সাহিত্যের মূল কবি-আত্মার ঐশ্বর্য

৩/ কবি যখন ঔপন্যাসিক: প্রাক্-রবীন্দ্র/রবীন্দ্র-সমসাময়িক/রবীন্দ্র-উত্তর

৪/ সৃষ্টির প্রথম পর্ব : করুণা-বউ ঠাকুরাণীর হাট/ রাজর্ষি

[(ক) পূর্বাভাস
(খ) চরিত্র
(গ) প্রকৃতির রূপ-ভাষ্য (পরিবেশ)
(ঘ) অলংকার ও চিত্রকল্প সৃজন
(ঙ) ভাষার বন্ধন
(চ) প্লট নির্মিতি]

৫/ সংবেদন আত্মার প্রেক্ষিতে উপন্যাসের পালা বদল :
চোখের বালি-নৌকাডুবি-গোরা
[ঐ]

৬/ প্রস্তুতির পরিণতি : চতুরঙ্গ-ঘরে বাইরে
[ঐ]

৭/ আয়োজন শেষে নির্মিত ভিন্নরূপ :
যোগাযোগ-শেষের কবিতা-দুই বোন-মালঞ্চ-চার অধ্যায়
[ঐ]

৮/ পথের শেষ কোথায়

প্রথম 'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকের' বিস্তৃত সীমাহীন রাজত্বে পাড়ি জমিয়েছেন।

বঙ্কিম-চিহ্নিত পথে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় আবং শেষ রোমান্সধর্মী উপন্যাস 'রাজর্ষি'। অন্যান্য গ্রন্থের মতো জীবনের শেষ প্রান্তে রচিত 'সুচনা'-য় কবি একদা রাত্রিবেলা ট্রেনে যেতে যেতে একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 'এ আমার স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস' সৌভ্রাতৃত্বের অন্তেষ্টির ওপর ঔপন্যাসিক বিশ্বভ্রাতৃত্বে উপনীত হবার প্রয়াসী হয়েছেন। কবি জন্মগত অন্তর্মুখী প্রতিভা নিয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কবিত্ব নিঙড়ে দিয়েছেন পাত্রপাত্রী এবং ঘটনা সংস্থাপনে।

'নষ্টনীড়'-র সংসার অনভিজ্ঞ কলেজগামী দুই তরুণ-তরুণীর প্রেম-প্রেম খেলার ট্র্যাজিক পরিণতির পরিবর্তে 'চোখের বালি'-তে রৌদ্রদগ্ধ পরিণত বয়স্ক নরনারীর নগ্ন কামনা-বাসনার সর্বনাশা প্রতিচিত্র আরো অনেক বিস্তৃত পরিসরে রূপায়িত। 'চোখের বালি'-র সুর গোড়া থেকে কড়িতে বাঁধা, কাহিনি শীর্ষে উঠে রাগ-ভৈরবে পরিণত হয়েছে, অবশেষে সমে যখন নেমেছে, তখন মিলনে-বিচ্ছেদে তার অনুভূতিতে স্নিগ্ধ অমরাবতীর আমেজ। একই সময়ের লেখনীতে এত ভিন্ন ভিন্ন রূপকল্পের সৃষ্টি ক্ষমতা, এত ভিন্ন রীতির কলাকুশলতার উদ্ভাবন আমাদের বিস্মিত করে। কবি শেলীর কল্পনাঋদ্ধ এবং কৈশোরকালের কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি-অনুগত দেহজ কামনা-বাসনার উর্দ্ধে প্রেমিক যুগলের এই ব্যাখ্যান। সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলী সম্বন্ধে মহেন্দ্রের বিশেষ যোগাযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। ৪৫ পরিচ্ছেদের বিনোদিনীর কৃশ-পান্ডুর চেহারা দেখে তার সংস্কৃত কাব্যে 'মেঘদূতে'-র নায়িকার বিরহক্লিষ্ট অবয়বের কথা স্মরণ হয়ে থাকবে। বিশেষতঃ ৫১ পরিচ্ছেদের যমুনার তীরে আপরাহ্নের মনমাতানো সময়ে বৈষ্ণব মহাজনদের ব্রজের কুলকামিনীদের যমুনা পারাপারে পদগুলির কথা মনে পড়ে থাকবে। মহেন্দ্র বিশেষ করে স্মরণ করেছে ব্রজাঙ্গনার কথা, 'ওগো পার করো।' বিনোদিনীর স্বপ্ন-বিধুর মহেন্দ্র বৈষ্ণব কাব্যের নায়িকার ভূমিকায় এখানে অবতীর্ণ।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের শ্রেষ্ঠতম শিল্পকর্ম 'চোখের বালি', মহোত্তম 'গোরা'। আকৃতি-প্রকৃতিতে, ভাবকল্পনার ঐশ্বর্যে, শিল্পরূপ ও শিল্পকলার কুশলী প্রকরণ পদ্ধতিতে 'গোরা' আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে এক অনন্য সাধারণ সৃষ্টি। এর কাহিনি এমন উচ্চগ্রামে পরিকল্পিত এবং শীলিত শিল্পরূপে বিন্যস্ত যে স্বতঃই উপন্যাসটির মধ্যে বাচ্যাতিরিক্ত অভিব্যাঞ্জনার স্বাদগন্ধ আবিষ্কার করতে প্রলুব্ধ হয়ে ওঠেনি। ভাব-কল্পনায়, ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিতে, বিষয়-বিন্যাসে, সর্বোপরি জীবন সমালোচনায় এই পর্বের রচনাগুলি পূর্ববর্তী উপন্যাস থেকে একেবারে পৃথক। কবিকল্পনার এই সন্ধানী আলোই এক একটি তথ্য ও চরিত্রের মর্মোদ্ঘাটন করে। শুধু যে বর্ণনা বা ভাষার ব্যঞ্জনার মধ্যেই এই কবিধর্ম ব্যক্ত তা নয়, কবি ধর্মের দীপ্তিই উপন্যাসগত বিরলতথ্য ও সূক্ষ্ম রহস্যময় চরিত্রগুলিকে আলোকিত করে আমাদের বোধ ও বুদ্ধির গোচর করে। এই কবিকল্পনার দীপ্তি ও ঐশ্বর্যই উপন্যাসগুলির প্রধান আকর্ষণ। একান্ত বুদ্ধি-প্রাধান্যের সঙ্গে, কবি-কল্পানর এক অভিনব সমণ্বয় এই উপন্যাসগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের নানা জায়গায় নানা বর্ণনায় কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। সর্বত্রই এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, দুচারটি বাকামাত্র তার ফসল, অথচ এই সংক্ষিপ্ত আয়তনের মধ্যে সমস্ত রহস্য, সমস্ত সত্যটি যেন ঘনীভূত হয়ে আছে। কয়েকটি মাত্র বাক্যে দামিনীর যে বর্ণনা, একটিমাত্র পৃষ্ঠায় নারী হৃদয়ের অতল রহস্যের যে আভাস, দু-তিনটি অনুচ্ছেদে দামিনীর পরিবর্তনের যে ইঙ্গিত, কিঞ্চিদধিক এক পৃষ্ঠায় নীলকুঠির ভগ্নাবশেষের যে বর্ণনা, দুটি অনুচ্ছেদে বালুচরের বর্ণনা, দুটি পৃষ্ঠায় শচীশের গভীরতর সত্তার নিষ্পলক ধ্যানের যে ইঙ্গিত, ঝড়ের রাতের বর্ণনা, দামিনীর স্পর্শে শ্রীবিলাসের অন্তরের নুতন আস্বাদনের বর্ণনা — এইসব উদ্ধার করলেই তার রহস্যোদ্ঘাটন সম্ভব।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে বুদ্ধির দীপ্তি, রহস্যময় সঙ্কেত, এর রহস্য, সূত্রায়িত বর্ণনাভঙ্গি, এর জ্ঞান গর্ভ ইঙ্গিতময়, বিবৃতি, এর সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের ধারা, সর্বোপরি এর কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য একে বিশেষ এবং অভিনব সাহিত্য মূল্য দিয়েছে।

কবি-কল্পনার অতুলনীয় ঐশ্বর্য, epigram-এর দীপ্তিরচরম ক্ষুরধার তীক্ষ্নতায়, হ্রস্ব অথচ অর্থগৌরবপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতে ও ভাষণে, বিষয়গত ঐক্যবোধে, সর্বোপরি দৃঢ় সংহত সমগ্রতায় 'শেষের কবিতা'-র মত কাব্যোপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর রচিত হয়নি। লিরিক কল্পনার মধ্যে এবং স্বল্প প্রসার ও পরিধির মধ্যে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পরিবেশে নরনারীর প্রেমের স্বরূপ ও তার পরিণতির চিত্রণ, সেই চেষ্টা যে 'শেষের কবিতা'-য় সুন্দর ও সার্থকতা লাভ করেছে।

'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'মালঞ্চ', 'দুইবোন', 'চার অধ্যায়', উপন্যাসগুলির ভাবশিল্পে, চরিত্রগুনে, ভাষা, প্রকৃতি এবংউপস্থাপন রীতি রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মা স্বতন্ত্র পথ অন্বেষণে ব্যস্ত। 'যোগাযোগে'র কাহিনীকে তিনি নাটকীয় রূপ দিয়ে প্রকাশিত করেন, 'মালঞ্চ'-কেও নাট্যকৃত করেন তবে সে গ্রন্থ অপ্রকাশিত। 'চার-অধ্যায়' শিল্পরূপে প্রায় একটি নাটক, এর আখ্যান আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত নাটকীয়। তার গতি যেমন ক্ষিপ্র, তেমনি প্রায় পরিপূর্ণ কাহিনি সংলাপে বিন্যস্ত। রবীন্দ্র-নাটকে কাব্যময়তা স্বীকৃত-এর প্রচ্ছায়া দেখা যায় নাট্যময়-উপন্যাসগুলিতে।

'করুণা', 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি'-এই তিন উপন্যাসে প্রকৃতি ষোলকলায় তার মানবীরূপে অধিষ্ঠিত। যেমন গার্হস্থ উপন্যাসে 'করুণা', বা পরিচ্ছন্ন রোমান্স অপর দুটি — তিনেতেই প্রকৃতির শান্ত, সমবেদনা পূর্ণ রূপ একটু যেন বেশী কাব্যগন্ধী আধারে বিন্যস্ত। নায়িকা করুণা প্রকৃতি দুহিতা রূপে চিত্রিত। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার রোদন ভরা সংক্ষিপ্ত জীবনে যখনি সুযোগ পেয়েছে , সে প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। 'করুণা'-য় প্রকৃতি নায়িকার ব্যথার ব্যথীরূপে চিত্রিত, 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এ মানুষের সংবেদী প্রতিচিত্র হিসাবে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় ও তার জেষ্ঠ্যপুত্র উদয়াদিত্যের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই উপন্যাসে নিসর্গ চিত্র সর্বাপেক্ষা শিল্প সুন্দররূপে চিত্রিত বিভার মাধ্যমে, যেখানে রাজপ্রাসাদের বিশাল বাগানে অন্ধকার রাত্রে স্বামী সঙ্গ বিচ্ছিন্না এই নারীর অবদমিত সত্তা মূক প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাকে জীবন্ত করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্স্-আশ্রিত তৃতীয় এবং শেষ উপন্যাস 'নৌকাডুবি'-তে কয়েকটি প্রকৃতি চিত্র মূল্যবান। প্রথম সেই কুয়াশাচ্ছন্ন চাঁদনি রাত্রিতে 'নৌকাডুবি'-র চিত্ররূপ স্মরণীয়।

রবীন্দ্র-প্রকৃতি চিত্রের এই প্রসার ও গভীরতা, একটি মিস্টিক প্রত্যয়, মানুষের স্বপ্নকল্পনার ছবি প্রকৃতিতে আরোপ করে প্রকৃতি, মানুষ ও বিশ্বব্রহ্মান্ডের মধ্যে নিগূঢ় ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস রবীন্দ্র শিল্পরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ইংরাজী-অলঙ্কার শাস্ত্রে একে বলে Pethetic Fallacy বা পরিবৃত্তি। মানবীকৃত প্রকৃতির এ শিল্পরূপ আমরা রবীন্দ্র-উপন্যাসে বারবার পেয়েছি।

'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গে' 'সবুজপত্র' যুগের স্মারক চিহ্ন, আগের পর্যায়ের কলপনাসিক্ত শিল্পরূপের স্থূল নিসর্গচিত্র এখন থেকে বুদ্ধিদীপ্ত, সংক্ষিপ্তকায় এবং বহির্মুখীও। শিল্পরূপের অনেকাংশে রচনাশৈলীতে মস্তিষ্ক-প্রসূতউপমা-রূপক এপিগ্রাম ইত্যাদি অনুপ্রবেশের ফলশ্রুতি। যেমন 'কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ', বৃদ্ধ চন্দ্রনাথবাবুর 'অস্তোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্যের মতো তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ', 'বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জলভরা, আগুনভরা রাঙা মেঘের মতো' ইত্যাদি। সমস্ত প্লটের মূল রঙ্গমঞ্চ যেখানে রাজবাড়ির অন্তঃপুর ও বৈঠকখানা, সেখানে ঈশ্বর সৃষ্ট প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগের সুযোগ খুবই সীমিত। তবু শিল্পী মাঝে মাঝে যেখানে সুযোগ পেয়েছেন, তার স্মরণীয় সদ্ব্যবহারও করেছেন।

উপন্যাসের শিল্পরূপের বিশিষ্টতার কারণে কাহিনি, নাট্যরস এবং বর্ণনা একই উপন্যাসের পরিসরে পরস্পর-নিবদ্ধ। উপন্যাসের ভাষাও সেই বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষরে চিহ্নিত।

উপন্যাসের অনুজ্ঞা বহন করে কখনো তা কাব্যের মতো গভীরগামী কখনো বা মন্থর এবং গম্ভীর। উপন্যাসের ভাষা জীবনের বাস্তবতা এবং জীবনের কাব্য দুই-কে ধারণ করে। আর যেহেতু উপন্যাস যে কাব্যের সন্ধানী তা বাস্তবতার অতিরিক্ত কিছু নয়, লেখকের অভিজ্ঞতার নির্যাস মাত্র নয়, যেহেতু বাস্তবতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন কালেই উপন্যাস লেখক জীবনের কাব্যকে অধিগত করে থাকেন। স্কট সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে — Prose of life Hhw Poetry of life -কে নিজ উপন্যাসে বাধবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রত্যেক সার্থক ঔপন্যাসিক নিজ নিজ পন্থায় উপন্যাসের গদ্যকে এই আদর্শে গড়ে নিতে চান। যে কৌশলে তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতা মন্ময় রসে জারিত হয় সেই নির্মিতি রবীন্দ্রনাথের হাতে ছাড়া বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর কোথাও সাবলীল হয়ে দেখা দেয়নি।

'করুণা', 'বউ-ঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসের শব্দচিত্র, শব্দের প্রবহমানতা, শব্দরেখ কবিত্বের আয়োজনী শিল্পে ভরপুর। কয়েকটি উপন্যাসের বিচ্ছিন্ন সত্তাতে কবি-আত্মার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে হয়েছে। রবীন্দ্র-পূর্ব কবি-ঔপন্যাসিকগণ কাব্যের প্রকরণ সাজাতে উপন্যাসের রূপকে স্খলিত করেছেন। অথচ রবীন্দ্র-উত্তর যুগে জীবনানন্দ, সমরেশ মজুমদার, জয় গোস্বামী কবি ও ঔপন্যাসিকের কথা সাহিত্যে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে স্বীকরণে আধুনিক করে তুলেছে। রবীন্দ্র-উপন্যাসের গুরুত্ব স্বতন্ত্রতায় এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে প্রভাবে। যখনই রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের তিনটি পর্বে মাঝেমধ্যেই দীর্ঘসময়ে বিশ্রাম নিয়েছেন, তখনি শুধু উপন্যাসের রীতিভিন্নতা নয়, কবিত্বের বৈচিত্র্যেও ভিন্ন ভাবে প্রকাশ লাভ করেছে। সময়ে উত্তরণ, কবির কাল্পনিক মনের বিবর্তন, প্রতিবেশের প্রভাব কাব্যের অলি গলিতে পুঁজি বৃদ্ধি করেছে — যার প্রকাশ কথাসাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। আলোচনার উদ্দেশ্য রবীন্দ্র-উপন্যাস রাবীন্দ্রিক পরিমন্ডলে ধৃত, যেখানে এক নির্জন কবির কবি-আত্মা সাহিত্যাকাশে মুগ্ধ বিস্ময়ে মুক্তো ছড়িয়েছে।

সাহিত্যের মূল কবি-আত্মার ঐশ্বর্য

রবীন্দ্র সাহিত্যের বিস্তৃত পটে গবেষকরা বহুবার প্রাঞ্জল দৃষ্টিক্ষেপ করেছেন।এর মধ্যে উপন্যাস ব্যতিক্রম নয়।এমন কি পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, চরিত্র-নির্মিতি, গঠন-কৌশল, শৈলী, ইতিহাসের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে - সর্বত্রই রবীন্দ্র-উপন্যাস আলোচিত হয়েছে, বিশ্লেষণের প্রতিটি পরতে । রবীন্দ্র-সাহিত্যে সামগ্রিকতার ঐক্যে কোথায় যেন একটি কবিত্বের সুর ধ্বনিত হয়। এই কবিত্ব কোন বিচ্ছিন্ন সত্তা নয় - তাঁর আত্মাতে যুক্ত।অর্থাৎ মার্কস রাফেলের 'Slumbering Powers' এর সাহায্যে কোন কিছুর ''in accordance with the laws of beauty'' -র যে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন সেই Slumbering Power হল রবীন্দ্রনাথের কবি-আত্মা।রবীন্দ্র উপন্যাসেও সেই সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে - বিচিত্র রাগে। রবীন্দ্র মানস কর্ষণে এই সত্য উপলব্ধ হয় - পাশাপাশি রবীন্দ্র উপন্যাস নব-বৈচিত্র্যে ঐশ্বর্যশালিনী হয়ে ওঠে।

ভারতীয় আলঙ্কারিক ভট্টতৌত 'প্রতিভা' -কে বলেছিলেন 'প্রজ্ঞা নবনবোল্লেখশালিনী প্রতিভা মতা' আর অভিনব গুপ্ত বলেছিলেন 'প্রতিভা অপূর্ববস্ত নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'।অপূর্ব বস্তু নির্মাণ ক্ষমতা না থাকলে তাকে প্রতিভা বলা যায় না। এই 'প্রতিভা' কান্ট কথিত 'কল্পনা'-রই অনুরূপ 'innate mental aptitude through which nature gives the rule to art'। এই প্রতিভার স্পর্শে জন্ম নিল যে সাহিত্য বা শিল্পে তা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত নিয়মতন্ত্রের অধীন না হলেও নিজস্ব নিয়মে গঠিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'প্রতিভা'-র এই ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে দার্শনিক শিলিং বলেছিলেন, চেতন ও অবচেতনের, মুক্তি ও বন্ধনের, বুদ্ধি ও ভাবাবেগের দ্বন্দ্ববিরোধের অবসান ঘটিয়ে শিল্পকে রূপায়িত করার নামই প্রতিভা।তাঁর অন্তর্গত 'inconscious infinity' -কে শিল্পী শিল্পের 'finite' -এর মধ্যে ধরতে পারেন এই প্রতিভা-শক্তির দ্বারাই।কিন্তু 'finite' -এ রূপায়িত করা শুধু প্রেরণার দ্বারা সম্ভব নয়।তা সে অলৌকিক হলেও।এই জন্য প্রয়োজন হয়।রূপ নির্মাণ-সচেতনতা, চর্চা ও দক্ষতা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''আমরা যে মূর্তি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্মাণ করিতেছি, দেশে বিদেশে চিরকাল ধরিয়া অবিশ্রাম এই যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।''[১] নিজের অন্তরের অনুভূতি শিল্পকর্মের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে নিবেদন করা বা পাঠক সাধারণের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে অমরত্ব কামনা করা শিল্প সৃষ্টির পিছনকার প্রেরণা, রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যে প্রকাশ কামনার তাৎপর্য ধরা পড়েছে মনে হয়।বস্তুত যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভূতি থাকে লেখকের একান্ত অন্তর্গত ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরের জগতে তার কোন মূল্য থাকে না।কিন্তু যেই সেই ভাব প্রকাশিত হল তখনই একের বক্তব্য সত্য হয়ে উঠল অপরের কাছে।এখন অপরের কাছে উপস্থাপিত করার জন্যই প্রয়োজন হয় নানাবিধ কলা-কৌশল, আভাস, ইঙ্গিত ও অলঙ্কার।

কান্ট কল্পনাকে ভাগ করলেন (ক)Reproductive (খ)Productive (গ)Aesthetic -এই তিনভাগে।প্রথম শ্রেণীর কল্পনা হচ্ছে, কোলরিজ যাকে বলেছেন 'ফ্যান্সি' বাংলায় যাকে বলা হয় লঘুকল্পনা এবং রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'কল্পনিকতা'। দ্বিতীয় শ্রেণীর কল্পনা শক্তির সাহায্যে ইন্দ্রিয়বোধ থেকে জন্ম নেয় উপলব্ধি।চিন্তার জগতের সঙ্গে বস্তু জগতের সেতুবন্ধন রচিত হয় এই কল্পনার দ্বারাই।তৃতীয় শ্রেণীর কল্পনা শক্তি থেকে আসে অতীন্দ্রিয়তার বোধ ও সৌন্দর্যবোধ।যদিও কাব্যের জগৎ সৌন্দর্য ও আনন্দের জগৎ তবু যে শক্তির সাহায্যে বিচিত্রের সন্নিবেশ ও নতুনের রূপ-নির্মাণ ঘটছে সেই 'কল্পনা'-র প্রতিটি ভাগই শিল্প-সাহিত্যে কম-বেশি মূল্যবান।কান্ট

'বাস্তব' শব্দটিকে গ্রহন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - 'বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলাপোকার মতো তাহার অন্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে ' ।[২] এবং অন্যত্র : 'য়ুরোপীয় সাহিত্যে কোথাও কোথাও দেখিতে পাই, মানবচরিত্রের দীনতা ও জঘন্যতাকেই বাস্তবিকতা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে' ।[৩]

'মনের পরশ' ছাড়া সাহিত্য হয় না ; রোম্যান্টিক সাহিত্য নয়, বাস্তববাদী সাহিত্যও নয়।কোন অবস্থাতেই কোন শিল্পীর পক্ষে তাঁর 'মন' বা 'রুচি' বিসর্জন দেওয়া সম্ভব নয় বা উচিৎ নয়।শিল্পী, তিনি যে-পদ্ধতিই অবলম্বন করুন না কেন, বস্তুজগৎ থেকে বিষয় গ্রহণ করেন মনের নির্বাচন দক্ষতা দিয়ে, এবং তাকে যখন শিল্পমূর্তিতে স্পষ্ট করে তোলেন তখনও 'মন'ই তাঁর প্রধান সহায়।অর্থাৎ উপাদান ও রূপায়ণের পার্থক্য ছাড়া শিল্পসৃষ্টির মূল রহস্য সমস্ত মতবাদীর ক্ষেত্রেই অভিন্ন।জগতের উপর মনের কারখানা।মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা এবং সাহিত্যের সৃষ্টি উপর তলা থেকে, রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বাস্তববাদীদের ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য।শুধু বিষয়ের গুণে কেউ শিল্পী নন, 'দৃষ্টি' ও 'সৃষ্টি' এই দুই মিলে তবে একজন শিল্পী।

রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত রোম্যান্টিক।কিন্তু রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথ জীবনের গোড়ার দিকে সাহিত্যে কোনরকম বাস্তবতার অনুপ্রবেশকে সহ্য করতে না পারলেও পরবর্তীকালে শুধু আপত্তি তুলেছিলেন বাস্তবের নামে জঘন্যতার আমদানির বিরুদ্ধে। তাই জীবনের শেষ - দিকে তরুণদের অনেকের , সকলের নয় , সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন।নিজে 'রক্তকরবী' ও 'রথের রশি'তে বাস্তবজীবন সমস্যার রূপ দিয়েছেন, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপের মতো এবং 'যোগাযোগে' মধুসূদনের মতো বাস্তব চরিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্ত , যেহেতু রবীন্দ্রনাথ , টলস্টয় এবং ভিক্টোরীয় যুগের ডিকেন্স ও ব্রন্টির মতো মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় বিশ্বাস করতেন তাই 'রক্তকরবী'-তে যক্ষপুরীর বঞ্চিত মানুষগুলিকে একটি বিরুদ্ধশক্তি হিসেবে না দেখিয়ে রাজারই ভিতর থেকে জাত ভূমিকম্পে তাঁর আত্মার জাগরণ দেখিয়েছেন।

কবির মন দূরপ্রসারী, শান্ত ও অনন্তের মধ্যে , ঘরের মাটির প্রদীপ ও আকাশের তারার মধ্যে মিলন ঘটানো তাঁর সাধনা।বস্তুগত তথ্যকে অতিক্রম করে কবির প্রবণতা ভাবসত্য প্রতিষ্ঠার দিকে, এই মনোভঙ্গি সার্থক কথাসাহিত্যিকের পথে অন্তরায়।রবীন্দ্রনাথ এর ব্যতিক্রমী শিল্পী।কবিমনটিকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি।তাঁর তত্ত্বনাটকগুলি বিশ্ববন্দিত। কিন্তু সেগুলি যতখানি নাটক, ততখানি কাব্য।রবীন্দ্র-কথাসহিত্যেও কবিমানসের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।উপন্যাস সাহিত্যের আধুনিক শ্রেণী।উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে কবির স্থান সঙ্কীর্ণ।জগৎ ও জীবনের জটিলতা এবং দ্রুত গতি থেকে আধুনিক সভ্যতার লীলাবৈচিত্র্যের ভিতর এর উন্মেষ।কবি রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন স্থান গ্রহণ করেছেন।সেক্ষেত্রে কথাসাহিত্যিক হয়তো বাঙালীর স্বাভাবিক বৈচিত্র্য-হীন জীবনের আকস্মিক উদ্বেল মুহূর্তগুলিকে বেছে নিয়ে কবিমনের আলোকে উজ্জ্বল করে বিচিত্রিত করেছেন।উপন্যাসের বাস্তব প্রধান পটভূমিতে কবি-আত্মা উদ্ভাসিত থেকে বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের সার্থক সমন্বয় সাধন করেছে।রবীন্দ্র-উপন্যাসে কবি-আত্মার প্রাধান্য অনেক সমালোচককে বিবৃত করেছিল।তাঁদের মতে , রবীন্দ্র-উপন্যাস প্রকরণ অথবা বিষয়ে বা কৌশলগুণে যথার্থ উপন্যাস হয়ে উঠতে পারে নি। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ যে ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে ঘটেছিল তার সামগ্রীতে এক কবির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।শিল্প বিচারে চিরাচরিত যথার্থ অথবা জ্যামিতিক মানদন্ড একমাত্র নয়, 'অন্তরে সত্য' অথবা 'ভাবের প্রকাশ' শিল্প - এষণাতে নতুন প্রকরণ সৃষ্টি করে।প্রবন্ধ, পত্রসাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি প্রতিটি স্তরেই রবীন্দ্র-ঈষিকা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে।যে সমালোচকেরা রবীন্দ্র-উপন্যাসের স্খলন প্রত্যক্ষ করেছেন কাব্যভাবের কারণে - প্রসঙ্গত : সেই কবিমানসিকতা উপন্যাসের ভিন্ন শ্রেণী নির্দিষ্ট করে এবং কবিত্বের ঐশীশক্তিকে উপন্যাসের বস্তুময়তায় একাত্ম ক'রে দিয়ে তার নান্দনিক দিকটিকে তুলে ধরেছে।বিষয়ের উপস্থাপন, চরিত্র-নির্মিতি, ভাষাপ্রাণ,

রসাস্বাদনে সুবিধা অনুসারে কখনো ক্লাসিক, কখনো রোমান্টিক, আবার কখনো বা নিজস্ব মিশ্র পদ্ধতির আশ্রয়
নিয়ে লেখকের চিত্তবৃত্তির ভাবসম্পদ, তাঁর শিল্প-কর্মের অভিব্যঞ্জনা সাধারণ্যে সংক্রান্ত করা হয়েছে।ঠিক এমনিভাবেই আলোচ্যবস্তুর শিল্পরূপ ও শিল্পরীতির দারিদ্য, তার সার্বিক কৌশলের অক্ষমতা সমান নিরাসক্ত মনে প্রকাশ করেছি এবং উভয়বিধ কর্ম সুসম্পন্ন করা হয়েছে খন্ডাংশের বিশ্লেষণ নয়, অখন্ড রসবস্তুর বস্তুনিষ্ঠ সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে।অবশ্য বিশ্লেষণমুক্ত সংশ্লেষণ প্রায় অসম্ভব, তবে বিশ্লেষণ হয়েছে সংশ্লেষণ পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে।রবীন্দ্রনাথ ''সাহিত্য-বিচার'' প্রবন্ধে বলেছেন, ''সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, সাহিত্যের বিশ্লেষণ নয়।'' 'করুণা' থেকে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত রবীন্দ্র-উপন্যাস : এক কবির সন্ধানে পর্যালোচনাতে উক্ত কথা স্মরণযোগ্য।'করুণা', 'বউ ঠাকুরাণীর হাট','রাজর্ষি'- ইতিহাস রোমান্সধর্মী উপন্যাসে কবিত্ব।এরপর ষোল বছরের উপন্যাস বিরতি।এই নিরবতা কবি-আত্মাকে পরিবর্তিত, পরিশুদ্ধ করে 'চোখেরবালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা' উপন্যাস ত্রয়ীর আত্মদোহন করল।আবার স্বল্পসময়ের ছেদ নতুন কাব্য-ভাবনার প্রকাশ বাসনায়।উপন্যাসের কাব্যময়তায় যার জন্ম 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে'।সময়ের শেষ প্রস্তুতিতে সৃষ্টি হল - 'যোগাযোগ','শেষের কবিতা','দুইবোন','মালঞ্চ' এবং 'চার অধ্যায়'।

উপন্যাসের প্রেক্ষিতের উপর কবিমনের দায়িত্ব অনস্বীকার্য।প্লট নির্মানের বৈচিত্র্যে কাব্যের সহজ প্রবেশ ঘটেছে।এছাড়া বিষয়, চরিত্র, প্রকৃতি, ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ প্রভৃতি সর্বত্রই নির্মাণকল্পে এক কবির সন্ধান পাওয়া যায়।কবি যখন ঔপন্যাসিক এই পর্বে প্রাক্-রবীন্দ্র, রবীন্দ্র-সমসাময়িক, রবীন্দ্র-উত্তর - এই তিনটি পর্বে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে উপন্যাসের ক্রমবিকাশে কাব্যের বহতা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।উপন্যাসে এই কবি-ভাবনা কারো কাছে প্রকরণের স্খলন,গতির প্রতিবন্ধকতা, আবার কারো কাছে বাস্তব মাটির পরশহীন সাধুগন্ধী - আমাদের অচেনা জগৎ-কে ব্যাপ্তি দেয়, প্রাণের তার যায় কেটে।কিন্তু কবিত্বের এই স্বরলিপি আধুনিক মানস সঞ্জাত - যা রূপকে ব্যঞ্জিত করে, চকিত করে না, যা প্রজ্ঞা নির্মিত জগতে 'অপূর্ববস্তুনির্মাণ' করে।কখনো কবির ব্যক্তিগত জীবন-ভাবনা, কখনো ঘটনা-পরম্পরা কবিতার অলিন্দে হেঁটে উপন্যাসে যাত্রা করেছে।প্রতিবেশ, চরিত্র, নিসর্গ, শব্দ,বর্ণ সবই কাব্যপ্রাণে বিধৃত আত্মার গহনে জড়িত হয়ে রবীন্দ্র-উপন্যাসের স্বতন্ত্র পথ নির্মাণ করেছে।সাম্প্রতিক কবিমন যুক্ত উপন্যাসের আত্মঘোষণা রবীন্দ্র-নির্মাণের সহজ উত্তরাধিকার।চলমান শতাব্দি এখনও পথ খোঁজে, হারায়, জড়িত হয় ঐতিহ্যের লালায়; কিন্তু রবীন্দ্র-উপন্যাসের বর্তমান-প্রতিষ্ঠা সাম্প্রতিকের স্বীকরণে অত্যাধুনিক হয়ে ওঠে।

উল্লেখপঞ্জী

১। সাহিত্যের সামগ্রী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২। রঙ্গমঞ্চ ঃ ১৩০৯ পৌষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। শুভ-বিবাহ : ১৩১৩ আষাঢ়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি যখন ঔপন্যাসিক

কবি আত্মলীন মানুষ, নিজের মনের গহনে ডুব দিয়ে তিনি অমৃত আহরণ করেন। আত্মরতি-তৃপ্ত কবিমন সাধারণতঃ গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। কারণ কথা সাহিত্যিকের দৃষ্টি বহির্জগতে স্বতঃপ্রসারিত হওয়া চাই। জগৎ ও জীবনে যা ঘটে বা ঘটেছে, বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করা এবং আকর্ষণীয় ভাবে প্রকাশ করা কথা সাহিত্যিকের কাজ। কবির মন সুদূর প্রসারী, শান্ত ও অনন্তের মধ্যে, ঘরের মাটির প্রদীপ ও আকাশের তারার মধ্যে মিলন ঘটানো তাঁর সাধনা। বস্তুগত তথ্যকে অতিক্রম করে কবির প্রবণতা ভাবসত্য প্রতিষ্ঠার দিকে, এই মনোভঙ্গি সার্থক কথাসাহিত্যিকের পথে অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ এর ব্যতিক্রমী শিল্পী। কবিমনটিকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যগুলি বিশ্ববন্দিত। কিন্তু সেগুলি যতখানি নাটক, ততখানি কাব্য। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যেও কবি মানসের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। উপন্যাস সাহিত্যের আধুনিক শ্রেণী। উপন্যাসের ক্ষেত্রে কবিরস্থান সঙ্কীর্ণ। জগৎ ও জীবনের জটিলতা এবং দ্রুত গতি থেকে আধুনিক সভ্যতার লীলা বৈচিত্র্যের ভিতর এর উন্মেষ। কবি রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন স্থান গ্রহণ করেছেন। সে ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যিক হয়তো বাঙালির স্বাভাবিক বৈচিত্র্যহীন জীবনের আকস্মিক উদ্বেল মুহূর্তগুলিকে বেছে নিয়ে কবি মনের আলোকে উজ্জ্বল করে বিচিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের বাস্তব প্রধান পটভূমিতে কবি-আত্মা উদ্ভাষিত থেকে বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের সার্থক সমণ্বয় সাধন করেছে। টমাস হার্ডি এই প্রতিভাকে রসিক সমাজের অভিনন্দনযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।[১] রবীন্দ্র-উপন্যাসে কবি-আত্মার প্রাধান্য অনেক সমালোচককে বিব্রত করেছিল। তাঁদের মতে, রবীন্দ্র-উপন্যাস প্রকরণ অথবা বিষয়ে বা কৌশলগুণে যথার্থ উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ যে ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে ঘটেছিল তার সামগ্রীতে কবি-আত্মা প্রাধান্য পেয়েছে। শিল্প বিচারে চিরাচরিত, যথার্থ অথবা জ্যামিতিক মানদন্ড একমাত্র নয়, 'অন্তরের সত্য' অথবা 'ভাবের প্রকাশ' শিল্প-এষণাতে নতুন প্রকরণের সৃষ্টি করে। প্রবন্ধ, পত্র সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি প্রতিটি স্তরেই রবীন্দ্র-ঈষিকা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। যে সমালোচকেরা রবীন্দ্র-উপন্যাসের স্খলন প্রত্যক্ষ করেছেন কাব্য ভাবের কারণে — প্রসঙ্গতঃ সেই কবি মানসিকতা উপন্যাসের ভিন্ন শ্রেণী এবং কবিত্বের ঐশী শক্তিকে উপন্যাসের বস্তুময়তায় একাত্ম করে দিয়ে তার নান্দনিক দিক তুলে ধরেছে, বিষয়ের উপস্থাপন, চরিত্র-নির্মিতি, ভাষাপ্রাণ, প্রকৃতির চিত্রণ এবং রূপ-কৌশলের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের কবি আত্মা উপন্যাসকে স্বতন্ত্র পথে চালিত করেছে।

E. M. Forster মন্তব্য করেছেন I do not wonder that the poets despise it, though they sometimes find themselves in it by accident. And I am not surprised at the annoyance of the historian where by accident it finds itself among them.[2] ফরস্টারের অভিমত কবিরা ঔপন্যাসিকদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। যদিও কবির দল অল্পবিস্তর রসোত্তীর্ণ উপন্যাস সৃষ্টি করে থাকেন। ঐতিহাসিকরাও কখনো কখনো উপন্যাস রচনা করে ফেললে সম্ভবত বিরক্তির ফাঁদে জড়িয়ে পড়তেন। অনেক সময় এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্র-উপন্যাসের সমালোচকদের কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন - অনন্য কাব্য প্রতিভার অধিকারীর পক্ষে অভিব্যঞ্জনাময় উপন্যাস রচনা করা অসম্ভব। টি. এস. এলিয়ট মন্তব্য করেছেন যে কবি ও কথাশিল্পী যখন একই ব্যক্তি তখন তাঁর প্রতিভার সক্রিয় দিকটি অন্য সত্তাকে অবদমিত করে আত্মপ্রকাশ করে। ফরস্টার 'Acpects of the Novel' গ্রন্থে জানিয়েছেন, ঔপন্যাসিকের একদিকে কাব্যের প্রবাহ, অন্যদিকে ইতিহাসের মসৃণতা-এর সংমিশ্রণ উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক অপ্রাকৃত ঘটনা। 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি চরম উৎকৃষ্ট শিল্পরূপের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাই ইতিহাসে কোন অপ্রাকৃত

ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, সাহিত্যের বিচিত্র, বিস্তৃত রাজপথে বহুমুখী সৃজনী প্রতিভার এ এক স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ।

উপন্যাস সর্বগ্রাহী, শিল্পী মাত্রেই জানেন, অন্তরমুখীনতা বা হৃন্ময়তা কবিতার বিষয় তার দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিত্ব নাটকের বিষয়মূল, কিন্তু একই সঙ্গে যে, সেই হৃন্ময়তা ও দ্বন্দ্বময়তাকে তিনি যখন সামগ্রিক মানুষের সম্পর্কে সূত্রে গ্রথিত করে দেখাতে চান তখনি উপন্যাসের অগ্রাধিকার। এই উদ্দেশ্যেই 'The novelist has been quicker than the poet or the philosopher to borrow their specialities , than they have to borrow his ' শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার সর্বত্রচারী। দর্শন, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব এবং কবিত্ব, নাট্যরস এবং কাহিনিরস অর্থাৎ মানব মনীষা ও সাহিত্যশিল্পের শ্লাঘা — সবকিছু থেকেই উপন্যাস ঋণী হতে পারে। 'রূপশিল্প' (১৯৩৬) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানালেন, 'প্রত্যেক কলার স্বাতন্ত্র্য আছে, আছে বলেই পরস্পরকে আতিথ্য দেবার পথ তারা কৃপণের মত অবরুদ্ধ করে রাখেনি'। তাই ঔপন্যাসিককে যেমন সর্বরসসিদ্ধ হতে হয় তেমনি উপন্যাস-পাঠককেও হতে হয় সর্বরস-ভোক্তা। মূললক্ষ্য পাঠকের কল্পনাকে আকৃষ্ট করা। বস্তুত বাস্তব জীবনের যে অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণা থেকে রোমান্টিকতার জন্ম, উপন্যাসের দীর্ঘ প্রতিবেশে কবিত্ব অঙ্গীভূত হয়েছে সে অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণা থেকে। ভিক্টোরীয় যুগের প্রকল্পের অন্তরালে ছিল এই অসম্পূর্ণতার বোধ। ডিকেন্স সেই যুগের রোমান্টিকতা-বিরোধী প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক। ওয়ার্ডস ওয়ার্থ-এর মত শান্ত কিংবা শেলীর মত ঝঞ্ঝাঘন প্রকৃতি ডিকেন্সের বিষয় নয় ; তিনি এ যুগের আত্মাকে অনুসন্ধান করেছিলেন। কাজেই এ কবিত্ব ভিক্টোরীয় যুগের মুখবন্ধ নয় বরং এলিজাবেথানদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বলা যায়। Poetic fantasy -র ব্যবহার স্বচ্ছ হাস্যরসের প্রয়োগে ডিকেন্সের কবি প্রতিভা তাঁর উপন্যাসকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। ডিকেন্সের কবিত্ব উপন্যাস অতিরিক্ত কোন ব্যাপার নয়, বরং বলা যেতে পারে সমগ্র উপন্যাসের আত্মাতে এই কাব্যশ্রীর অধিষ্ঠান। জর্জ ইলিয়টের ক্ষেত্রেও এই কবি-কল্পনা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-বন্দিত এবং তাঁর শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে কবিত্বের ঐশ্বর্য সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব শক্তি গুরুত্ব পেয়েছে কথা সাহিত্যে — একথা ঠিক নয়। তত্ত্ব লিরিকের প্লাবন এবং সৌন্দর্যের একাত্মতায় রবীন্দ্র-নাটক স্বতন্ত্র পথ খুঁজে নিয়েছে। একই ভাবে উপন্যাসের কবিত্ব সর্বোত্তম কবিত্বের অধিকারী বলে নয়, ডিকেন্স-ইলিয়টের মত কোন কালের প্রভাবে নয়, সাহিত্যের সামগ্রিকতার রসময়তায় ব্যাপৃত । ১৯২৮-এ 'How I Learn to write' প্রবন্ধে গোর্কি সৃজনক্ষম হাতিয়ারের শ্রেণীকরন করেছেন — একটি 'জ্ঞান', অপরটি 'কল্পনা'। প্রাকৃতিক অবস্থা এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়কে বীক্ষণ করার দক্ষতা যার সাহায্যে জন্মে তারই নাম 'জ্ঞান'। 'জ্ঞান' হচ্ছে 'চিন্তন'। 'কল্পনা' যদিও একধরনের 'চিন্তন' কিন্তু এক্ষেত্রে চিন্তার প্রকাশ ইমেজে। রবীন্দ্র-উপন্যাস এই কল্পনার সূত্র ধরে তথ্য, প্রতিবেশ, সমাজ, চরিত্র, ভাষা প্রভৃতিকে দোহন করে তুলে ধরেছে উপন্যাসের ভিন্ন প্রকাশ — সেখানেই তাঁর স্বতন্ত্র কবিত্বের ঠিকানা।

কবিত্বের খোঁজ : ১২৮৮-র ফাল্গুনে 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে 'কবিত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বললেন — নিজের প্রাণের মধ্যে পরের প্রাণের মধ্যেও প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা লোকোত্তর চমৎকার ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর রসকে বলেছেন আত্মসংবিতের চর্বণা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'এই কাব্যরস কি তাহা বলা শক্ত। কারণ তাহা তত্ত্বের ন্যায় প্রমাণযোগ্য নহে, অনুভবযোগ্য।' কাব্যের মধ্যে মানুষ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পায় এবং কাব্যে মানুষ নিজেকেই বিশেষভাবে জানে বলে কাব্য অনুভব যোগ্য। সাহিত্যের উৎস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সহ পূর্বাপর পাশ্চাত্তের আচার্য গণও সহমত পোষন করেন। চিরন্তন সৃষ্টিকর্ম বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নয়, তার সঙ্গে যে বস্তু জগতের সীমানার উর্দ্ধে, শিল্পীরসেই মনের মাধুরী, তার সঙ্গে। সংশ্লেষণ ঘটালেই

যথার্থ সাহিত্যের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, এই অলৌকিক বস্তুই সাহিত্যের প্রান, তার চিরন্তনত্বের কবচ-কুন্ডল। অনেক আধুনিক উপন্যাসে প্রাত্যহিকজীবনের হাসিকান্না, রাগ-অনুরাগে সংক্ষুব্ধ, সদা পরিবর্তনশীল সমাজের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিচিত্র নিপুণভাবে বিবৃত হলেও গভীরতার অভাবে জীবনসত্যের একটা চিরন্তন আভাস তার মধ্যে সচরাচর পাওয়া যায় না। টমাস হার্ডির মতো ঔপন্যাসিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠজীবন শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম ই. এম. ফরস্টার পর্যালোচনা করে বলেছেন -"his novels are surveys,......it is talk never song." প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের প্রাণ' প্রবন্ধে নিজস্ব শিল্পরীতিতে ব্যক্ত করেছেন। যে রসবস্তু মানব-মানবীর অন্তরের গভীরতম স্তরে একই রূপে স্থিত, 'যে সৌন্দর্য মানুষের ভালোবাসার মধ্যে চিরকাল বদ্ধমূল, যার শ্রান্তি নেই, তৃপ্তি নেই,' সেই চিরঞ্জীব বস্তুই সাহিত্যের প্রাণ। রবীন্দ্র-উপন্যাস সেই রসবস্তুর সন্ধান দেয় — যেখান থেকে কবিত্ব ক্ষরিত, তার ঐশ্বর্যে স্বতন্ত্র পথ নির্মিত হয়। প্রতিটি শিল্পকর্মকে কবি বলেছেন 'শব্দার্থময় কথাবস্তু'। সাধারণ ভাবে একে বলা হয় রসবস্তু। এর উপাদান বাচ্য, রীতি, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি নানা বস্তু সকলের সুষম রূপকল্পে এই বস্তুর অবয়ব গঠিত। কিন্তু শুধু নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে যেমন প্রাণের সৃষ্টি হয় না প্রান শক্তিই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে নিজেকে তার মধ্যে প্রকাশ করে, 'তেমনি রসই নিজেকে মূর্ত করে তোলার আবেগে এই সব অঙ্গের সৃষ্টি করেছে'৩। রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রকারান্তরে পরমব্রহ্মের ঔপনিষদিক ভাষ্যের কথাই বলেছেন। এই চেতনাচেতন জগৎ পরমাত্মা ব্রহ্ম নয়, কিন্তু তিনি তা থেকে ভিন্নও নন, এ সবের মধ্যেই তিনি পরিব্যাপ্ত। সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐ একই সাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যে রবীন্দ্র-উপন্যাস নান্দনিক।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের ঔপন্যাসিকেরা অন্তত যাঁরা পরিচর্যাশীলতায় বৃহৎ পাঠক সমাজ অভীমুখী নন - ফ্লবেয়ারের শিল্পপ্রাণতার অভিনিবেশী শিষ্য ছিলেন এই কারণে যে, অব্যর্থ রূপক, অব্যর্থ প্রতীক প্রয়োগে তাঁরাও ফ্লবেয়ারের মত স্থির লক্ষ্য খুঁজছিলেন। ফ্লবেয়ার যে একদিকে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশীল ঔপন্যাসিক সেটি সেই শিল্পপ্রাণতার দিক থেকে অনুধাবণযোগ্য। জয়েস ও লরেন্স উভয়ের বিপুল বৈপরীত্য সত্ত্বেও, সাদৃশ্য লক্ষণ বোধহয় এইখানে যে উভয়ে প্রতীকে এবং কাব্যের অনুশাসনে, উপন্যাসের শিল্পকর্মকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। পৃথকভাবে দুজনে কাব্যচর্চা করেছেন এবং দুজনে উপন্যাসে দৃশ্যের অতীতকে ধরতে চেয়েছেন। লরেন্সীয় প্রতীক সে ক্ষেত্রে লরেন্সের সহায়ক, জয়সের গদ্যের কাব্যকল্প অবিচলতা তাঁর বিষয়ের বাহন। সুতরাং দেখা গেল যত দিন যেতে লাগল তত formal - realism এর শক্তিমান গদ্য মাধ্যমবিষয়গত বাস্তবতার দায় পরিহার করে, বিষয়ের অতীতে বা স্বরূপে পৌছনোর জন্য কাব্যের দ্বারে প্রার্থী হতে থাকল। উনিশ শতকের শেষ দিকে যখন থেকে social disinegration ধীরে ধীরে অনুভূত হয়েছে, তখন থেকে উপন্যাসে ফর্মে গদ্যের বস্তু-লক্ষ্য, ঋজু আনুশাসন অপেক্ষা কাব্যের আবহাওয়া ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছে। উপন্যাস-সাহিত্য জীবনের নিকটতম শিল্পকলা বলে উপন্যাসের প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। জাতির জীবনের চিত্রকলা, কাব্যধারা অর্থাৎ জীব-বিষয়ক সমকালীন সমস্ত কিছু থেকেই উপন্যাস নিজের প্রাণ বায়ুর কিছু অংশ সংগ্রহ করে থাকে। 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই সময়ে গদ্য পদ্য যা লিখতেন 'তার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল, ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশী।' তার বহু পরে জীবনের প্রান্তিক সীমানায় এসে 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এর ভূমিকায় (১৯৪০) দাবী করেছেন — 'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে ....মন যে প্রবেশ করলে এ বোধহয় কৌতূহল থেকে।' কবি যে জীবনদৃষ্টিকে 'বহির্বিষয়ী' বলে চিহ্নিত করেছেন, আসলে তা হচ্ছে 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবির রোমান্টিক, কুয়াশাময় বাতাবরণে প্রতিফলিত এক ধূসর ক্যানভাসে অঙ্কিত চিত্ররূপ।

প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠন-শরীরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য নদীর মতোই ঘটেছে নানান পট পরিবর্তন। 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' — প্রতিটি উপন্যাসের মধ্যেই রয়েছে কাব্যনদীর বহতা, পরিবর্তনের ধারা। চারটি উপন্যাসেই কল্পনার

বৈচিত্র্যময় স্বতন্ত্রতা চোখে পড়ে। নারী, পুরুষ সম্পর্কের নতুন ভাবনা, বঙ্কিমের 'রজনী'-তে প্রকাশিত হয়েছে বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ দৃষ্টিতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতায় মোহিতলাল মজুমদার প্রদেয় বক্তব্যে (১৯৫৫) তিনি 'রজনী' উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছিলেন — ''রজনী'-র মূল আখ্যায়িকাটিকে একখানি গীতিকাব্য বলিলেও হয় — Psychological, Subjective, Lyrical. কুন্দনন্দিনীর সেই লিরিক প্রেম আর একরূপে কবিকে আবিষ্ট করিয়াছে।....'' এছাড়া রবীন্দ্রপ্রাক্ বা সমসাময়িক যুগে রমেশচন্দ্র দত্ত-এর উপন্যাসে বঙ্কিমের ব্যর্থ অনুকরণ, প্রতাপচন্দ্র ঘোষের ঐতিহাসিক তথ্যের বুনন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহিণীপনার অভাব, হতে ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গের বাতাবরন সৃষ্টি, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমাজ বাস্তবতার বিভ্রম উপন্যাস আর কাব্যের জগতকে পৃথক করে দিয়েছে। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বঙ্কিম প্রভাবে স্থূল ও বিকৃত রূপ পাওয়া যায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসে ধর্মপ্রচারের আহৃত জীবন অভিজ্ঞতা, চণ্ডীচরণ সেনের ঐতিহাসিক নিষ্ঠা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপন্যাসে ইতিহাসের বাঁক ফেরা শিল্প, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ক্রুদ্ধ, ব্যঙ্গের মেজাজ, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাঘ-মানুষ-ভূতের রাজ্যে পরিক্রমণ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার সন্ধান, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অতীত বাংলা ও বাঙালীর রূপরেখা, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের রঙমহলের নেশার রেশ কখনোই কী বিষয়ের দিক থেকে, কী প্রকরণের দিক থেকে কাব্যের ফসলি জমি তৈরিতে সমর্থ হয়নি। এ সময়েই স্বর্নকুমারী দেবীর 'কাহাকে' উপন্যাসটিতে কাব্য-সুরভিত শৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায়। মীর মোশারফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসটিও মহাকাব্যের মহিমা পেয়েছে।

রবীন্দ্র-উত্তর যুগে উপন্যাসে কবিত্বের ঝরাপাতা অনেক ঔপন্যাসিক তাদের সৃষ্টি ভাণ্ডারে সযত্নে রেখে দিয়েছেন। সময়, শ্রেণীর বিপ্রতীপ মেরুকরণে সেগুলি নতুনত্বের স্বাদ বহন করলেও কাব্যের আরোহণ-অবরোহণের মূলের শিকড় যে রবীন্দ্র-উপন্যাসের মৃত্তিকা গহ্বরে নিহিত ছিল তা বলাই বাহুল্য। বনফুলের 'মৃগয়া', জীবনানন্দ দাশের 'কল্যাণী', 'মাল্যবান', 'সুতীর্থ', 'বিরাজ' প্রভৃতি উপন্যাস যেন কবিকন্যা মঞ্জুশ্রী দাশের পিতৃ স্মৃতি চারণে মুখবন্ধ হয়ে ওঠে :

''তাঁর প্রকাশভঙ্গী ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অনেকটা জাপানি কবিতার মতো।''[৪] কবিতার ক্ষেত্রে সেই জীবনান্দকে আমরা যেমন পাই, কথাসাহিত্যেও সেই কবি-আত্মাকেই খুঁজে পাই। জয় গোস্বামীর 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' এক অখণ্ড কাব্যোপন্যাস ; এভাবেই আধুনিক থেকে উত্তর আধুনিকের পথে শতবর্ষের ওপারে এবং এপারেও উপন্যাসে-কবিত্ব যেন এক পোষ্ট-মডার্ন আর্ট হয়ে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জী

১. Sylva Norman, The Great Victorians 1, Pelican Edition, 1937
২. E. M. Forster, Aspects of the Novel, London, 1953, P-9
৩. অতুলচন্দ্র, কাব্যজিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১ম সং, ১২২৮,পৃ-৫৪
৪. একদিন শতাব্দীর শেষে, জীবনানন্দ স্মারক সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

করুণা উপন্যাস
পূর্বাভাস

তখন রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-আবিষ্ট মানসের একদিকে সর্বাধুনিক রোমান্টিক প্রকৃতি-কবি বিহারীলাল, অপরদিকে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুন্ডলা', 'মৃণালিনী' ইত্যাদির ঘটনামুখর রোমান্সশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র। এবং মধ্যে সমানভাবে দেদীপ্যমান কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য অনূদিত ফরাসি 'পৌলবর্জিনী'র জনপ্রিয় করুণরসাত্মক আখ্যানকাব্য। পরিণত বয়সে 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লেখেন "এই ('অবোধবন্ধু') কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম পড়িয়াছিলাম। তখনকার দিনে সকল কবিতার মধ্যে তাঁরই কবিতা আমার সবচেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাঁহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির সুরে আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত। এই অবোধবন্ধুই কাগজে বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।" [১]

যে গাঙ্গেয় বাংলার পলিমাটিতে একটা মধুর কোমল স্পর্শ, যার মাঠে ঘাটে আকাশে বাতাসে একটা উদাস হাওয়ার বিষণ্ণ আমেজ, সেই বাংলার প্রকৃতির আশ্রয়ে কিশোর কবি লালিত পালিত। এই বিষণ্ণ-মধুর পরিবেশেই তাঁর প্রথম জীবনের ব্যক্তিমানস অনেকাংশে গঠিত। বিহারীলালের রোমান্টিক প্রকৃতির আবেদন সহজেই তাঁকে উন্মনা করে তুলত, 'পৌলবর্জিনী'র বেদনার্ত কাহিনি তাঁর কবিসত্তাকে কোমলরসে আলুপ্ত করত। এই কল্পনাপ্রবণ মনোভূমির প্রশস্ত ক্ষেত্রে ঘটনা-আকীর্ণ বঙ্কিমী রোমান্সের আবেদন স্বভাবতই তীব্র হয়ে উঠেছে। তাঁর সাহিত্যসাধনার আদিযুগে এই প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং দেশ-বিদেশের সমধর্মী সাহিত্যকর্মের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয়। কাব্য 'কবিকাহিনী' ও 'বনফুল' ক্ষুদ্রকাহিনী 'ভিখারিণী' এবং উপন্যাস 'করুণা'র শিল্পরূপ, শিল্পরীতি, প্রকরণপদ্ধতির মৌলগতি-প্রকৃতি সবই সাধারণভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশে, ঘটনাবহুল, বিষাদ-মলিন, বিয়োগান্ত রূপকল্পে বিধৃত। 'করুণা'র আখ্যান সমান্যক্ষণের জন্যে শহরমুখী হলেও আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত গ্রামেরই পরিবেশে এবং করুণরসের বাতাবরণে আবৃত, 'বনফুল' ইত্যাদির শিল্পরূপের ঔপন্যাসিক অনুবর্তন মাত্র। রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম উপন্যাসটি সম্বন্ধে প্রভাতকুমারের মন্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও আমাদের মতামতের সমর্থন করে, "উপন্যাসটি তাঁর এই সময়ের তাঁর উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাব্যেরই অনুরূপ, গল্পাংশ অতি তুচ্ছ।" [২]

'করুণা' 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল আশ্বিন ১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে ভাদ্র ১২৮৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত। এর পরে উপন্যাসখানি আর মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেনি। রবীন্দ্ররচনাবলী "অচলিত সংগ্রহ" খন্ড দুখানিতে এইসব 'একদাবর্জিত' রচনা মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, 'করুণা' উপন্যাসখানি অচলিত সংগ্রহেও স্থান লাভ করেনি। রবীন্দ্ররচনাবলীর শতবার্ষিকী সংস্করণের অষ্টম খন্ডে 'করুণা' উপন্যাসখানি পুর্নমুদ্রিত করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

১২৮৪ সালের শ্রাবণ থেকে 'ভারতী' প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রায় পারিবারিক পত্রিকা 'ভারতী' কে অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চর্চার সূচনা। এই সময়ে তিনি ষোড়শবর্ষীয় বালকমাত্র। 'জীবনস্মৃতি'তে এই স্মৃতির উল্লেখ করে বলেছেন — "বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংকল্প করিলেন। এই আর একটা পরম উত্তেজনার বিষয় হইল। আমার বয়স তখন ঠিক ষোল। কিন্তু আমি ভারতীর সম্পাদক চক্রের ঠিক বাহিরে ছিলাম না।" "ভারতী সম্পাদকচক্রের একজন" রবীন্দ্রনাথকে এই সময়ে পত্রিকার জন্য অধিকাংশ রচনাই লিখতে হত। পত্রিকা প্রকাশের মাত্র দুইমাস পরে অর্থাৎ 'ভারতী'র আশ্বিন সংখ্যা থেকেই তাঁর 'করুনা' উপন্যাস প্রকাশিত হতে থাকে এবং ১২৮৫ সালের ভাদ্র মাসে শেষ হয়। প্রায় এক বৎসরকাল ব্যাপী কিশোর ঔপন্যাসিক ধৈর্যের সঙ্গে 'ভারতী'র প্রতি সংখ্যায় উপন্যাসখানি ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন।

'করুণা' উপন্যাসখানি রচনা করবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচর্চার পরিচয় অকিঞ্চিৎকর। ইতিপূর্বে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় ১২৮২ বঙ্গাব্দে তিনি 'বনফুল' নামে একখানি 'কাব্যোপন্যাস' ধারাবাহিক আকারে রচনা করেছিলেন। যদিও 'বনফুল' 'করুণা' রচনার চার বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৮৬ বঙ্গাব্দে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'ভারতী'র প্রথম বর্ষের পৌষ থেকে চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে 'কবিকাহিনী' নামে একখানি নাতিদীর্ঘ কাব্য প্রকাশিত। কিন্তু এখানিও গ্রন্থকারে মুদ্রিত হয় ১২৮৫ সালে। সুতরাং এদিক থেকে বিচার করলে 'করুণা'কে রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস মাত্র নয়, সাহিত্যজীবনের প্রথম সম্পূর্ণ সৃষ্টির মূল্যে চিহ্নিত করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'করুণা' উপন্যাসখানিতে সম্পূর্ণ বলে স্বীকার করেননি। রবীন্দ্র-জীবনীর প্রথম খন্ডে এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন — "ভারতীতে ক্রমশ প্রকাশিত উপন্যাস 'করুণা' তিনি সম্পূর্ণ করেন নাই।" ... [৩]

অন্যত্র বলেছেন — "প্রথম বর্ষে আরব্ধ 'করুণা' উপন্যাস এ বৎসর ভাদ্রমাস পর্যন্ত চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। আশ্বিন মাসে বিলাত যাত্রা করায় বইখানি সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।" ... [৪]

'জীবনস্মৃতি'র খসড়াতে — "প্রথম বৎসরের ভারতীতে প্রকাশিত আমার বাংলা রচনাকরুণা নামক গল্প তাহার নমুনা" — এইরূপ উল্লেখ আছে। কিন্তু 'জীবন স্মৃতি'র বর্তমান সংস্করণে 'করুণা'র নাম আর উল্লেখিত হয়নি। এই সসঙ্কোচ গোপনীয়তার কারণ সাহিত্য মানের নিম্নতা তাতে সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে 'ভারতী'র এই রচনাগুলি সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করেছেন সেটি অনুধাবন করলেই এর উত্তর মিলবে। তিনি বলেছেন —"ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়াছে।" সত্যিই এইসব রচনা "বাল্যলীলার অনেক লজ্জা" কিনা সে বিষয়ে বিচারের অবকাশ আছে। তৎপূর্বে 'করুনা' উপন্যাসখানির প্রতি লেখকের মমত্ববোধের অন্তত একটি নিদর্শন আমাদের হাতে আছে, সেটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। রবীন্দ্রনাথ 'করুণা' প্রকাশিত হবার প্রায় সাত বৎসর পরে সাহিত্যবন্ধু চন্দ্রনাথ বসুকে 'ভারতী র' সংখ্যাগুলি পাঠিয়ে 'করুণা'র গুণাগুণ জানতে চান। কিন্তু তার উত্তরে চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন সেটি 'করুণা'র সার্থক সমালোচনা। [৫]

পত্রখানিতে চন্দ্রনাথ বসু অতি যত্ন সহকারে 'করুণা'র সাহিত্যমূল্য বিচারে প্রয়াসী হয়েছেন। উপন্যাস খানির সাহিত্যমূল্য বিচার প্রসঙ্গে ঐ পত্র থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধার করবার প্রয়োজন হবে। এখানে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, সমস্ত দোষ-ত্রুটি স্বীকার করেও চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উপন্যাসখানির অকুন্ঠ সাধুবাদ করেছেন। তিনি উক্ত পত্রে "গল্পটি পুস্তকাকারে ছাপানো আবশ্যক" বলেও মন্তব্য করেছেন।

করুণা চরিত্র

'করুণা'র মতো কিশোর বয়সের একটি রচনায় সুষ্ঠু চরিত্রচিত্রণ আদৌ প্রত্যাশিতও নয়। বস্তুত এই উপন্যাসে ঘটনার বিস্তারসাধন ও জটসৃষ্টির দিকে লেখকের আগ্রহ বেশী, ফলে চরিত্রচিত্রণ অনেকাংশে গৌণ হয়ে পড়েছে। উপন্যাসটিতে সংলাপের পরিমাণ প্রয়োজনের অনুপাতে যথেষ্ট না হওয়ায় এবং ঘটনা পরিস্থিতির আকস্মিকতার দরুণ চরিত্রে স্বাভাবিকতা আসতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে চরিত্রের বিকাশ যেটুকু দেখানো হয়েছে, তাও উপন্যাসের পক্ষে স্বাভাবিক বিলম্বিত লয়ে নয়। আকস্মিকতার কৃত্রিম ধাক্কায় ঘটনার সঙ্গে চরিত্রেও দ্রুত পরিবর্তন দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে চরিত্র অনেকক্ষেত্রেই ভারসাম্য হারিয়ে ভাবাবেগের অতিরেকে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

করুণা চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের কবি মানসের সার্থক সৃষ্টি। কল্পনাপ্রবণ কবিস্বভাব করুণা একান্তই কোমল ও সুন্দর। প্রকৃতির শান্ত মধুর পরিবেশে সে আত্মমগ্ন। করুণার পরিচয় এইরূপ—"সঙ্গিনী অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট নেই। সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার স্বপ্নে সে সমস্ত দিনরাত্রি এমন সুখে কাটাইয়া দিত যে, মুহূর্তমাত্রও তাহাকে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। তাহার একটি পাখী ছিল; সেই পাখীটি হাতে অন্তঃপুরের পুষ্করিনীর পাড়ে কল্পনার রাজ্য নির্মাণ করিত। কাঠবিড়ালীর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া, জলে ফুল ভাসাইয়া, মাটির শিব গড়াইয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাইয়া দিত।" 'করুণা' উপন্যাসে একমাত্র করুণা চরিত্র সৃষ্টিতেই রবীন্দ্রনাথ আন্তর স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন। প্রায় সমকালে রচিত 'কবিকাহিনী' কাব্যের নায়ক কবির স্বভাবের সঙ্গে করুণা চরিত্রের মূল কাঠামোর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ভাব ও কল্পনা সম্পদের অধিকারিণী নায়িকা সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রত্যেকটি নায়িকার অন্তরেই একটি কবি সত্তাকে সহজেই আবিষ্কার করা যায়। বিস্ময়ের কথা এই যে, নিজের অজ্ঞাতসারে পরবর্তী জীবনের আদর্শের সন্ধান কৈশোরেই তিনি লাভ করেছিলেন।

'করুণা' চরিত্রটি সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর বিচার অনুধাবনীয়। তিনি বলেছেন —"তোমার করুণা খুব ভালো - কিন্তু অসম্পূর্ণ, ফুল মাত্র, ফল নয় - কল্পনা মাত্র, কাব্য নয় - স্বপ্ন মাত্র, জীবন নয় - দৃশ্য মাত্র, আদর্শ নয়।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন - "ফুল যখন ফুটিয়া উঠে তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য.............. সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ্য মাত্র, সে কথা গোপনে থাকে ... । কাব্যরচনা সম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই — অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। ... কিন্তু আজ জানিয়াছি, যে-সকল লেখা উপলক্ষমাত্র — তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না।" [৬] 'করুণা' উপন্যাসেও লেখকের না জানার মধ্য দিয়ে অনাগতর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাই আমরা পেয়েছি 'চোখের বালি', 'যোগাযোগ', 'চতুরঙ্গ'। আবার রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলা যায়, 'প্রকাশের পূর্ণতায় যা পৌঁছয়নি তারও মূল্য আছে হয়তো, ইতিহাসে, মনোবিজ্ঞানে।' (রবীন্দ্ররচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ — প্রথম খন্ড - ভূমিকা)।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন, " করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল কিন্তু কিছু কহিল না"— এবং নীরবতার অন্তরালে এই করুণ কাহিনীর পরিণতিও নীরব হয়ে গেল। ঔপন্যাসি পা বাড়ালেন ইউরোপের দিকে। যে উপন্যাস শেষ হল না তার গুণাগুণ বিচার সমালোচকের অধিকারের বাইরে। [৭] এরপাশে খ্যাতিমান বর্ষীয়ান সমালোচক শ্রীকুমারের মন্তব্য অদ্ভুত মনে হয়। " উপন্যাসটি অসম্পূর্ণ হইলেও ঘটনা-পরিণতির দিক দিয়া করুণার মৃত্যুতে ও রজনীর স্বামীপ্রেমে পুনঃ প্রতিষ্ঠায় একটি স্বাভাবিক উপসংহারে পৌছিয়াছে মনে হয়।"[৮]

করুণাকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই প্রকৃতির সন্তানরূপে সৃষ্টি করেছেন। বাস্তব সংসারের মালিন্য তাকে স্পর্শ করেনি। "সঙ্গিনী অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না, সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার স্বপ্নে, সে সমস্ত দিনরাত্রি এমন সুখে কাটাইয়া দিত যে, মূহূর্ত মাত্রও তাকে কষ্ট করিতে হয় নাই।... এক একটি গাছকে আপনার সঙ্গীনী, ভগ্নী, কন্যা বা পুত্র কল্পনা করিয়া তাহাদের সত্য সত্যই সেইরূপ যত্ন করিত, তাহাদিগকে খাবার আনিয়া দিত, মালা পরাইয়া দিত, নানা প্রকার আদয় করিত, এবং তাহাদের পাতা শুকাইলে ফুল ঝরিয়া পড়িলে অতিশয় ব্যথিত হইত।" এ যেন কণ্ব আশ্রমে পালিতা শকুন্তলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির পটভূমিতে করুণার মনোধর্মকে ব্যক্ত করেছেন। নরেন্দ্রের অত্যাচার তার কোমল শুচিসিদ্ধ সরল মনকে যে বিপুল বেদনার গভীরে নিয়ে এসেছে, তারই একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ — "এক একদিন করুণা সমস্ত জ্যোৎস্নারাত্রি বাগানের সেই বাঁধা ঘাটটির উপর শুইয়া আছে, কত কি ভাবিতেছে জানিনা, ক্রমে তাহার নিদ্রাহীন নেত্রের সন্মুখ দিয়া সমস্ত রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে।" শিশুপুত্রকে হারিয়ে করুণার চরম দঃুখের দিনের আরেকটি চিত্র রবীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেছেন — "জ্যোৎস্নারাত্রি। ছেলেবেলায় করুণা যেখানে দিনরাত্রি খেলা করিয়া বেড়াইত সে বাগানের ঘাটের উপর সে শুইয়া আছে, অতি ধীরে ধীরে বাতাসটি গায়ে লাগিতেছে। সেই জ্যোৎস্নারাত্রির সঙ্গে, সেই মৃদু বাতাসটির সঙ্গে, সেই নারিকেল বনটির সঙ্গে তাহার ছেলেবেলাকার কথা এমন জড়িত ছিল, যেন তাহারা তাহার ছেলেবেলাকারই একটি অংশ। সেই দিনকার কথাগুলি, শ্মশানের বায়ু-উচ্ছ্বাসের ন্যায় করুণার প্রাণের ভিতর দিয়া হু হু করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় করুণার বুক ফাটিয়া, বুকের বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া অশ্রুর স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।" এখানে রবীন্দ্রনাথ কোন হৃদয়বিশ্লেষণের দিকে যাননি, শুধু উপলব্ধির নিবিড়তার গভীর ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে সর্বরিক্তা করুণার অন্তরের অপরিসীম হাহাকার ব্যক্ত করেছেন। এখানে পাঠক হৃদয় আর উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে একটা সহৃদয়তার সেতু গড়ে উঠেছে। তার দ্বারাই মানবমনের চিরন্তন কুহেলিকা সত্য ওবাস্তবের রূপ নিয়েছে। প্রকৃতির কোলে আশ্রয় নিয়ে করুণার মন এখানে বাধাবন্ধনহীন, গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে সে তার শিশুকালের স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে। সেই প্রকৃতির পক্ষছায়ায় একদিন তার অন্তর ছিল পরিপূর্ণ, আজ সেই প্রকৃতির মধ্যেই তার হৃদয় শ্মশানের রিক্ততায় আপ্লুত হয়ে আছে। তার অব্যক্ত সীমাহীন বেদনার কোন আদি অন্ত নেই।

216608
11 JUN 2009
NBU DARJEELING LIBRARY

পরিবেশ

যে সময়ে 'করুণা' লেখা হয়েছে, সে সময়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন তাঁর কাহিনিকাব্যের বাস্তবজীবন পটবর্জিত অস্পষ্ট আবছায়া জগতে ভেসে বেড়াচ্ছিল । তবু উপন্যাস লিখতে গিয়ে অল্পস্বল্প পরিবেশ-চিত্র আঁকতেই হয়েছে তাঁকে — যেমন, গ্রাম-বাংলার ঘরবাড়ি, পথঘাট [৯] , কিংবা কলকাতা শহরের বর্ষায় কর্দমাক্ত নোংরা পথ বা ভাঙাচোরা স্যাঁতসেতে বাড়িঘরের বাস্তবধর্মী বর্ণনা । [১০] এই চিত্রপট বর্ণনায় লেখকের স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব পরিবেশ জ্ঞানের ঈষৎ পরিচয় মিললেও, কোথাও কোথাও আবার বঙ্কিমী ভঙ্গিতে দৃশ্যপট সৃষ্টির প্রবণতাও চোখে পড়ে । যেমন, (মহেন্দ্র) "ধীরে ধীরে বাতায়নে গিয়া বসিল । তখন মেঘমুক্ত চতুর্থীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন । বাতায়নের নিম্নে পুষ্করিণী" ইত্যাদি । বস্তুত কিশোর লেখক উপন্যাস রচনার নানা উপাদানের মধ্যে এই পরিবেশ সৃষ্টিতেও স্বাভাবিক কারণেই এখনো বঙ্কিমী প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।

যদিও সে চেষ্টার চিহ্ন চোখে পড়ে । এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ষোড়শ পরিচ্ছেদের শেষাংশ, সেখানে গভীর রাত্রে নিজের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তে করুণা দূর থেকে দেখল, উপর ঘরে পরলোকগত পিতার নির্জন কক্ষে একটি স্তিমিত দীপ জ্বলছে । বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে [১১] কুন্দ ননন্দিনীর নগেন্দ্রের গৃহত্যাগ কালের বর্ণনার সঙ্গে এর আংশিক মিল চোখে পড়ে । কিন্তু তবু বিন্যাসরীতির দিক থেকে 'করুণা'র এই গৃহত্যাগের বর্ণনায় কিশোর রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তির স্বকীয়তা নিঃসংশয়ে স্বীকার্য । এই অংশে 'প্রদীপ জ্বলিতেছে' এই ছবিটির একাধিকবার পুনরাবৃত্তি ক্রমশ দূরবর্তিনী করুণার গৃহত্যাগে অনিচ্ছুক মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যেন একটি প্রতীকী তাৎপর্য পেয়েছে, যা 'বিষবৃক্ষ' - এর পূর্বোক্ত অনুরূপ অংশে বর্ণিত প্রদীপ-পতঙ্গের রূপকার্থের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম ব্যঞ্জন ধর্মী ।

হতোদ্যম মহেন্দ্রের অনুশোচনা, নিজের স্ত্রীর প্রতি অন্যায় উপেক্ষা, তার নিজের একদা চারিত্র গৌরব, সব একত্রে সেই শান্ত, জ্যোৎস্নাস্নাত নিশান্তে তার হৃদয়কে অন্তর্দ্বন্দ্বে দলিত - মথিত করে তুলেছে ।

তার জানালার পাশে পুষ্করিণীর ধারে নারিকেলকুঞ্জ : "জ্যোৎস্নাময় গ্রাম যতদূর দেখা যাইতেছে, এমন শান্ত, এমন পবিত্র, এমন ঘুমন্ত যে, মনে হয় -এখানে পাপ-তাপ নাই, দুঃখ যন্ত্রণা নাই; এক স্নেহ হাস্যময় জননীর কোলে যেন কতকগুলি শিশু একসঙ্গে ঘুমাইয়া রহিয়াছে । মহেন্দ্রের মন ঘোর উদ্দাম হইয়া গিয়াছে ।" বিশ্ব যখন এমনি শান্তিতে নিদ্রামগ্ন, তার মন বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আত্মাধিক্কারে অবসন্ন মহেন্দ্র সেই রাতেই গৃহত্যাগ করল ।

ভাষা

'ভারতী'র পৃষ্ঠায় 'করুণা'র প্রকাশ শুরু হয় ১২৮৪ সনের আশ্বিন থেকে । সমসাময়িক 'ভিখারিণী' ছোটগল্পের পরে প্রকাশিত 'করুণা'র ভাষা সমাসবদ্ধ পদ ও তৎসম শব্দ-বাহুল্য থেকে অনেকাংশে মুক্ত । এখানে কিশোর লেখক পরিচিত জীবনের গল্পবলার উপযোগী কিছুটা সহজ ভাষা যেন খুঁজে পেয়েছেন । সে ভাষায় বাক্য অনেক সময়েই বঙ্কিমী রীতির অনুসরণে সংক্ষিপ্ত ও সরল, মাঝে মাঝে প্রশ্নসূচক ও (যেমন, ''নরেন্দ্রের অনেকগুলি দোষ জুটিয়াছে সত্য, কিন্তু করুণাকে সে সকল কথা কে বলে বল দেখি? সে বেচারী কেমন বিশ্বস্ত চিত্তে স্বপ্ন দেখিতেছে, তাহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিবার প্রয়োজন কি?'' [১২]

'করুণা'র ভাষা বিন্যাসের দুর্বলতম অংশ এর সংলাপ। সাধু ভাষায় গঠিত সংলাপগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্প্রাণ ও কৃত্রিম। তাছাড়া, একই সংলাপে সাধু ও চলিত ভাষার অবাঞ্ছিত মিশ্রণ-ও ঘটেছে কোথাও কোথাও। যেমন, ''গদাধর বাবু কহিলেন, 'এখন কথা হচ্ছে যে স্ত্রী লোকদের কষ্ট মোচনে আমরা দৃষ্টান্ত না দেখাই তবে কে দেখাইবে?'' [১৩] অবশ্য দু'একটি স্থলে একটি গোটা-সংলাপই নিখুঁত চলিত রীতির (কেবল চলিত ক্রিয়াপদ নয়) সাহায্যে আশ্চর্যভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছেঃ ''শাশুড়ি মহা উগ্রভাবে কহিলেন, 'হয়েছে, হয়েছে, ঢের হয়েছে, আর গিন্নিপনা করে কাজ নেই । দু'দিন উপোস করে আছেন, সবে আজ ভাত খেয়েছেন, ওঁর গিন্নিপনা দেখে আর বাঁচিনে।''[১৪] কিশোর ঔপন্যাসিকের লেখা এই উপন্যাসের ভাষায় আড়ষ্টতার পরিচয় যথেষ্টই আছে, ভাষায় প্রত্যাশিত স্বচ্ছন্দ গতি-ও আসেনি, কিন্তু এরই মধ্যে আগামী দিনের পরিণত ভাষারীতির স্বকীয়তার আভাস ইতস্ততঃ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :-

(ক) ''সেই গভীর নীরব নিশীথে অসংখ্য তারকা নিমেষহীন স্থির নেত্রে নিম্নে চাহিয়া দেখিল - দিগন্ত প্রসারিত জনশূন্য অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়া একটি রমণী একাকিনী চলিয়া যাইতেছে ।''[১৫]

(খ) ''চোখের উপর কত পর্বত, নদী, অরণ্য, মন্দির, অট্টালিকা, গ্রাম উঠিত, কিন্তু সে সকল যেন কী; কিছুই নয়। যেন স্বপ্নের মতো যেন মায়ার মতো যেন মেঘের পর্বত অরণ্যের মতো।'' [১৬]

প্লট নির্মিতি

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাসের প্লটটি একটি 'ভূমিকা' এবং ছোটবড় নানা আকারের ২৭টি পরিচ্ছেদে বিধৃত। তার মধ্যে বঙ্কিমের অনুসরণে প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদের নিচে নামকরণ দেখা যায়, কিন্তু তিনটি অধ্যায়ের পর রীতিটি প্রত্যাহৃত। কাহিনির শেষাংশের অস্বাভাবিক দ্রুতগতি, প্রকৃত শ্রেণী এবং শিরোলিপির এই অস্বাভাবিকতা দেখে মনে হয়, শিল্পীর উচ্চাশা আছে কিন্তু তার শক্তি যেমন পরিণত নয়, চিত্তবৃত্তিও তেমনি অসংহত। উপন্যাসটির স্থান বিশেষের ঐশ্বর্য এবং রোমান্সের কলধ্বনির যুগে শান্ত গৃহকোণে প্লট সংস্থাপন প্রচেষ্টা স্বত্বেও এর সার্বিক অসার্থকতা পাঠকের আরো দুঃখের কারণ।

'করুণা'র কাহিনি প্রথম পুরুষে বিবৃত হলেও উত্তম পুরুষে লেখক সে কাহিনিতে টীকা-টিপ্পনি সর্বদা করে চলেছেন। তিনি সর্বজ্ঞ, ভূত-ভবিষ্যৎ সব ঘটনা তাঁর জিহ্বাগ্রে। সংলাপ-বিরল, বিবৃতিধর্মী আখ্যান পরিবেশনায় আলোচ্য কাহিনিটির রীতি অনেকটা যেন Tale প্রকৃতির; প্রধানত বিবরণধর্মী, এর মধ্যে মানব-জীবনের রহস্যরঞ্জিত সৃষ্টির সুযোগ বড় অল্প। 'করুণা'র পরিকাঠামোয় এই যে প্রথম থেকে বিহারীলালের রোমান্টিক প্রকৃতির বিষণ্ণ প্রতিচিত্র, 'পৌল বর্জনী'র অশ্রুসিক্ত পরিবেশ, এবং 'বনফুল', 'ভিখারিণী' ও 'কবি কাহিনী'র নায়িকাদের রোদনভরা জীবনকাহিনীর আভাস একসঙ্গে মিশে 'সূচনা' সৃষ্টি করেছে, সমস্ত প্লটে তারই ক্রম-বেদনাঘন বিবরণ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। যে শিল্পী 'বনফুলে' আপন অস্তিত্ব একাত্ম করে করুণ রস পরিবেশন করেছেন, 'করুনা' উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য জীবনের একটি অধ্যায় একই রঙে রেখায় সমাপ্ত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, গ্রন্থা ১০/৫৫ ।
২) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনকথা, বিশ্বভারতী, ১৯৩৫, পৃ: ১৫।
৩) রবীন্দ্র-জীবনী; পৃ. ১২০ ।
৪) রবীন্দ্র-জীবনী; পৃ. ৭০ ।
৫) বিশ্বভারতী পত্রিকা ২য় বর্ষ, ১৩৫০, চতুর্থ সংখ্যা।
৬) রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড - জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, আত্মপরিচয় পৃ: ১৬৮ ।
৭) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কথাকোবিদ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় সং, ১৯৮৫ কলিকাতা, পৃঃ ৮১ ।
৮) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসৃষ্টি - সমীক্ষা, প্রথম খন্ড, কলিকাতা ১৯৬৬, পৃঃ ৩১৯ ।
৯) ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।
১০) চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য ।
১১) অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।
১২) অষ্টম পরিচ্ছেদ।
১৩) প্রথম পরিচ্ছেদ ।
১৪) দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।
১৫) ষোড়শ পরিচ্ছেদ।
১৬) একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বউ-ঠাকুরাণীর হাট

পূর্বাভাস

'ভারতী'-তে ১২৮৮ কার্ত্তিক থেকে ১২৮৯ আশ্বিন পর্যন্ত ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' ১২৮৯ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে[১] গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' রচনা যখন আরম্ভ হয়, তখন 'হৃদয় নামক অরণ্যে'-র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কেবলই ঘুরে ঘুরে মেতেছেন; আবেগ ও সমস্ত চিন্তাগুলি তখনও অস্পষ্ট কুয়াশার জালে আচ্ছন্ন। এই সময়ের 'সন্ধ্যা-সংগীত' এমনকি কতকাংশে 'প্রভাত- সংগীত' কাব্যেও যেমন, এই দুটি উপন্যাসেও তেমনই বাস্তব সংসারের দৃঢ়ত্বের পরিচয় বিশেষ কিছু নেই। এই অস্ফুট অপরিণত অবস্থার প্রকাশগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংস্রব হইতে বহুদূরে যেমন করিয়া গন্ডিবদ্ধ হইয়া মানুষ হইয়াছিলাম তাহাতে লিখিবার সম্বল পাইব কোথায় ?"[২] প্রায় এই সময়কার সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে অন্যত্র বলছেন, "তখন বিদ্যাও ছিল না, জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল অল্প, তাই গদ্যপদ্য যাহা লিখিতাম তাহার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশি।"[৩] 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' 'সূচনা' অংশে কবি বলেছেন: "অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে এক সময়ে মন যে প্রবেশ করলে, ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াতে লাগল, এ বোধ হয় কৌতূহল থেকে। প্রাচীর-ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়ে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা গেল 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' গল্পে"। একই বছরে রচিত (১৮৮৩) 'প্রভাত- সংগীত' কাব্যের সূচনাতে কবি জানালেন, "..... সন্ধাসংগীতের পর্বে আমার মনে কেবল মাত্র হৃদয়াবেগের গদগদভাষী আন্দোলন চলেছিল প্রভাতসংগীতের ঋতুতে আপনা-আপনি দেখা দিতে আরম্ভ করেছে একটা আধটা মননের রূপ, অর্থাৎ ফুল নয় সে, ফসলের পালা, সেও অশিক্ষিত বিনা চাষের জমিতে।"[৪] 'প্রভাতসংগীত'-এ কবির মন বহির্বিষয়ের দিকে প্রথম প্রসারিত হয়েছে, 'হৃদয়াবেগের গদগদভাষী আন্দোলন' থেকে আরেকটি আকাঙ্ক্ষা জেগেছে — বহির্বিষয়ী চিত্তের প্রথম উন্মেষের সঙ্গেই তাই কবি উপন্যাসে হাত দিয়েছেন।

'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস। এখানে বৈচিত্র্যকোলাহলময় রঙ্গভূমি ছায়ার মত অস্পষ্ট, ইতিহাস একটা অর্থহীন আশ্রয় মাত্র, ইতিহাসের জীবন ও উদ্দীপনা উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার কোনও পরিচয় কোথাও নেই। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "বউ-ঠাকুরাণীর হাট'-এর গল্পাংশ প্রতাপাদিত্যের জীবনী থেকে গৃহীত ; প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধীপ পরাজয়' (১৮৬৯) যা ছোটবেলায় মা-বৌদিদের আসরে পড়ে শোনাতেন, সেই বৃহৎ গ্রন্থের অনুবর্তন করে এই নভেল লেখা ; কবি ঐ গ্রন্থ ছাড়াও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী নানা সূত্রে সংগ্রহ করেন।"[৫] বাংলা সাহিত্যে প্রতাপাদিত্য কাহিনির সূচনা অষ্টাদশ শতকের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'। প্রতাপাদিত্যের কাহিনি আশ্রয় করে কবি লিখেছেন মানসিংহের উপাখ্যান। এরপর প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১)। ১৮৫২খ্রী-তে বার্লিনে মুদ্রিত W.Pertsch সম্পাদিত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতং' গ্রন্থখানিতে প্রতাপাদিত্যের জীবন-কথা স্থান পেয়েছে। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে আর একটি গ্রন্থ পন্ডিত হরিশ চন্দ্র তর্কালঙ্কার রচিত 'মহারাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮৫৩)। এছাড়াও গেরেট সাহেবের 'Ain-i-Akbari' ও ওয়েস্টল্যান্ডের (J.Westland) 'যশোর', বেভারিজের 'The District of Bakargang' প্রভৃতিতে প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ আছে। জেসুইট পাদরী

পাইমেনটো (A. R. P.Nicolas Pimenta) এবং ডুরারিকের (LE.P.Peirre DU Jarric) বর্ণনায় প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালের ইতিবৃত্ত জানা যায়। প্রতাপাদিত্যের জামাতা রামচন্দ্র রায়ের বিবরণ, ব্রজসুন্দর মিত্রের 'চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবরণ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে (১৮৭৫)। বেভারিজের 'The District of Bakargang' গ্রন্থে এবং Journals of Asiatic Society-র মধ্যেও রামচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালের নানা তথ্য উল্লিখিত হয়েছে। প্রতাপচন্দ্র ঘোষের উপন্যাসটি ছাড়াও উমেশচন্দ্র মিত্রের 'প্রতাপ সংহার' (১২৮৬) রচিত হয়েছিল। বোধকরি 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' রচনার পূর্বে উক্ত সকল গ্রন্থ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ঐতিহাসিক প্রতাপাদিত্য একটি একমুখী, সমতল-প্রকৃতির হৃদয়হীন, চরম-নিষ্ঠুর আত্মীয়-পেষণ যন্ত্রমাত্র।

বিশ শতকের সূচনা থেকেই প্রতাপাদিত্যকে 'জাতীয় বীররূপে' প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস দেখা যায়। জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে প্রতাপাদিত্যের বীর মূর্তিটিকে প্রতিষ্ঠা করে তাঁকে বাংলার 'শেষবীর' রূপে সাহিত্য- সঙ্গীতে চিত্রিত করা শুরু হয় এই সময় থেকেই। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা বিনোদের 'প্রতাপ-আদিত্য', হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গের শেষবীর' প্রভৃতি গ্রন্থের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এমন কি তিলক প্রবর্তিত 'শিবাজী উৎসব'-এর অনুকরণে সরলা দেবী বৈশাখী পূর্ণিমাতে (১৯০৩) 'প্রতাপাদিত্য উৎসবের সূচনা করেছিলেন'। উনবিংশ শতকের শেষ পর্বে যখন রবীন্দ্রনাথ 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' লেখেন তখন প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে কোন সংস্কার গড়ে ওঠেনি। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের 'সূচনা'-তে তিনি বলেছেন -'আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে-সময়কার ইতিহাস লেখকদের উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময় এই বই অসঙ্কোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।'[৬] রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন -'............ ইতিহাস ও উপন্যাসকে এক সঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়-বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে ; কেহ কাহারও অগ্রবর্তী না হয়, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়।....। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি-একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই একসঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন। এইজন্য চিত্রে নৌকার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়াছে , তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।'[৭] রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' আলোচনাকালে স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন যে ঐতিহাসিক উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণের সুযোগ অপেক্ষাকৃত কম। কারণ ইতিহাসের বৃহৎ পটভূমিকায় উদ্দাম নির্ঝরিণীর মত যে ঘটনা স্রোত তীব্র বেগে ছুটে চলেছে, সেখানে মানবমনের সুখদুঃখ বিশ্লেষণ করার অবকাশ নেই। ফলতঃ কবিত্বও আহত। উপন্যাসের বিষয়বস্তু ইতিহাস ও রোমান্সের মিশ্র উপাদানে নির্মিত। উপন্যাসে বিধৃত সামগ্রিক কাহিনিটিই নাট্যধর্মী দ্বন্দ্ব ও 'সাসপেন্স'-এর এক বিরামহীন প্রবাহ। উপন্যাসটির কাহিনি আশ্রয় করে পরবর্তীকালে রচিত 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩১৬) ও 'পরিত্রাণ' (১৩৩৬) নাটকদ্বয় কাহিনিটির অন্তর্নিহিত পরিচয়বাহী।

সমগ্র কাহিনিকে আদি, মধ্য ও অন্ত-পর্বে ভাগ করে গেলেও দেখি আমাদের হিসাব অনুসারে আদি ও মধ্য পর্বের শেষ হয়েছে দুটি চুড়ান্ত নাটকীয় ঘটনায় — দুটি নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডে। প্রথমটি সুরমার (১৭শ পরিচ্ছেদ) ও দ্বিতীয়টি বসন্ত রায়ের প্রাণনাশের ঘটনা (৩৩শ পরিচ্ছেদ)। উপন্যাসটির সমগ্র কাহিনির কেন্দ্রে একটি তীব্র নাট্যদ্বন্দ্বের 'আইডিয়া' আছে। হৃদয়হীন জড়শক্তি ও হৃদয়ধর্মের, অশুভ ও শুভ -এর সংঘাত। আর সেই দ্বন্দ্ব সংঘাত কেবল যে বাইরের ঘটনাই প্রকাশ পেয়েছে তা নয়, তা অনেকসময়েই মনোজীবনের ছবিতেও ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে উদয়ের চিন্তায় ও

অনুভবে, বিভার বিষণ্ণতায় — তার করুণ মুখচ্ছবিতে, বসন্ত রায়ের অন্যায়ের-উর্ধ্বচারী এক বৈরাগ্যসুন্দর জীবনবোধে। — যে পরিবেশে, প্রকৃতিতে অথবা স্বল্পতম চরিত্রে কবির শিল্পিত টানে রং ধরেছে — সেখানেই কবিত্বের 'ফসল' পসরা সাজিয়ে এনেছে।

চরিত্র-চিত্রণে কবিত্ব

'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে চরিত্রচিত্রণে ঔপন্যাসিকের প্রত্যাশিত গূঢ় সঞ্চারী বিশ্লেষণী প্রবণতা বা সামর্থ্য প্রকাশ পায় নি। উপন্যাসটির 'সূচনা' তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'চরিত্র গুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি। তারা আপন চরিত্রবলে, অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে।' ইতিহাস ও রোম্যান্সের মিশ্র উপাদানের সাহায্যে অন্তরদ্বন্দ্বময় চরিত্র-বিন্যাস বোধকরি সম্ভব নয়। রোম্যান্স-সুলভ চমকপ্রদ কাহিনির ফাঁকেই বসন্ত রায়, উদয়াদিত্যের মতো চরিত্রে জীবনের আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশার আলোছায়ার ঈষৎ চকিত বিচ্ছুরণ যেন মাঝে মাঝে দেখা যায়। কবির 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্বের সমকালীন সৃষ্টি এই উপন্যাসের উদয়াদিত্য ও বিভা চরিত্রে কবিমানসের দুঃখবাদের প্রতিফলন ঘটেছে।

প্রকৃতির রূপ-ভাষ্য (পরিবেশ)

উপন্যাসটির কাহিনিতে কিছু ইতিহাস ও অনেকখানি রোমাঞ্চকর ঘটনার উপাদান আছে বলে, এখানে পরিবেশ-বর্ণনাকে কোথাও কোথাও নাট্যমঞ্চের বর্ণাঢ্য দৃশ্যপটের মতো মনে হয়। প্রথম পরিচ্ছেদের একেবারে সূচনায় -'রাত্রি অনেক হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না। ....উদয়াদিত্য তাঁহার শয়নগৃহের বাতায়নে বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী সুরমা।' অথবা, সপ্তম পরিচ্ছেদের গোড়ায় বর্ণিত রাজা রামচন্দ্র রায়ের রাজকক্ষের পরিবেশ বর্ণনা যেন মঞ্চের স্থির পশ্চাৎপট। অন্যদিকে,তৃতীয় পরিচ্ছেদের আরম্ভে যুবরাজ উদয়াদিত্যের অশ্বরোহণকালের রাত্রিকালীন পরিবেশের বর্ণনা গতিবেগে জীবন্ত। তবে 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' -এর পাঠকমাত্রেরই জানা আছে যে, উপন্যাসটি যদিও বিরল-পরিবেশ নয়, তবু এতে ইতিহাসের প্রতিবেশ আদৌও তেমন পরিস্ফুট হয় নি। বরং ব্যক্তিসত্তার যে উন্মোচন রবীন্দ্র উপন্যাসের মুখ্য অণ্বিষ্ট, তা এখান থেকেই প্রথম আভাসিত হয়েছে বলে এখানে ইতিহাস-চিত্রের চেয়ে প্রকৃতি-পটের — বলতে পারি, ব্যক্তির মানস দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা প্রকৃতি-পটের বর্ণনা চিত্র অধিকতর তাৎপর্য ও গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রাণাধিক প্রিয় অগ্রজ উদয়াদিত্য যখন প্রাসাদসংলগ্ন কারাগারে রুদ্ধ, তখন বিভার হতাশ-ম্লান বিষাদ-মগ্ন মনের দর্পণে নিসর্গ-পটের চিত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ।

'সূর্য আজ মেঘের মধ্যেই উঠিয়াছে, মেঘের মধ্যেই অস্ত গেল।..........আঁধারের উপর আঁধার ঘনাইতে লাগিল। দিগন্ত হইতে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘনশ্রেণী ঝাউগাছগুলির মাথার উপর অন্ধকার এমনি করিয়া জমিয়া আসিল যে,........ ঠিক মনে হইতে লাগিল যেন সহস্র দীর্ঘ পায়ের উপর ভর দিয়া একটা প্রকান্ড বিস্তৃত নিস্তব্ধ অন্ধকার দাঁড়াইয়া আছে। রাত হইতে লাগিল, রাজবাড়ির প্রদীপ একে একে নিবিয়া গেল। ...... রাত্রি দুই প্রহরের পর একটি বাতাস উঠিল, অন্ধকারে গাছপালা গুলি হা হা করিয়া উঠিল।'[৮]

বিশাল রাজবাড়ির পাষাণকারা থেকে তারা অবচেতন মনের অবরুদ্ধ স্বপ্ন অধ্যাস বহন করে সে আশ্রয় নিয়েছে পেছনের বাগানের দিগন্ত প্রসারী প্রকৃতির আলয়ে। বক্তা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে নিজের এবং পাঠকের ভারসাম্য যখন ঔপন্যাসিকের লেখনীতে ঘটে, তখন শিল্পী হন কবি, তিনি তখন মানুষের মনের গহনের কবিকর্ম দেখতে পান। বিভার ব্যক্তি-মানস এমনি তিনি এক দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছেন আর বর্ণনা করেছেন। ঘনায়মান অন্ধকারে শ্রেণীবদ্ধ ঝাউ গাছ মানুষের মত এসে যেন বিভার পাশে দাঁড়াল, সেই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে বিভা যেন তার ভবিষ্যৎ দেখতে পেল। রাত্রি দুই প্রহরে সে নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে স্পষ্ট অনুভব করল,''বাতাস অতি দূরে হু হু করিয়া শিশুর কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। বিভার মনে হইতে লাগিল, যেন দূর দূর দূরান্তরে সমুদ্রের তীরে বসিয়া বিভার সাধের স্নেহের প্রেমের শিশুগুলি দুই হাত বাড়াইয়া কাঁদিতেছে, আকুল হইয়া তাহারা বিভাকে ডাকিতেছে, তাহার কোলে আসিতে চায় ....বিভার প্রাণ যেন কাতর হইয়া কহিল, 'কে রে, তোরা কে, তোরা কে কাঁদিতেছিস, তোরা কোথায় ?'''[৯]

কবির মনের মাধুরী মিশিয়ে এই জীবন্ত, মর্মস্পর্শী শিল্পরূপ পাঠককেও নিজের অন্তরের অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। দুঃখের বিষয় এমন বস্তুনিষ্ঠ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ 'বউ-ঠাকুরানীর হাটে' সহজলভ্য নয়। প্রকৃতি-সংশ্লিষ্ট, প্রকৃতির সঙ্গে একাঙ্গীভূত মানুষের এই সার্বিক একাত্মতার ক্ষণে যে রোম্যান্টিক তুরীয় রসের সৃষ্টি হয়, তাকেই বলা যায় Cosmic বা মহাজাগতিক রসানুভূতি। প্রক্রিয়াটি কাব্যে কঠিন না হলেও উপন্যাস সাহিত্যে সহজসাধ্য নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে এর অনুবর্তন কবিত্বের আলোকে উজ্জ্বল।

'ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ'থেকে 'চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ'-এ দুঃখান্তক সমাপ্তি পর্বের আগে যেন ঈশ্বর সৃষ্ট দুই মানব-শিশুর নির্বিকারচিত্তে, নিরঙ্কুশভাবে প্রকৃতির নির্মল, বিস্তৃত পরিবেশে জীবন উপভোগ করার দৃশ্য। জীবন মৃত্যুর শঙ্কা যেখানে থাকে না, প্রকৃতিরই সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানুষ সেখানে গান গায়,গল্প করে, নির্বিরোধে জীবন কাটায়।

আর কি আমি ছাড়ব তোরে।
মন দিয়ে মন নাই বা পেলেম
জোর করে রাখিব ধরে।
শূন্য করে হৃদয়-পুরী প্রাণ যদি করিলে চুরি
তুমিই তবে থাকো সেথায়
শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে।[১০]

চারণকবির প্রতীক দাদামহাশয় এবং তার স্নেহের পুত্তলি উদয়ের যেন নরক যন্ত্রণার পর মুক্ত হয়ে রায়গড়ে এসে তাদের নবজন্ম ঘটেছে। প্রকৃতি এখানে এত সৌন্দর্যময় , আকাশে এখানে এত নীল, এত প্রশান্ত, প্রশস্ত, জীবন এখানে এত আনন্দময়, এই দুটি মানুষ তা এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে,ভাবছে এমনিভাবেই তারা চিরকাল রায়গড়েই থাকবে।

'অনেক দিনের পর চারিদিকে গাছপালা দেখিতেছেন, আকাশ দেখিতেছেন, দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত উন্মুক্ত উষার আলো দেখিতেছেন, পাখির গান শুনিতেছেন, দূর দিগন্ত হইতে হু হু করিয়া সর্বাঙ্গে বাতাস লাগিতেছে, রাত্রি হইলে সমস্ত আকাশময় তারা দেখিতে পান, জ্যোৎস্নার প্রবাহের মধ্যে ডুবিয়া যান, ঘুমন্ত স্তব্ধতার প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকেন।'[১১]

ভাষার বন্ধন

'বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এর শুরুতে অনায়াস গতিসৃষ্টির জন্য সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যের ব্যবহার দেখা যায়।

'রাত্রি অনেক হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না।'[১২]

কাহিনির বা পরিবেশ যেখানে নাটকীয় উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত, সেখানেও সংক্ষিপ্ত বাক্যের সার্থক ব্যবহার করেছেন।

'রাত্রি গভীর হইল। অনেকগুলি সন্ধ্যার তারা অস্ত গেল, অনেকগুলি গভীর রাত্রের তারা উদিত হইল। প্রাকারতোরণস্থিত প্রহরীদের পদশব্দ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। সমুদয় জগৎ সুষুপ্ত, নগরের সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে, গৃহদ্বার রুদ্ধ, দৈবাৎ দু-একটা শৃগাল ছাড়া একটি জনপ্রাণীও নাই। উদায়াদিত্যের শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সহসা বাহির হইতে কে দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল।'[১৩]

'বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এর মত রোম্যান্স-রসসিক্ত উপন্যাসে ঘাত-প্রতিঘাতময় বহিরঙ্গ ঘটনায় বাহুল্য আছে ঠিকই, কিন্তু যেখানে ভাবগম্ভীর নিসর্গ বর্ণনা কিংবা অন্তরের গূঢ় অনুভবের প্রকাশ ঘটেছে, সেখানে দীর্ঘায়িত বাক্যের সাহায্যে দীর্ঘছন্দ তরঙ্গের মতো একধরণের প্রবাহমান গীতিময়তা সঞ্চার করতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক।

'কেবল সেই বায়ুহীন শব্দহীন দিনরাত্রিহীন জনশূন্য তারাশূন্য দিগ্‌দিগন্তশূন্য মহান্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে চারিদিক হইতে ক্রন্দন শুনিতে পাইল, কেবল বাতাস দূর হইতে গর্জন করিতে লাগিল -হু হু।'[১৪]

ভাষারীতিতে যে কাব্যময়তা, সেই কাব্যধর্মের আর একটি মুখ্য লক্ষণ ব্যঞ্জনাধর্ম বা ইঙ্গিতময়তা। এই ব্যঞ্জনা গর্ভ ভাষা 'বউ-ঠাকুরানীর হাট' উপন্যাসে এক স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছে।

(১) 'অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু পথ দীর্ঘ সরল প্রশস্ত বলিয়া কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। স্তব্ধ রাত্রে অশ্বের খুরের শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, দুই-একটি কুকুর ঘেউ-ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, দুই-একটা শৃগাল চকিত হইয়া পথ ছাড়িয়া বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকাইতেছে। আলোকের মধ্যে আকাশের তারা ও পথপ্রান্তস্থিত গাছে জোনাকি ; শব্দের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকার অবিশ্রাম শব্দ, মনুষ্যের মধ্যে কঙ্কাল-অবশেষ একটি ভিখারি বৃদ্ধা গাছের তলায় ঘুমাইয়া আছে।'[১৫]

(২) 'উদয়দিত্য ও বসন্ত রায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অন্ধকার ঘরে পরস্পরের মুখ অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। ঘরের মধ্যে যেন অদৃশ্য একজন কে -অন্ধকার বল, আশঙ্কা বল, অদৃষ্ট বল — বসিয়া আছে, তাহার নিশ্বাস-পতনের শব্দ শুনা যাইতেছে।'[১৬]

(৩) 'বর্ষার দিন খুব মেঘ করিযাছে, সমস্ত দিন ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। দিনটা আঁধার করিয়া রহিয়াছে, বাগানের গাছপালাগুলা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। এক-এক বার বাতাস দিতেছে ও ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ছাট আসিতেছে। উদয়াদিত্য চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, দিগন্তে বিদ্যুৎ হানিতেছে। বৃষ্টির অবিশ্রাম শব্দ কেবল যেন বলিতেছে, "সুরমা নাই — সে নাই।" মাঝে মাঝে আর্দ্র বাতাস হু হু করিয়া আসিয়া যেন বলিয়া যায়,"সুরমা কোথায় !"[১৭]

'বউ-ঠাকুরানীর হাট'উপন্যাসে যে-সব অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়, সেগুলি অনেক সময়েই রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। উপমা-উৎপেক্ষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত —

(১) বন্যার মুখে ভগ্নচূর্ণ গ্রামপল্লীর মতো ঝড়ের মুখে ছিন্নভিন্ন মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে।[১৮]

(২) আজ তাহার চোখে প্রভাতের শিশিরের মতো অশ্রুজল দেখা দিল,
আজ তাহার অধরে অরুণকিরণের নির্মল হাসি ফুটিয়া উঠিল।[১৯]

(৩) ভীষণ অদৃষ্টের মতো নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়ে
তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন।[২০]

উল্লেখপঞ্জী

১. ইং ১১ই জানুয়ারি, ১৮৮৩
২. জীবন-স্মৃতি, পৃ. ২২০
৩. তদেব, পৃ. ২৬১
৪. সূচনা, প্রভাত-সংগীত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খন্ড
৫. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনকথা, কলিকাতা, ১৯৮৮
৬. বউ-ঠাকুরানীর হাট, সূচনা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খন্ড
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আধুনিক সাহিত্য, রাজসিংহ
৮. বউ-ঠাকুরানীর হাট, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ
৯. তদেব
১০. বউ-ঠাকুরানীর হাট, ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ
১১. তদেব
১২. বউ-ঠাকুরানীর হাট, প্রথম পরিচ্ছেদ
১৩. তদেব
১৪. বউ-ঠাকুরানীর হাট, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ
১৫. ঐ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ
১৬. ঐ, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
১৭. ঐ, বিংশ পরিচ্ছেদ
১৮. ঐ, একবিংশ পরিচ্ছেদ
১৯. ঐ, পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ
২০. তদেব

রাজর্ষি

পূর্বাভাস

১৮৮৭ সালে বই হয়ে প্রকাশের আগে রাজর্ষি 'বালক' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল। ১৯৪০ -এ রবীন্দ্রনাথ জানালেন :

"..........মাসিক পত্রের পেটুক দাবি সাহিত্যের বৈধ ক্ষুধার মাপে পরিমিত হতে চায় না।....... বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে। ফসল-খেতের কিনারা সেদিকটাতে চাষ পড়েনি, আগাছার জঙ্গল হয়ে উঠেছে। সাময়িক পত্রের অবিবেচনায় প্রায়ই লেখনীর জাত নষ্ট হয়। বিশেষত যেখানে শিশু পাঠকই লক্ষ্য সেখানে বাজে বাচালতার সংকোচ থাকে না। অল্প বয়সের ছেলেদের সম্মান রাখার দরকার আছে, একথা শিশু সাহিত্য লেখকেরা প্রায় ভোলেন .....দুধের বদলে পিটুলি গোলা যদি ব্যবসার খাতিরে চালাতেই হয় তবে সে ফাঁকি বরঞ্চ চালানো যেতে পারে বয়স্কদের পাত্রে, তাতে তাদের রুচির পরীক্ষা হবে, কিন্তু ছেলেদের ভোগে নৈব নৈব চ।"[১]

পত্রিকা পরিচালকদের অনুরোধে তাঁকে কাহিনী ১৫ থেকে ৪৪ অধ্যায় এবং উপসংহার পর্যন্ত টেনে বাড়াতে হয়েছে।

উপন্যাসটির সমগ্র কাহিনীর তলে তলে একটি 'আইডিয়ার' স্রোত বহমান আর উপন্যাসটির কাহিনীর ধারা মুখ্যত গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ঐ 'আইডিয়া'কে আশ্রয় করে। বলাবাহুল্য সেই 'আইডিয়ার' সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যক্তির আত্মজিজ্ঞাসার সমস্যা। আর উপন্যাসের কাহিনী যে ব্যক্তির জীবনের এক 'আইডিয়া'কে আশ্রয় করে অর্থবহ হয়ে উঠতে চেয়েছে — তার এক নিশ্চিত প্রমাণ উপন্যাসটির 'রাজর্ষি' নামকরণ। প্রসঙ্গত স্মরণীয় এর আগেই দুটি উপন্যাসের ('করুণা' ও 'বউঠাকুরানীর হাট') নামকরণে এই ধরণের কোন তত্ত্বের আভাস ছিল না। বস্তুত এই তত্ত্বপ্রবণতা 'রাজর্ষি'-র কাহিনী বিন্যাসকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে। 'সূচনা' অংশে বর্ণিত 'এ আমার স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস' বালকদের কতখানি বোধগম্য এবং উপভোগ্য তা সন্দেহ থেকে যায়।

"স্বপ্নে দেখলুম — একটা পাথরের মন্দির। ছোট মেয়েকে নিয়ে বাপ এসেছেন পুজো দিতে। সাদা পাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়! কী বেদনা ! বাপকে সে বার বার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা এত রক্ত কেন ! বাপ কোনমতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল জেগে উঠেই বললুম গল্প পাওয়া গেল। .....আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে শক্তিপূজার বিরোধ।"

'রাজর্ষি'-র পূর্বে রবীন্দ্রনাথ 'মুকুট' নামে ১৬ পৃষ্ঠার একটি ছোটদের উপযোগী ক্ষুদ্র কাহিনি 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। যাকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'ক্ষুদ্র উপন্যাস'।[২] 'মুকুট'-এর বিষয় ছিল ভ্রাতৃবিরোধ, আর রাজর্ষিতে সৌভ্রাতৃত্বের অন্তেষ্টির ওপর ঔপন্যাসিক বিশ্বভ্রাতৃত্বে উপনীত হবার প্রয়াসী হয়েছেন। 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি বলেছেন — "এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া 'রাজর্ষি' গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে 'বালকে' বাহির করিতে লাগিলাম।"

'রাজর্ষি' ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস।উপন্যাসটি শেষ করে তিনি লিখেছেন,"শেষ দুই প্যারাগ্রাফ শ্রীযুক্তবাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত।" তেতাল্লিশ তম পরিচ্ছেদের শুরুতে লিখেছেন 'ষ্টুয়ার্ট কৃত বাংলার ইতিহাস হইতে এই পরিচ্ছেদ সংগৃহীত।' ত্রিপুরার রাজাকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, '......আমি ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া 'রাজর্ষি' নামক একটি উপন্যাস লিখিতেছি। কিন্তু তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পারি নাই।......এখন যদিও অনেক বিলম্ব হইয়াছে, তথাপি মহারাজ যদি গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার

ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সবিশেষ ইতিহাস আমাকে প্রেরণ করেন, তবে আমি যথাসাধ্য পরিবর্তন করিতে চেষ্টা করিব।"[৩] ত্রিপুরারাজ 'রাজরত্নাকর' নামে সংস্কৃত পুস্তকের প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠিয়ে দেন। 'রাজর্ষি' ১ম সংস্করণ পরিশিষ্টে তা ছাপা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহাসিক বিবরণ দেখেও পরবর্তী সংস্করণে তথ্যের চ্যুতি সংশোধনের চেষ্টা করেননি। কারণ সে সব তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। অর্থাৎ পূর্ব-প্রচলিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের শিকড় ধরে নাড়া দিয়েছেন। রাজনীতি অর্থাৎ রাজ্য ভাঙাগড়ার বিচিত্রখেলার স্থলে চরিত্রগুলি 'বৃহৎ একটি ভাবে'-র কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। 'বউঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাসদুটি সম্বন্ধে ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ মন্তব্য করেছেন —"আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক উপন্যাসরূপে প্রতীত হলেও ঐ দুই গ্রন্থে ইতিহাস রস ও ইতিহাস দৃষ্টির যথার্থ স্থান নেই। ইতিহাসবিচ্ছিন্ন মানবরস ও জীবনদৃষ্টিই' এই উপন্যাস দুটির আকর্ষণ।"[৪]

আদিপর্বের তীব্র নাট্য প্রবণতার সঙ্গে শেষ দুই পর্বের কাহিনীর সরলরেখাধর্মী গতির বৈপরীত্য, মধ্যপর্বের কাহিনীর কেন্দ্রে গোবিন্দমাণিক্যের অনুপস্থিতি, আদি পর্বের তুলনায় মধ্য পর্বের কাহিনীর অপ্রয়োজনীয় স্ফীতি এবং অন্ত্যপর্বের উপসংহারে নিতান্তই সংক্ষিপ্তসার ভঙ্গীতে কাহিনী পরিণামের বিবৃতি দান — সবই তরুণ ঔপন্যাসিকের কাহিনী বিন্যাসে সঙ্গতিচেতনার অভাব বোধই সূচিত করে।

অলংকরণ : ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'রাজর্ষি' চিত্রাঙ্কিত করেছিলেন হরিশচন্দ্র হালদার লিথোচিত্রের মাধ্যমে।[৫]

চরিত্র

প্রথমত: আদর্শবাদী পূর্ব-পরিকল্পনা এবং আদ্যন্তুতার চাপ, দ্বিতীয়ত: বালকদেরজন্য লেখা বলে বিবিধ সীমাবদ্ধতা, তৃতীয়ত: পত্রিকার ফরমায়েশ মাফিক আয়তনের অতিবিস্তারের জন্য 'রাজর্ষি' উপন্যাসটি যেমন পরিণত হয়ে উঠতে পারেনি তেমনি কবিত্ব সঞ্চারেও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। উপন্যাসটির চরিত্রগুলির জীবনের গভীরে নামবার সিঁড়ি কোথাও নেই। নেই তীক্ষ্ম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দুশ্ছেদ্য জটিলতা, বিপরীতমুখী মিশ্র প্রবণতা, নেই যথার্থ -বিবর্তন। ধর্মাদর্শের গাঢ় প্রলেপ কাউকে নষ্ট করেছে ; লেখকের পছন্দ-অপছন্দ অন্য অনেকের সম্ভাব্য রূপকে ঠিকঠাক ফুটে উঠতে দেয়নি। নীহাররঞ্জন রায় 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে বলেছেন — ''রাজর্ষি '-তেও রঘুপতি, নক্ষত্ররায় অপেক্ষা গোবিন্দমাণিক্য ও কোমল-হৃদয় হাসি ও তাতার, জয়সিংহের দ্বিধাগ্রস্ত জীবনের সৌন্দর্যের প্রতিই কবির পক্ষপাত। এই স্বচ্ছ কোমল সুকুমার, মুক্ত উদার জীবন-প্রবাহই রবীন্দ্র-কবি-চিত্তকে দোলা দিয়াছে।''

গোবিন্দমাণিক্য

'রাজর্ষি'-তে দেখি 'বউঠাকুরাণীর হাট'-এর চেয়ে 'পুতুলের ধর্ম' থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন লেখক। তবু চরিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। উপন্যাসটিতে নায়ক গোবিন্দমাণিক্যের ব্যক্তিসত্তার 'হয়ে ওঠা'-র একটা ধারাবাহিক ছবি লেখক আঁকতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু গোবিন্দমাণিক্যের সত্তার অন্তরদ্বন্দ্বজনিত যন্ত্রণা তীব্রতা নিয়ে ফুটে উঠে নি।তাছাড়া ব্যক্তিসত্তার আদি-মধ্য-অন্তব্যাপী সমগ্র চিত্র পাইনে। উপন্যাসে বিবৃত ঘটনার আগে যা ছিলেন, উপন্যাসের সূচনায় হঠাৎ একটা ঘটনায় তা থেকে যেন একেবারে নতুন মানুষ হয়ে উঠলেন গোবিন্দমাণিক্য। অর্থাৎ গোবিন্দমাণিক্যের এই 'হয়ে ওঠা'-র পিছনে কোন অনিবার্য মানসিকতার টান নেই। ব্যক্তিসত্তার ক্রম-উন্মোচন যে আত্মিক দ্বন্দ্ব-সংকটের মধ্য দিয়ে সজীব ও প্রত্যয়সিদ্ধ হয়ে ওঠে, তা রূপায়িত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দমাণিক্য উপন্যাসের প্রথম থেকেই রাজর্ষি হয়ে আছেন, ক্রমশ বিবর্তিত হয়ে ওঠেন নি।

তবু, গোবিন্দমাণিক্য চরিত্রের যে দিকটি কাব্যময় তা হাসি তাতা এবং ধ্রুব প্রসঙ্গে। রাজর্ষির প্রথম পরিচ্ছেদটিতে ভোরবেলার পটভূমি। দুটি সুন্দর অপাপবিদ্ধ শিশুর সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রথম স্মরণীয় পরিচয়ের যথাযোগ্য কালপট। উপন্যাসটির ভূমিকা স্বরূপ প্রথম পরিচ্ছেদের এই ভোরবেলার ঘটনাটি রাজর্ষি গোবিন্দমাণিক্যের উত্তরকালের সমগ্র কার্যোদ্যমের প্রেরণারূপে যেন কাজ করেছে। একদিন ভোরবেলায় গোমতী নদীর তীরে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন ভুবনেশ্বরী মন্দিরের ঘাটে স্নান করতে এসে হাসি ও তাতা নামে দুটি বালিকা ও বালককে ফুল পেড়ে দেওয়ার সূত্রে রাজার তাদের সঙ্গে পলিচয় হয়। ''এইরূপে সেদিনকার সকালে ....এই দুইটি ......পবিত্র হৃদয়ের আশ মিটাইয়া ফুল তুলিয়া দিয়া তাঁহার যেন দেবপূজাল কাজ হইল।'' উপন্যাসটির সূচনাতেই গোবিন্দমাণিক্যের অন্তরের পবিত্র জীবনবোধের স্পর্শ পাঠকমনে সঞ্চারিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রক্তের বিভীষিকায় একটি শিশুপ্রাণ কেমন করে গোবিন্দমাণিক্যের কোলে মৃত্যুর শীতলতায় বিলীন হয়ে গেল, তারই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানেই কোমলতার সঙ্গে হিংস্রতার দ্বন্দ্বের বীজ উপ্ত হয়েছে। হাসি মৃত্যুতে রাজার মনে প্রতিক্রিয়া ঘটল ভীষণভাবে, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, ''মা, এ রক্তস্রোত আমি নিবারণ করিব।'' এখানেই রাজপুরোহিত রঘুপতির সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। জয়সিংহ যখন তাঁকে বলির স্বপক্ষে শাস্ত্রবিধি দেখিয়েছেন, তখন গোবিন্দমাণিক্য উত্তর দিয়েছেন - ''হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।'' একদিন যে রক্তস্রোতের রেখা তাঁর মনে সংশয় জাগায়নি একটি শিশুর ভয়ার্ত কণ্ঠের প্রশ্ন তাঁর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে গোবিন্দমাণিক্যের সমগ্র চরিত্রধর্মের রূপান্তর ঘটিয়েছে। এই পরিবর্তনে

আকস্মিকতা থাকলেও রাজকর্মে বাঁধা 'ছোট আমি'-র মুক্তি ঘটেছে হাসি-তাতা প্রসঙ্গে যেখানে 'বড় আমি' প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে এই ভোরের কাব্যিক পটভূমিতে।

রাজা গোবিন্দমাণিক্যের অন্তরের পরম আশ্রয় এই বালক। 'এত রক্ত কেন?' — বালিকা হাসির এই গূঢ় জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধানের কঠোর সাধনায় ধ্রুবই গোবিন্দমাণিক্যের একমাত্র প্রেরণা। তিনি তাঁর জটিল রাজকর্তব্যের বন্ধন থেকে এই বালকের হাত ধরেই বেরিয়ে এসেছেন উদার মানবলোকে, সমস্ত সংকীর্ণতামুক্ত অনন্ত শান্তির পরম আশ্রয়ে — "শিশুর হাত ধরিয়া মহারাজ বিশ্বজগতের মধ্যবর্তী অনন্তের দিকে প্রসারিত একটি উদার সরল বিস্তৃত রাজপথে গিয়া দাঁড়ান ; সেখানে অনন্ত সুনীল আকাশ চন্দ্রাতপের নিম্নস্থিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মহাসভা দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে ভূলোক, ভুবলোক, স্বলোক সপ্তলোকের সংগীতের আভাস শুনা যায় ; সেখানে সরল পথে সকলই সরল সহজ শোভন বলিয়া বোধ হয়, কেবলই অগ্রসর হইতে উৎসাহ হয় উৎকট ভাবনা-চিন্তা অসুখ অশান্তি দূর হইয়া যায়।"

উপন্যাসে একাধিক চরম মুহূর্তে অবশ্যম্ভাবী রক্তপাত এই বালকটির উপস্থিতিতে নিবারিত হয়েছে। গোবিন্দমাণিক্য-কে হত্যায় কৃতসংকল্প জয়সিংহ তাঁর বিদ্যুৎদীপ্ত তরবারি বালকের ভীতি-করুণ দৃষ্টির সম্মুখেই সংযত করেছেন। ভয়াবহ ধ্বংসের অনিবার্য পরিণাম থেকে ধরণীকে রক্ষা করা বুঝি বালকের পক্ষেই সম্ভব। বিল্বন গোবিন্দমাণিক্য-কে ভাই-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের পরামর্শ দিলে ধ্রুব বলেছে — 'ছি ও কথা বলতে নেই।' রাজা এই অর্বাচীন বালকের কৌতুক উক্তির মধ্যে শুনতে পেয়েছেন অমোঘ দৈববাণী। গোবিন্দমাণিক্য অবশ্যম্ভাবী রক্তপাতের সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে সিংহাসন ত্যাগ করবার প্রেরণাও এই বালকের কাছ থেকেই লাভ করেছেন। তাই হৃদয় ঔদার্যে অনায়াসে ঐশ্বর্য বন্ধন ছিন্ন করতে বিন্দুমাত্র ব্যথা অনুভব করেননি তিনি। কিন্তু কেদারেশ্বর যেদিন ধ্রুবকে ছিনিয়ে নিল তাঁর বুক থেকে সেদিন এক মর্মান্তিক শূন্যতার বেদনায় ছেয়ে গেল তাঁর হৃদয়।

রাজর্ষি উপন্যাসের মূল বক্তব্য সুপ্রকাশিত — 'প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ।' গোবিন্দমাণিক্যের জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়েই তত্ত্বটি ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই জীবন দর্শনের উৎস হাসি-তাতা-ধ্রুব। জয়সিংহ তাই যথার্থই বলেছে — "তোমরা রাজার রাজা, তোমারই সকলকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ।"

ঔপন্যাসিক গোবিন্দমাণিক্য সম্বন্ধে জানিয়েছেন — "কোনো প্রকার আড়ম্বর নাই বলিয়া তিনি রাজা এবং সমস্ত সংসারের নিতান্ত নিকটবর্তী হিয়েছেন বলিয়া তিনি সন্ন্যাসী। এইজন্য তাঁহাকে রাজাও সাজিতে হয় নাই, সন্ন্যাসীও সাজিতে হয় নাই।"

রবীন্দ্রনাথ "চৈতালি" কাব্যগ্রন্থের 'তপোবন' কবিতাতে বলেছেন —

"মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, ...
প্রবেসিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ক কেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।"

আবার 'নৈবেদ্য'-এর ৯৪নং কবিতাতে —

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দন্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ ...."

রবীন্দ্র-আদর্শে এই রাজর্ষি গোবিন্দমানিক্য, মানবপ্রেমের, অহিংসার পূজারী চরিত্র রাজ্যশাসনের বাইরে 'হাসি-তাতা-ধ্রুব' সারল্যের পটভূমিকায় তার মনের সুপ্ত 'বড় আমি'-কে মেলে ধরেছেন। সেইখানটিতেই কবিত্বের শিকড় মাটি খুঁজে নিয়েছে। তাই গোবিন্দমাণিক্যের অন্তর বিশ্লেষিত হতে দেখি — 'তিনি আপনার হৃদয়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে ক্ষুদ্র অভিমান-সকল মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন — দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনার মধ্যে বিমল আলোক ও বায়ুর প্রবাহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কে তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছে, ব্যথা

দিয়াছে — কে তাঁহার স্নেহের বিনিময় দেয় নাই, কে তাঁহার নিকট হইতে এক হস্তে উপকার গ্রহণ করিয়া অপর হস্তে কৃতঘ্নতা অর্পণ করিয়াছে সমস্ত তিনি ভুলিয়া গেলেন।' এই সত্য উপলব্ধির মধ্য দিয়েই উপন্যাসের এবং চরিত্রের পরিণতি নেমে এসেছে। 'ত্যাগের মহিমা জ্যোতি'-তে তিনি উজ্জ্বল, উদ্বোধক সেই প্রসঙ্গই কবিত্বের বিচরণ ভূমি।

রঘুপতি এবং জয়সিংহ

রঘুপতির চরিত্রে ক্রোধ-ক্ষোভ-প্রতিহিংসার উত্তেজনা দেখতে পাই। জয়সিংহের প্রতি যে আন্তরিক স্নেহ তাও কোমল মধুর প্রশান্ত নয়, উগ্র ও তীব্র। সে কালীসাধক, কিন্তু ভক্তি ব্যাকুলতা তার মধ্যে একবারও দেখা যায় না। ধর্মকে সে শুধু ব্যবহার করতে চেয়েছে তার ক্ষমতা রক্ষার কাজে। আরাধ্য দেবীর বাণী বলে সে নিজেই কথা বলেছে অন্তরাল থেকে। নিজে প্রতিমার মুখ ঘুরিয়ে রেখে প্রজাদের বোঝাতে চেয়েছে দেবী বিমুখ হয়েছেন। এত নির্বিকার ভাবে এই কাজ তিনি করেছেন যে, একবারও প্রথানুগ ধর্মবোধের দিক থেকে কোন বাধা অনুভব করেনি। ধর্মরক্ষার জন্যই এই অধর্মাচরণ, এরজন্য গ্লানিবোধের মধ্য দিয়ে চরিত্র অন্য মাত্রা পেতে পারত। কিন্তু লেখক সেখানে নীরব। এই বন্ধুর ভূমিতে কবিত্বের অঙ্কুরোদ্গমন ঘটতে পারে না। জয়সিংহের প্রতি তার বাৎসল্য অন্তঃস্রোতেই থেকেছে, তাকে সরাসরি ব্যবহার করা হয়েছে ক্ষমতা-যুদ্ধে সিদ্ধিলাভের কাজে। জয়সিংহ গোবিন্দমাণিক্য-কে হত্যার পরিবর্তে নিজে আত্মদান করে হিংসার অবসান ঘটাল। জয়সিংহের মৃত্যুর পর রঘুপতি তার অন্তরের হাহাকারকে প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে নির্বাপিত করতে চাইল। নাটকে ধরণের একমুখী চিত্তবৃত্তি কিন্তু রোমান্সের পরিবেশে অবিশ্বাস্য নয়। তেজস্বিতা, ক্ষমতা, মত্ততা, কূটবুদ্ধি, প্রতিহিংসা-পরায়ণতা ইত্যাদি বিচিত্র প্রবণতার সমাহারে রঘুপতি ওজোগুণসম্পন্ন চরিত্রটিতে স্নেহদুর্বলতার গূঢ় সঞ্চারে মাত্র একটি জায়গাতে চরিত্রটি রবীন্দ্র-মানসে আত্মসর্মপণ করলেও সেখানেই কবিত্বের স্বল্প স্পর্শ। — জয়সিংহের উদার প্রাণের মহত্ত্বের কাছে রঘুপতি নিজেকে অত্যন্ত হীন মনে করছেন। "তিনি এইরূপ একটি মহৎ চরিত্রের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্ত বিবাদ-বিদ্বেষ ভুলিয়া গেলেন। চারিদিকের গুরুভার সংসার লঘু হইয়া গিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে বিরত হইল। যে নক্ষত্রমাণিক্যকে তিনি রাজা করিয়া দিয়াছেন সে যে রাজা হইয়া আজ তাঁহাকেই অপমান করিয়াছে ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র রোষ জন্মিল না।" এইখানেই গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি একই উদ্দেশ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এ লেখকের 'আইডিয়া'-কে প্রতিষ্ঠা দিলেও বা চরিত্রটির বিবর্তন ঘটলেও রঘুপতির আন্তর-অনুভূতির কাব্যিক-স্পর্শে পাঠকের কাছে তা অনুভব্য।

জয়সিংহ

"চরিত্রের নিহিত দ্বন্দ্বময়তা, যা কতকটা হয়ত শেক্‌স্পীরিয় নাট্য প্রভাবিত, অনেক পরিমাণে সুষ্ঠু শিল্পরূপ পেয়েছে জয়সিংহের চরিত্র-বিন্যাসে। হ্যামলেটীয় ধরণের অস্থিরতা ও চিত্ত-সংক্ষোভ, যা 'বিসর্জন' নাটকে তীব্রতর হয়ে ফুটেছে, তা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত বিন্যাসেও জয়সিংহ চরিত্রকে একধরণের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা দান করেছে।"[৬] রাজার প্রতি জয়সিংহের গভীর ভক্তি সম্ভবত তার প্রশান্ত চিত্ত ও নিরহংকার সাধুতার জন্য পালক পিতা এবং গুরু রঘুপতির প্রতি তার অবিচল শ্রদ্ধা ও আনুগত্য, বোধহয় ভালোবাসা নয়। প্রথানুগত ভাবে সে ধার্মিক, কালীভক্ত। রঘুপতির বলি বন্ধ করার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ তাতে সে সহমত, কিন্তু রাজহত্যার চক্রান্ত তাকে সংকটে ফেলেছে। রাজহত্যা, তাও নিজের ভাইয়ের হাত দিয়ে, এতে তার ন্যায়নীতি ও মানসিক বোধ বিদ্রোহ করতে চেয়েছে। তার উপরে এই হত্যার চেষ্টা তার পরম শ্রদ্ধেয় গোবিন্দমাণিক্য-কে। রঘুপতির দেবী প্রতিমার নামে মিথ্যাচার, নিজ হাতে প্রতিমার মুখ ঘুরিয়ে রাখা জয়সিংহের রঘুপতির প্রতি শ্রদ্ধায় অশ্রদ্ধা মিশিয়ে দিল। তবুও পিতার মমতায়

আবাল্য পালন করেছে যে-গুরু তার কাছে রাজরক্ত আনার প্রতিজ্ঞা তাকে করতে হল। সেই রাজার রক্ত যে তার জীবনে ধ্রুবতারার মতো। ফলে নিজের জীবন দিয়ে তাকে চিত্তের-দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে চিরকালের শান্তি পেতে হল। এই আত্মহত্যা জয়সিংহের আত্মিক অবক্ষয়ের একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি। আর এই দৃশ্যটিতেই রবীন্দ্রনাথ কবিত্বের ভান্ড উজাড় করে দিয়েছেন।

জয়সিংহের অন্তিমলগ্নে একদিকে পুরোহিতের প্রতি মহারাজার প্রশান্তচিত্তের রুদ্ররোষ, অন্যদিকে যুগান্তকালের অজ্ঞান সংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের বিশ্বাস-নির্ভর রঘুপতির নানা অপকর্ম, তার মধ্যে সনাতন ধর্মে আবিষ্ট কিন্তু চরম বস্তুনিষ্ঠ জয়সিংহের অন্তরের রক্তঝরা সংগ্রাম। একবার মহারাজার সততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাহায্যপ্রার্থী পরক্ষণে রঘুপতিকে দুরাচারী জেনেও তার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ। প্রবঞ্চক পুরোহিত তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে চরম মোহগ্রস্ত করে তোলে, ২৯ শে আষাঢ় রাজরক্ত চাই। জয়সিংহ জন্মসূত্রে রঘুপতির কাছে দায়বদ্ধ। তার ব্যক্তিমানসে আজ পুঞ্জীভূত অন্ধকার। একবার ওদিকে যায় আলোর সন্ধানে, কিন্তু ফিরতে হয় দায়বদ্ধ বিবেক নিয়ে, কোথায় আলো ? যুক্তিবাদ ও কর্তব্যবোধের মরণান্তক অন্তরদ্বন্দ্ব থেকে কে তাকে উদ্ধার করবে ? এ অন্ধকারে কে তাকে পথ দেখাবে? সমস্ত দৃশ্যটির পদ্ধতি প্রকরণের কলাকৌশল এখানে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাহিত্যের শ্রেষ্ঠক্ষণকে স্মরণ করায়।

অবশেষে ১৫ পরিচ্ছেদ। চতুর্দশী তিথি দেবী ভুবনেশ্বরীর পূজা। আজ পথে লোক বের হওয়া নিষেধ। সন্ধ্যাকালে আলো-আঁধারের খেলা রাত্রি বাড়ার সঙ্গে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল, দেখা দিল বিদ্যুতের চমক, ঘন অন্ধকার। মন্দিরে সহস্র দীপ জ্বলছে, রাজপথ জনশূন্য, বিদ্যুৎদীপ্ত আকাশের নীচে মন্দিরে রঘুপতি খাঁড়ার সামনে জয়সিংহের জন্যে অপেক্ষারত। পথে শৃগাল-কুকুর ,গৃহস্থের দরজার পাশে কোথাও বা চিতাবাঘ উঁকি দিচ্ছে। অহমিকায় স্ফীত,ষড়যন্ত্রের মূর্ত প্রতীক পরম অধর্মাচারী মন্দিরের পুরোহিত এই সন্ধিক্ষণে জয়সিংহের জন্যে বসে আছেন। সে রাজার রক্ত আনবে।

সহসা প্রকৃতি উন্মত্ত হয়ে উঠল, প্রচন্ড ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল। "বাতাসে মন্দিরের সহস্র দীপশিখা কাঁপিতে লাগিল, উলঙ্গ খড়গের উপর বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। চতুর্দশ দেবতা এবং রঘুপতির ছায়া যেন জীবন পাইয়া দীপশিখার নৃত্যের তালে তালে মন্দিরের ভিত্তিময় নাচিতে লাগিল।" ত্রিপুরার আকাশে সেদিন ঘনতমসা, যেন আসন্ন প্রলয়ের পূর্বাভাস ! এই পরিবেশে দেবতার রুদ্ররোষের মধ্যে জয়সিংহ মন্দিরে প্রবেশ করল। তার সর্বাঙ্গ সিক্ত, রুদ্ধশ্বাস দেহ থেকে চক্ষুতারকার অগ্নিকণা বের হয়ে আসছে। কর্তব্যপালনে জয়সিংহ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, রঘুপতির প্রশ্ন, তার অস্তিত্ব পর্যন্ত ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে করালবদনা কালীর সামনে এসে দাঁড়াল সে, বলতে লাগল, তারও ধমনীতে রাজরক্তের ধারা প্রবাহিত :

"এই নে তোর সন্তানের রক্ত, তোর রাজরক্ত এই নে। —কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিলেন — বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল — চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাহার হৃদয়ে নিহিত করিলেন, মরণের তীক্ষ্ন জিহ্বা তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন — পাষাণ প্রতিমা বিচলিত হইল না।"

কবিকর্মের এই বাচ্যাতিরিক্ত রসসৃষ্টিতেই জয়সিংহ চরিত্রের কবিত্ব।

প্রকৃতির রূপ-ভাষ্য (পরিবেশ)

'রাজর্ষি'তে নিসর্গ চিত্র তথা প্রকৃতি ও মানবমনের সংযোগচিত্র পরিস্ফুট, আরও বেশি যেন অর্থবহ। বিশেষত প্রথম আঠারো পরিচ্ছেদে রঘুপতির নির্বাসনের পূর্ব পর্যন্ত। উপন্যাসটির এই ইতিহাসের চিত্রপট আদৌ স্পষ্ট নয় — লেখকের অণ্বিষ্টও নয়। জয়সিংহের আত্মবিসর্জন পর্যন্ত উপন্যাসের যে আবেগ রুদ্ধ নাটকীয় সংবেদন — তার তাৎপর্যপূর্ণ রূপায়ণে বহুল সহায়তা করেছে এর পরিবেশ। আর সে পরিবেশ মুখ্যত নৈসর্গিক — গোমতী নদীতীর ও তার পার্শ্ববর্তী অরণ্য, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন ও অন্ধকার রাত্রির আকাশ, মেঘাবৃত আষাঢ়ের বর্ষণ মুখর রূপ — প্রকৃতির এই বিচিত্রবর্ণ প্রেক্ষাপট 'রাজর্ষি'-র বিস্তৃত অংশ জুড়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'রাজর্ষি'-তে পরিবেশ রূপে যুক্ত হয়েছে — ভুবনেশ্বরী মন্দির ও অংশত রাজপ্রাসাদ। উপন্যাসটিতে যে নিসর্গ পরিবেশ গড়ে উঠেছে, তাকে কোথাও কোথাও কিছুটা 'অবজেকটিভ' দৃশ্য পটের মত মনে হলেও, তা আসলে প্রায় সর্বদাই মানবমনের বিচিত্র নিগূঢ় অনুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট — কোথাও তাদের থেকে একেবারে বিশ্লিষ্ট নয়। এইসব অনুভূতি মুখ্যত জয়সিংহের, কিছু পরিমাণে গোবিন্দমাণিক্যের এবং অন্তত একবার নক্ষত্ররায়ের। জয়সিংহের চিত্তের আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা-বিহ্বলতা সবই বর্ষাদিনের আকাশ-অরণ্য-নদীজলের আলোয় অন্ধকারে প্রতিফলিত হয়েছে। মানবমন ও নিসর্গ-সম্পর্ক-সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের এই রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে কিছুকাল পূর্বে লেখা আখ্যানকাব্য 'বনফুল' ও 'কবিকাহিনী'-র রোম্যান্টিক নিসর্গ-পরিবেশ-কল্পনা স্মরণীয়; — সেখানেও নিসর্গপটে বিভিন্ন নরনারীর হৃদয়ানুভূতির প্রতিফলন দেখতে পাই।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের পর থেকে 'রাজর্ষি'-র পটভূমি আর কোন বিশেষ স্থান বা অঞ্চলে সীমিত বা সুনির্দিষ্ট নয়। এক বা একাধিক মানুষের (রঘুপতি ,নক্ষত্ররায় প্রভৃতি) চলমান জীবনের প্রেক্ষাপটের যেন শোভাযাত্রা চলেছে উপন্যাসের এই শেষাংশে। রাজমহল থেকে বিজয়গড়ের বিশাল বন, তারপর বিজয়গড়, শুজুর পাড়া এবং তারও পরে সুদীর্ঘ পথের গতিশীল পরিবেশ (২৭ পরিচ্ছেদ) ইত্যাদি। এই অংশের চিত্রপট, মুখ্যত যা নিসর্গচিত্র, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, 'অবজেকটিভ' বিবরণধর্মী — সেখানে উপন্যাসের চরিত্রের সঙ্গে পরিবেশ চিত্রের একাত্মতা বা Fusion (লিডেল -কথিত)ঘটেনি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ২০ ও ৩৫ সংখ্যক পরিচ্ছেদ যথাক্রমে বিজয়গড়ের আরণ্য পরিবেশ ও নক্ষত্ররায়ের শিবিরের পারিপার্শ্বিক পরিবেশচিত্র স্মরণীয়। বলাবাহুল্য, নরনারীর মন থেকে বিচ্ছিন্ন দৃশ্যপটের এ ধরণের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনার তাৎপর্য কবিত্ব হারিয়ে যায়।

অলংকার ও চিত্রকল্প সৃজন

উপমা বা অন্যান্য অলঙ্কার প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের এই উনিশ শতকীয় উপন্যাসগুলিতে অল্প। আর যে-সব অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা যায়, সেগুলি অনেক সময়েই রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। এ ধরণের উপমা উৎপ্রেক্ষার কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

(ক) ''সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন তড়িৎপ্রবাহের মতো বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল।''[৭]

(খ) ''আকাশের পূর্ণচন্দ্রের প্রতি শিশুদের যেমন একপ্রকার আসক্তি আছে, গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের সেইরূপ মনের ভাব ছিল।''[৮]

ভাষার বন্ধন

ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের জীবনকে বাণীবদ্ধ করার জন্য ভাষাকে পরিচিত জীবনের কাছ থেকে দূরবর্তী করতে হয়েছে। 'রাজর্ষি'-তে কবি প্রচলিত ভাষারীতিকেই অনুসরণ করেছেন, যার মধ্যে বঙ্কিমী শৈলীর ছাপ পরিস্ফুট। অবশ্য সেই প্রচলিত ভাষারীতির অনুবর্তনের মধ্য থেকে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উচ্চারণের ভাষা যে থেকে-থেকে ঈষৎ বিচ্ছুরিত হয়েছে — তা নিঃসংশয়ে বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষারীতির অন্যতম লক্ষণ — তরঙ্গের মতো সাবলীল একটানা গতিছন্দ। কোথাও একের পর এক সরল বাক্যকে 'বিনি-সুতোয় মালা' গাঁথার মতো সংযোজক অব্যয় ছাড়াই পর পর বিন্যস্ত করেছেন, কোথাও বা জটিল বা মিশ্রবাক্যের সাহায্যে সেই প্রবহমানতা সঞ্চার করতে চেয়েছেন। 'রাজর্ষি'-র কাহিনী-প্রধান অংশে অনায়াস গতিসৃষ্টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে অনেক ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত সরল বাক্যের ব্যবহার চোখে পড়ে। কাহিনী বা পরিবেশ যেখানে নাটকীয় উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত, সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের মত কাটাকাটা সংক্ষিপ্ত বাক্যের সার্থক ব্যবহার করেছেন। ভাষা যেখানে বাচ্যাতিরিক্ত রস সৃজন করেছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

(১) "ছোট মেয়েটির আঁচল ভরিয়া যখন ফুল দিলেন তখন রাজার মনে হইল, যেন তাঁহার পূজা শেষ হইল ; এই দুইটি সরল প্রাণের স্নেহের দৃশ্য দেখিয়া, এই পবিত্র হৃদয়ের আশ মিটাইয়া ফুল তুলিয়া দিয়া, তাঁহার যেন দেব-পূজার কাজ হইল।"[৯]

(২) "আষাঢ় মাস। সকাল হইতে ঘন মেঘ করিয়া রহিয়াছে। এখনো বৃষ্টি পড়ে নাই, কিন্তু বাদলা হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। দূর দেশের বৃষ্টির কণা বহিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। গোমতী নদীর জলে এবং গোমতী নদীর উভয় পারের অরণ্যে অন্ধকার আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে অমাবস্যা ছিল, কাল ভুবনেশ্বরীর পূজা হইয়া গিয়াছে।"[১০] — এর পরেই 'এত রক্ত কেন' প্রসঙ্গ।

(৩) "আকাশ অত্যন্ত অন্ধকার, ঘরের চালের উপর ক্রমাগতই বৃষ্টির শব্দ শুনা যাইতেছে, প্রাঙ্গণের তেঁতুল গাছ জলে ভিজিতেছে, পথে পথিক নাই।"[১১] — এরপরে হাসির মৃত্যু।

'রাজর্ষি'-র মতো রোম্যান্স-রসসিক্ত উপন্যাসে ঘাত-প্রতিঘাতময় বহিরঙ্গ ঘটনায় বাহুল্য আছে ঠিকই, কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে যেসব স্থানে ভাবগম্ভীর নিসর্গ বর্ণনা কিংবা অন্তরের গূঢ় অনুভবের প্রকাশ ঘটেছে, সেখানে দীর্ঘায়িত বাক্যের সাহায্যে দীর্ঘছন্দ তরঙ্গের মতো একধরণের প্রবহমান গীতিময়তা সঞ্চার করতে চেয়েছেন, লেখক — যা কাব্যের তানে বাঁধা।

(১) "সম্মুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিয়াছে। অত্যন্ত ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। নববর্ষার জলে জয়সিংহের গাছগুলি স্নান করিতেছে, বৃষ্টিবিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোটো ছোটো শত শত প্রবাহ ঘোলো হইয়া, কলকল করিয়া গোমতী নদীতে গিয়া পড়িতেছে — জয়সিংহ পরমানন্দে তাঁহার কাননের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে মেঘের স্নিগ্ধ অন্ধকার, বনের ছায়া, ঘনপল্লবের শ্যামশ্রী, ভেকের কোলাহল, বৃষ্টির অবিশ্রাম ঝরঝর শব্দ - কাননের মধ্যে এইরূপ নববর্ষার ঘোরঘটা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে।"[১২]

প্লট নির্মিতি

ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের অন্তর্নিহিত গভীর শুভচেতনার ক্রম-উন্মোচনের মধ্য দিয়ে তাঁর 'ঋষি' হয়ে ওঠার কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই উপন্যাসে। প্রচলিত সংস্করণে কেবল পরিচ্ছেদ ভাগ থাকলেও, প্রথম সংস্করণে সমগ্র কাহিনিটি দুটি খন্ডে বিভক্ত ছিল : প্রথম খন্ড ১ থেকে ১৮ পরিচ্ছেদ, এবং দ্বিতীয় খন্ড ১৯ পরিচ্ছেদ থেকে শেষ। এই খন্ডভাগ অনুসরণ করলেই এর কাহিনী বিন্যাসের বৈশিষ্ট্যটি পরিস্ফুট হবে। প্রথম খন্ডে পশুবলি নিষিদ্ধ হওয়াকে কেন্দ্র করে রাজার সঙ্গে রাজপুরোহিত রঘুপতির দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ। আর সেই দ্বন্দ্বের আবর্তে জড়িয়ে পড়ে রঘুপতির পালিত পুত্র জয়সিংহের প্রবল দ্বিধা ও কঠিন অন্তর দ্বন্দ্ব। হিংসা ও অহিংসা, শক্তি ও প্রেমের, সংঘাতের একটি পরিস্ফুট তত্ত্ব কয়েকটি মানুষের জীবনকাহিনিকে আশ্রয় করে যেভাবে ফুটে উঠেছে, তার নেপথ্যে লেখকের 'সাবজেকটিভ' জীবনভাবনা নিহিত থাকলেও, তার বহিরঙ্গে এমন একটি 'অবজেকটিভ' জীবনভাবনা বিন্যাসরীতির স্বপ্রকাশ, যার ফলে এই আখ্যান অংশ নিয়ে সহজেই 'বিসর্জন' নাটক লেখা সম্ভব হয়েছিল।

জয়সিংহের আত্মহনন ও ধ্রুব-হত্যা চেষ্টার অপরাধে রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের নির্বাসনের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদের প্রথম খন্ডের সমাপ্তি ঘটেছে। এর পরের অংশের কাহিনি বিন্যাসের উপযোগিতা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "বস্তুত উপন্যাসটি সমাপ্ত হয়েছে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে"। পঞ্চাশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত জয়সিংহের আত্মহত্যা ঘটনাপর্বের পূর্ণ সমাপ্তি ঘটেছে অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে — রঘুপতির নির্বাসনে। তাঁর মতে, এর পরেও যে তিনি এই কাহিনীর জের টেনেছেন, সে কেবল 'সাময়িক পত্রের পেটুক দাবি' মেটাতে। রবীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন, উপন্যাসটিতে এই উত্তরপর্বের কাহিনী 'আগাছা'-র মতো বৃদ্ধি পেয়ে মূল উপন্যাসের শিল্পরূপকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

উপন্যাসটিতে জয়সিংহের আত্মহত্যা ও রঘুপতি নক্ষত্রের নির্বাসনকে যদি 'আদি' অংশ বলে গণ্য করা যায়, তবে গোবিন্দমাণিক্যের রাজ্যত্যাগ আখ্যান পর্যন্ত এর 'মধ্য'ভাগ; এবং শেষ অংশে যেখানে রাজা ঋষিত্ব লাভ করলেন — সেটুকু নিয়ে এর 'অন্ত' পর্ব। কাহিনীর এই আদি-মধ্য-অন্তব্যাপী সমগ্রতা নিয়ে 'রাজর্ষি'একখানি অখন্ড উপন্যাস। এর মূল কাহিনীসূত্র, বলাবাহুল্য, গোবিন্দমাণিক্যের জীবনের তথা জীবনবোধের এক ধারাবাহিক বিবর্তন। এই মূল কাহিনীর শেষ দিকে দুটি গৌণকাহিনী যুক্ত হয়েছে — একটি শা'সুজার, অন্যটি, বিল্বনের। 'আদি'পর্বের কাহিনীতে গোবিন্দমাণিক্যের যে প্রাধান্য ছিল, 'মধ্য'পর্বে তা প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই পর্বে রঘুপতিই বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে শা'সুজার যে আখ্যান এই পর্বে এসেছে তাকে গোবিন্দমাণিক্যের কাহিনীতে উপকাহিনীরূপে গণ্য করা যায় না, তা রঘুপতির কাহিনীর শাখারূপে বিবৃত। বিল্বনের আখ্যানও উপন্যাসের মূল ঘটনার সঙ্গে আদৌ তেমন অচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে যুক্ত হতে পারেনি, বরং উপন্যাসের মুল ঘটনাকে অনেকাংশে শিথিল করে দিয়েছে। শা'সুজার কাহিনীর প্রেক্ষাপটে লেখকের রোম্যান্স প্রবনতা এবং বিল্বনের সেবাব্রতের মহৎ আত্মত্যাগধর্মী আদর্শ সেই আখ্যানের নিহিত রোম্যান্টিকতাকে গাঢ়তর বর্ণে রাঙিয়ে দিয়েছে।

উপন্যাসের একেবারে 'অন্ত'পর্বটি সংক্ষিপ্ত — অনেকটা সারসংক্ষেপের ভঙ্গিতে বিবৃত। সিংহাসন ত্যাগের পর রাজা যখন প্রথমে নির্জনবাস ও পরে 'একশত ধ্রুব'-কে নিয়ে নিরাসক্ত ঋষিকল্প জীবনযাপন শুরু করলেন, তখন থেকে কাহিনীর শেষ পর্বের সূচনা। তারপর নক্ষত্ররায়ের মৃত্যুর পর 'রাজর্ষি' গোবিন্দমাণিক্য পুনরায় সিংহাসনে আরূঢ় হলেন। এবং লেখকের ইচ্ছাপূরণধর্মী পরিণতি পর্বে এ-ও শেষ অবধি বিবৃত হয়েছে যে, 'রঘুপতি পুনর্বার পৌরোহিত্য গ্রহণ' করলেন।

উল্লেখপঞ্জী

১। 'সূচনা',শ্রাবণ ১৩৪৭
২। রবীন্দ্র রচনাবলী , ষষ্ঠখন্ড , জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ , 'মুকুট' নাটকের ভূমিকা
৩। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, ক্ষেত্র গুপ্ত
৪। রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়, ড. জ্যেতির্ময় ঘোষ
৫। সংগ্রহ: রবীন্দ্র-সৃষ্টির অলংকরণ , অভীককুমার দে
৬। রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প , গোপিকানাথ রায়চৌধুরী
৭। ১০ম পরিচ্ছেদ , রাজর্ষি
৮। ৪র্থ পরিচ্ছেদ , ঐ
৯। ১ম পরিচ্ছেদ , ঐ
১০। ২য় পরিচ্ছেদ , ঐ
১১। তদেব
১২। ৪র্থ পরিচ্ছেদ , ঐ

চোখের বালি

পূর্বাভাস

'চোখের বালি' 'বঙ্গদর্শন'-এ (নব পর্যায়) প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০৮ বৈশাখ থেকে ১৩০৯ কার্তিক পর্যন্ত। কিন্তু বর্তমানে রচনাবলীর সংস্করণে 'সূচনায়' অংশ রবীন্দ্রনাথ লেখেন ১৩৪৭ বৈশাখে। তপব্রত ঘোষ তাঁর 'চোখের বালি : পুনর্বিচার' প্রবন্ধে দাবী করেছেন 'চোখের বালি' লেখা মাসিক পত্রে প্রকাশের অনেক আগেই শেষ হয়েছিল। অনেককে রবীন্দ্রনাথ এই লেখা পড়ে শুনিয়েছেন, জগদীশ বসু , প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রিয়নাথ সেন, দীনেশচন্দ্র সেন। মাসিক পত্রে প্রকাশের আগেই 'চোখের বালি' শোধন মার্জনের একাধিক স্তর পেরিয়ে এসেছিল। 'চোখের বালি'-র 'সূচনায়' তার কোনো আভাস না থাকলেও উপন্যাসের উপসংহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বোধকরি অস্বস্তি ছিল। বিশ্বভারতীর রবীন্দ্ররচনাবলীর ৩য় খন্ডের গ্রন্থপরিচয় বলছে, উপন্যাসটি ১৩০৯ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১ম সংস্করনে শেষ অংশ ('তখন ঘোমটা মাথায় আশা........ ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন —' বর্তমান গ্রন্থে পৃ. ৫০১-৫১২) স্বতন্ত্র আকারে প্রচলিত গ্রন্থে বহুকাল বর্জিত ছিল, রচনাবলী সংস্করনে তা যোগ করে দেওয়া হয়। স্বভাবতই কৌতূহল হয় বর্জিত ওই ১২ পৃষ্ঠাতে কী আছে৷ এর আগেই বিহারীর বিবাহ প্রস্তাব বিনোদিনী ফিরিয়ে দিয়েছে। ৫৩,৫৪ এবং ৫৫ পরিচ্ছেদের যে দীর্ঘ অংশ স্বতন্ত্র আকারে প্রচলিত গ্রন্থে বহুকাল বর্জিত ছিল, বর্তমানে যুক্ত হয়েছে, তাতে মৃত্যু শয্যায় রাজলক্ষ্মী আশাকে মহেন্দ্র-র পাশে বসিয়ে বলে যাচ্ছেন, 'আমার এই কথাটি মনে রাখিস, তুই এমন লক্ষ্মী আর কোথাও পাবিনে। মেজবৌ, এসো, ইহাদের একবার আশীর্বাদ করো — তোমার পুণ্যে ইহাদের মঙ্গল হউক।' অন্নপূর্ণা দু'জনের মস্তক চুম্বন করে আশীর্বাদ করলেন রাজলক্ষ্মী বিহারীকে বললেন, মহেন্দ্রকে ক্ষমা করতে৷ 'বিহারী তখনই মহেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই মহেন্দ্র উঠিয়া দৃঢ় বাহু দ্বারা বিহারীকে বক্ষে টানিয়া কোলাকুলি করিল।'

রাজলক্ষ্মীর বিছানার সামনে নীচে পাত পেড়ে খেতে বসল দুই বন্ধু, পরিবেশন করল আশা। রাতে রাজলক্ষ্মী ছেলে-বউ কে নিজেদের ঘরে পাঠিয়ে বিহারী কে বিনোদিনীর বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, এবং জানালেন, 'সে আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে, বিহারী, তবু তাহাকে আমি মনে মনে ভালোবাসি।' বিহারী জানাল বিনোদিনী বাইরের ঘরে লুকিয়ে বসে আছে। সে পণ করেছে, যতক্ষণ রাজলক্ষ্মী তাকে মাফ না করবেন, ততক্ষণ সে জলস্পর্শ করবে না। বিনোদিনীকে ডেকে মাফ করলেন রাজলক্ষ্মী, তার ডান হাত ধরে বললেন, 'বৌ, তোমা হইতে কাহারও মন্দ না হউক, তুমিও ভালো থাকো।' পরদিন সকালে বিনোদিনী আর আশাকে এক সঙ্গে চা তৈরী করতে দেখা গেল। আশার মনে দ্বিধা বা বিতৃষ্ণা ছিল না তা নয়, কিন্তু অন্নপূর্ণা তাকে নির্দেশ দেন, 'যেন ভুলিয়াছিস এই ভাবটি অন্তরে বাহিরে প্রাণ পণে রক্ষা করিতে হইবে — আগে বাহিরে ভুলিতে আরম্ভ করিস তাহা হইলে ভিতরেও ভুলিবি।' মৃত্যুর আগে রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকে আর্থিক অবলম্বন হিসেবে দু'হাজার টাকা এবং বিহারীকে নিজের বিবাহে যৌতুক পাওয়া গ্রামটি গরীবদের জন্য দিয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিহারীর সমাজসেবা প্রকল্পে মহেন্দ্র ও আশাও যোগ দেবে এরকম স্থির হয়ে গেল। বিনোদিনী বিহারীর কাছে নিয়ে এল তার সেই আশ্চর্য প্রস্তাব।

'শুনিলাম, গরীবদের চিকিৎসার জন্য গঙ্গার ধারে তুমি একটি বাগান লইয়াছ — আমি সেখানে তোমার কোন একটা কাজ করব। কিছু না হয় তো আমি রাঁধিয়া দিতে পারি।' বিবাহ প্রস্তাবে রাজি হয় নি বিনোদিনী। সংসার বন্ধনের বাইরে থেকে এবার কর্মসঙ্গিনী হবার জন্য এগিয়ে এল সে। কিন্তু বিহারী রাজি না হলে বিনোদিনী আশ্রয় চাইল অন্নপূর্ণার কাছে। তাদের দুজনের কাশী যাবার দিন বিনোদিনীর স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ কিছু একটা চাইল বিহারী। বিনোদিনী দিয়ে গেল রাজলক্ষ্মীর দেওয়া সেই দু'হাজার টাকা। আর বিহারীর কোনো স্মৃতি চিহ্ন ?

বিনোদিনী বিহারীকে দেখাল নিজের হাতের কাটা দাগ। 'তুমি জান না এ তোমারই আঘাত — এবং এ আঘাত তোমারই উপযুক্ত।' কাশী যাত্রাকালে আশার চিবুক ধরে পুরানো ভালোবাসার একটুখানি প্রার্থনা করল বিনোদিনী। এমন কি শেষ পর্যন্ত, 'মহেন্দ্র আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, বৌঠান, মাফ করিও তাহার চোখের প্রান্তে দুই ফোটা অশ্রু গড়িয়া পড়িল, বিনোদিনী কহিল, তুমিও মাফ করিও ঠাকুরপো, ভগবান তোমাদের চিরসুখী করুন।' সমস্তটাই পূর্ণবৃত্ত হল। সব কাটা গুলি উপড়ে ফেলে যতদুর সম্ভব মসৃণ, সহনীয় হয়ে উঠল সম্পর্কগুলি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলী (প্রকাশ — মে, ২০০১) ষোড়শ খন্ডের গ্রন্থ পরিচয় দেখা যাচ্ছে পত্রিকায় প্রকাশিত ৩২ সংখ্যক অধ্যায়টি গ্রন্থে প্রথমাবধি বর্জিত। পত্রিকার ৩৩ সংখ্যক অধ্যায়ের অনেকটা অংশও বাদ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাতে ছিল, সিড়ির নীচে শারীরিক ঘনিষ্ঠতার কিছু ছবি।

'চোখের বালি' রচনার আগে রবীন্দ্রনাথ 'কথা ও কাহিনী' (১৩০৪-১৩০৬); 'কল্পনা' (১৩০৪-০৮); 'ক্ষণিকা'(১৩০৭); 'সোনার তরী' (১২৯৮-১৩০০); 'চিত্রা'(১৩০০-০২); 'চৈতালী' (১৩০২-০৩) রচনা করেছেন এবং 'নৈবেদ্য'(১৩০৪-০৭) কাব্য রচনার পাশাপাশি 'চোখের বালি' উপন্যাসের খসড়া হিসেবে 'বিনোদিনী' (১৮৯৯ খ্রীঃ) নামে এক গল্প দাড় করিয়েছেন। আর একটি প্রসঙ্গও উল্লেখ্য, 'চোখের বালি' রচনার কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ধারাবাহিক ভাবে 'চিরকুমার সভা' লেখেন এবং ইতিমধ্যে 'নষ্টনীড়' (১৯০১)-এর মত উপন্যাসোপম বড় মনস্তাত্ত্বিক গল্প 'ভারতী' পত্রিকায় লিখে ফেলেছেন। একই সময়ে নগেন্দ্র গুপ্তের 'তপস্বিনী' উপন্যাস প্রকাশিত হয় — এই উপন্যাসের উন্মুক্ত Realism-কে রবীন্দ্রনাথ সাধুবাদ জানাতে পারলেন না। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন — 'বিনোদিনী তথা চোখের বালি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ যে তপস্বিনী পড়েছিলেন এবং সে উপন্যাস তাঁকে রীতিমত ভাবিয়েছিল এই তথ্যটি আমাদের মনে রাখতে হবে।' অধ্যাপক ঘোষ চিঠিপত্রের একটি অংশ প্রকাশ করে 'তপস্বিনী' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি ধরতে চেয়েছেন — 'নগেন্দ্র গুপ্তের তপস্বিনী পড়ে দেখলুম, ঠিক হয় নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাংলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realism-এর অবতারণা করতে চাচ্ছেন।....... গ্রন্থকার সাহস পূর্বক সবকথা পরিষ্কার ভাবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারেন নি, সেই জন্য তার Self- Conscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটিকে লজ্জিত করে তুলেছে।......... নিঃসংকোচ নিরাবরণ তাঁর পক্ষে সহজ নয়, তিনি জবরদস্তি করে করেছেন।'

'সূচনা' (১৩৪৭ বৈশাখ) প্রসঙ্গ:

নষ্টনীড়ের কাহিনির তার বাঁধা কোমল স্বরে। কিন্তু শেষের দিকে তার আবেদন হয়েছে করুণ, বড় মর্মস্পর্শী। আবার 'চোখের বালি'-র সুর শুরু থেকেই বাঁধা কড়িতে। কাহিনির শীর্ষে উঠে তা রাগ ভৈরবে পরিণত হয়েছে, যখন সমে নেমেছে তখন কি মিলনে কি বিচ্ছেদে তার অনুভবে, অনুভুতিতে যেন স্নিগ্ধ অমরাবতীর আমেজ।

(i) চোখের বালি উপন্যাসটা আকস্মিক।

(ii) এবার কার গল্প বানানো হবে এ যুগের কারখানা ঘরে।

(iii) শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত এখনও হয়, কিন্তু তার ক্ষেত্র আলাদা।

(iv) এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জার অলঙ্কারে তাকে আচ্ছন্ন করলে ঝাপসা দেখায়, আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট।

(v) মনের সংসারের কারখানা ঘরে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠবে।

(vi) এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিবরণ এর পূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয় নি।

ক্ষেত্রগুপ্ত 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস' (২য় খন্ড)-এ বলেছেন 'তখন সেই দাবী মানা যায় না, তলিয়ে বঙ্কিম পড়া থাকলে। তবে দুজনের রচনারীতি অনেকটাই পৃথক। তাই বঙ্কিমে যা ইঙ্গিতে প্রকাশিত, রবীন্দ্রে তা প্রত্যক্ষ বিস্তৃত এবং ফলে সব আবরণ মুক্ত।'

(vii) এই পথেই এসেছে গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ।

(viii) পলাতকার কবিতাগুলির মধ্যে সংসারের সঙ্গে সেই মোকাবিলার আলাপ চলেছে।

(ix) বঙ্গদর্শনের নব পর্যায় একদিকে তখন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর এক দিকে এনেছিল গল্পে, এমন কি কাব্যেও, মানব-চরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে।

(x) চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা।

(xi) পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলি অসংযত হয়ে।

(xii) সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনার পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।

রবীন্দ্রনাথ যেহেতু মূলত কবি এবং তাঁর প্রকৃতি-স্বভাবে অনুভব রাজ্যে উপলব্ধির অভিব্যঞ্জনা গুলি সর্বদা সচল এবং ক্রিয়াশীল তাই কথাশিল্পেও কাব্যিক অনুভবের দ্যোতনা প্রকাশ পেয়ে থাকে। Leon Edel -এর -'I take to be governed by the question of the point of view — the question of the relation in which the narrator stands to the story'[১] এই মন্তব্যে 'চোখের বালি'-তে রবীন্দ্রনাথের জীবন-বোধ, চরিত্র সৃজন ও কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে কোন খাতে বইছে তা বিচার করা একান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিকের উপলব্ধির জগৎ তার জীবন দর্শনের সঙ্গে মিশে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ পেল উপন্যাসের সাফল্য তার উপর অনেকটা নির্ভরশীল।

এই উপন্যাসের চরিত্রগুলির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা ঘটনা বৃত্তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্ম অনুভবের খন্ডিত উপলব্ধিকে অখন্ড ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন, মানব জীবনের প্রতিদিনকার ওঠানামার দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে নির্দিষ্ট দন্ডরত্বে রেখে। সেই বৃত্তেই কাব্য অনুভবের স্পর্শ থাকে, যেখানে সমগ্রতার ভেতরে জীবন-ভাবনার অনুষঙ্গগুলো আমাদের মনে নাড়া দিয়ে যায়। প্রত্যেকটি চরিত্র নির্মাণের মধ্যে পরিমিতি বোধ, তাদের উচ্ছ্বাসময় আবেগে লাগাম ধরে রাখার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের অভিব্যক্তি।

কাহিনিবৃত্তের দিকে তাকালে দেখা যায় 'চোখের বালি'র সূচনা পর্ব থেকেই প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস ও উল্লাস, সংকট-বিক্ষোভ ও অন্তরের বিদ্রোহকে ধূমায়িত করে তুলেছিল। প্রাত্যহিক জীবনের নানা সাদা কালো মুহূর্তে, মানবত্বের শাশ্বত ব্যঞ্জনায়, তার সুচিত্রিত অববাহিকায় বয়ে যাওয়ার মধ্যে এই বিক্ষুব্ধ, অশান্ত মনেরও এক অপার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু কথাসাহিত্যের জীবন-দর্শন নিত্য জগতের মঙ্গল ও কল্যানী বোধের মহতী অনুভবে ব্যাপ্ত ছিল, তারই আকর্ষণে ও ঐকান্তিকতায় কাহিনিবৃত্তের শেষাংশে পাওয়া গেল প্রেমের শুদ্ধ চারিত্র্যরূপের পরিচয়। বিহারীর বিবাহ প্রস্তাবে বিনোদিনী অসম্মতি জানিয়ে প্রেমে মহত্ত্বের যে ব্যঞ্জনা দিয়েছে তাতে কাব্য-ব্যঞ্জনার অনুষঙ্গ রূপে এই ঘটনাকে প্রধান বলে দেখতে হয়। এই উপন্যাসের শেষাংশের ভাবনা পরবর্তীতে রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনের অন্যতম ভুবন হয়ে ওঠে, যার মধ্যে নিহিত রয়েছে তার অনির্বচনীয় প্রেম ও কাব্য ব্যঞ্জনার গভীর অনুভবটি।

চরিত্র

আশা

অন্নপূর্ণার এই মা-বাপ মরা কন্যাটি কিভাবে অপরের নির্ভরতায় বিবাহ পূর্ববর্তী জীবন কাটিয়ে ছিল -— আমরা তার সে পূর্ব পরিচয় জানি না। কিন্তু মহেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ পরবর্তী জীবনে তাকে পরনির্ভরতায় জীবন ধারণ করতে দেখি। কখনও রাজলক্ষ্মী, কখনও অন্নপূর্ণা, আবার কখনও মহেন্দ্র — এই তিনজনের ওপরে চক্রাকারে নির্ভরতায় তার জীবন অতিবাহিত হয়েছে।

অন্নপূর্ণা, রাজলক্ষ্মী, বিনোদিনী ও মহেন্দ্র কিভাবে আশলতার চরিত্রকে ক্ষুব্ধ ও বেদনার্ত করে তুলেছে, তার ইতিবৃত্ত ফুটে উঠেছে উপন্যাসের কথা-শরীরে। উত্তর কালে রাজলক্ষ্মীর অসুস্থতার সময় সে বিহারীকে স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিল— "বিহারী এ সংসারে কতখানি আশা তাহা আগে সম্পূর্ণ জানিত না-— অনেক সময় তাহাকে অনাবশ্যক আগন্তুক মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে, অনেক সময় বিহারীর প্রতি বিমুখ ভাব সুস্পষ্ট পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সেই অনুতাপের ধিক্‌কারে আজ বিহারীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এবং করুণা সবেগে ধাবিত হইতেছে" (৪৯ পরিচ্ছেদ)। উপলব্ধির নবজগতে পদার্পণ করে আশালতা তার নারী স্বভাবের স্বাভাবিক পরিণতি দেখিয়েছে মনে করা যায়। বিহারীর দৃষ্টিতেও এই আশালতা শোকে, দুঃখে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছে বলে মনে হয়েছে — "সে এখন আর সামান্য নারী নহে, সে যেন দারুণ দুঃখে পুরাণ বর্ণিত সাধ্বীদের সমান বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে"।

মহেন্দ্রের সঙ্গে আশালতার সম্পর্ক একটা পর্বে, বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনে 'আশ্রয়' লাভের ব্যঞ্জনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

শ্রুতিমধুর নামের দিকে ঝোঁক ছিল বলে বিনোদিনীর সঙ্গে 'চোখের বালি' নাম দিয়ে বন্ধুত্ব পাতাল আশালতা। সে মহেন্দ্রের সঙ্গে চার দেওয়ালের ভালোবাসায় হাঁপিয়ে উঠেছিল। তারপর বিনোদকে মহেন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত করে কখনও গর্ববোধ করেছে, (১৫ পরিচ্ছেদ) কখনও বা সখীর কাছে সংশয়মুক্ত ভাবনায় নিজেকে সমর্পণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণ প্রেমের প্রতি চিরকাল তাঁর অন্তরের পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। যে প্রেম খণ্ডিত, আত্মকেন্দ্রিকতায় সংকীর্ণ, পারিবারিক কর্তব্যকর্মের মাধ্যমে যে প্রেম বিকশিত নয়, তাকে শ্রীহীন অসম্পূর্ণ প্রেম বলে মনে করেন তিনি। এই পর্বে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা থেকে জানতে পারি — তিনি তাঁর কন্যা মীরাদেবীকে বিবাহের পর এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সে যেন সংসারের কর্তব্য কর্মের মধ্যে দিয়ে তার নারীত্বকে পরিপূর্ণ করে তোলে। মীরাদেবী সে চেষ্টাই করেছিলেন। এই উপন্যাসে আশালতা নিজের কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয়েছিল। তার চরিত্রের মধ্যে সারল্য নামক গুণের অস্তিত্ব অবশ্য প্রশংসনীয় — কিন্তু কেবল এইগুণে জীবনে পরিপূর্ণতা অর্জন করা যায় না। আশালতাকে তাই বিরুদ্ধ পরিবেশে পড়তে হ'ল — নিজের জীবনে অশান্তির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকেও অশান্তির ঘূর্ণিঝড়ে সে সংসারে উপস্থিত হয়ে তার প্রতিরোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হ'ল। সে পরিপূর্ণভাবে মহেন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও বোধ হয় আশালতা চরিত্রের ব্যক্তিত্বের এবং পরিপূর্ণতার অভাবই ছিল বড়। অনুমান করা সঙ্গত, আশালতা যদি নিজের প্রেমকে চার দেওয়ালের মধ্যে খণ্ডিত করে না রাখত, যদি সংসারের কতর্ব্যকর্মে নিজেকে উপযুক্ত ভাবে নিযুক্ত করতে পারত এবং বিহারী, বিনোদিনী, রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার সঙ্গে সহজ সম্পর্কে — ত্যাগে-সেবায় পরিপূর্ণ করে তুলত তাহলে অবশ্যই হতে পারত গৃহাঙ্গণের চিরন্তন দীপশিখা, মূর্তিমতী প্রতিমা। প্রথম পর্বের জীবনে আশালতা অপূর্ণ নারীত্বের ইঙ্গিত দিয়ে গেছে।

একদিকে শাশুড়ির রুষ্ট দৃষ্টি অন্যদিকে মাসির অসহায় অস্বস্তি তার সুখে কাঁটা হয়ে রইল। মা মাসি শূন্য গৃহে অবাধ প্রেমে সে সুখী আত্মহারা — এরূপ অনুমান করা যায়, কিন্তু এও বোঝা যায় যে সে সেই প্রেমের আশ্রয় বা সাবজেক্টে নয়, বিষয়-অবজেক্ট, তার ইচ্ছায় কর্ম চলেছে। ফল সে-ও ভোগ করেছে—সুখ-দুঃখ—উভয় ফল। অবাধ প্রেমে যে স্বাভাবিক অবসাদ আছে আশাই সেদিকে স্বামীর চোখ ফিরিয়েছে। দানাপানি না পেয়ে খাঁচার পোষা পাখিটা যখন মারা গেল, আশাই বলল, 'আর কেন এবার মাকে ফিরিয়ে আন।'

খ) যাকে খুব জানি, তাকেও সব জানিনে
এই কথা ধরা পড়ে কোন একটা আকস্মিকে।
..... কোন নির্বাক রহস্যের সামনে ওকে নীরবে শুধিয়েছি
'কে তুমি'। (অকাল ঘুম / শ্যামলী)

অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষ নারীকে পায় পুরোহিতের হাত থেকে, বিধাতার কাছ থেকে সাধনার ধন হিসাবে নয়। তাই ব্যক্তিগত জীবনে স্বামী-স্ত্রী হয়েও বহু দম্পতি দুই ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা, নিঃসঙ্গতার গ্লানিবাহক। এ বিষয়ে 'চোরাই ধন' গল্পে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি প্রাসঙ্গিক — ''বিবাহটা চিরজীবনের পালাগান; তার ধুয়ো একটা মাত্র, কিন্তু সঙ্গীতের বিস্তার প্রতিদিনের নব নব পর্যায়ে। এই পুরোনোকে নতুন করে অনুভব করার শক্তি আর্টিস্টের। আর ইতরে জনাঃ প্রতিদিন চলে দস্তুরের দাগা বুলিয়ে''।

কাশীতে থাকার সময় আশার মনের গভীরের প্রায় অজানা স্তরে একটা গাঢ় সংশয় দেখা দিচ্ছিল, স্বামীর প্রেম সে কি হারাচ্ছে, যদি হারায় তো কেন।—এই প্রশ্ন মনস্তাত্ত্বিক।

''মাসিমার উপদেশ সত্ত্বেও আশা বিনোদিনী সম্বন্ধে মনকে নিষ্কণ্টক করিতে পারে নাই।''

''আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা কিছু আনিতেছে ফেলিতেছে, সেই সমস্ত ক্রমে সংস্কার স্মৃতি অভ্যাস আকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতনভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি।'' 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মানুষের চেতনা প্রবাহের দিকে দৃষ্টিপাত করে তার অন্তর রহস্য আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন। 'চোখের বালি' উপন্যাসে এই মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টি কোণটি চরিত্রগুলির অন্তর-স্বভাবকে আবিষ্কারে সাহায্য করেছে।

বিনোদিনী

রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য ঃ "কাব্যে যেমন তার জন্মের মূলে বেদনাবোধ, সেইখান থেকে তার উৎপত্তি। জীবন প্রস্ফুটিত হচ্ছে শুধু শুষ্ক ঘটনার নয়। তার প্রকাশের পিছনে লুকিয়ে থাকে আঘাত, আনন্দ, অপমান, সংঘাত — দুঃখ বেদনা উল্লাস — সব নিয়েই জীবন। সে তার পাওনা পায় ঝড়ে তুফানে, ভূমিকম্পে, বিপর্যয়ে — সে জীবন থেকে অশ্রু ঝরে, রক্ত মোক্ষণ ঘটে।" 'রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী প্রগতি' প্রবন্ধে কণক মুখোপাধ্যায় বলেছেনঃ "শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে টি এস এলিয়ট বলেছিলেনঃ শেক্সপীয়ারের সমগ্র রচনাই এক অখন্ড কাব্য। একথা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সর্ব্বৈব সত্য। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি। তাঁর সমগ্র রচনাই কাব্যময়। শুধু কবিতা ও গান নয়, তাঁর গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ বিবিধ রচনা চিঠিপত্র — সব কিছুই যেন কবিতা"। রবীন্দ্রকাব্যের মহাভাবলোকে যে শাশ্বত নারী (ETERNAL WOMAN) কোন মর্তের মানবী নয়, রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক জীবনতত্ত্ব ও লীলারহস্যের সঙ্গিনী, কবি-মানসী। এক এক দার্শনিক ভাবনা। কাব্যের অনুভূতি। যার উদ্দেশ্যে কবি বলেছেনঃ "অখিল মানব স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিনী / হে স্বপ্ন সঙ্গিনী'– সে নারী 'বিশ্বের কবিতা' – 'গৃহের বনিতা' নয়। বলাকা কাব্যের পরবর্তীকালে 'পূরবী'র নায়িকা হিসাবেই এ নারী বিশেষভাবে কবির লীলাসঙ্গিনী হিসাবে ধরা দিয়েছে। তারই উদ্দেশ্যে কবির উক্তি।

"আমারে যে ডাক দিবে এ জীবনে তারে বারম্বার
ফিরেছি ডাকিয়া,
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া।"

এই অশরীরি লীলা সঙ্গিনী, কবির কাব্যলক্ষ্মী তাঁকে চালিত করে নিয়ে চলেছে যুগ-যুগান্ত পেরিয়ে সীমাহীন সুদূরে। তারই কাছে আত্মসমর্পিত কবির আকুতি ঃ "আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী/বল কোন পারে ভিড়াবে তোমার সোনার তরী–"। এ তো কোন মর্ত্যের মানবী নয়, রক্ত মাংসে মানুষ নয়। এ একটা ভাব, একটা উপলব্ধি। কবির ধ্যানলোকে কাব্যবিধুর দার্শনিক অবগাহন।

"চার অধ্যায়" এ এলা যেমন বলে, ' প্রকৃতি আমাদের আজন্ম অপমান করেছে। আমরা বায়োলজির সংকল্প বহন করে এনেছি জগতে। সঙ্গে সঙ্গে এসেছি জীবপ্রকৃতির নিজের জোগানো অস্ত্র এবং মন্ত্র।'

অস্ত্র ও মন্ত্র যেন 'নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ....... বিশ্বের প্রেয়সী........ অকুণ্ঠিতা অনবগুণ্ঠিতা'— যার 'লাবণ্যের থরে থরে অঙ্গখানি মুকুলি' 'বিকশি অনিবার সৌন্দর্যেতে উঠিছে উচ্ছ্বসি নিঃসহ যৌবনে'.... সেই নারী।

এক বালিকা বা কিশোরী, যে নারী হয়ে উঠছে দেহে মনে, তার আত্ম-উপলব্ধির সূচনা হয় আত্মরতি দিয়ে; এই পথেই নারীত্বের বিকাশ। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পথের রহস্য বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হবার আগেই সমাজ কিশোরী বা সদ্য যুবতীকে সতীত্বের দীক্ষা দেয়; তাকে পাঠিয়ে দেয় পুরুষ প্রজাতির এক মানুষের শয়নকক্ষে মা হবার জন্যে। পাঠিয়ে দেয় তাকে তথাকথিত সংসারে সাধ্বী স্ত্রী ও গৃহিনী হবার জন্যে। নারী হয়ে ওঠার সময় সে পায় না,

'সুখের দুখের কথা
একটুখানি ভাবব এমন সময় ছিল কোথা,

এ জীবনটা ভালো কিংবা মন্দ কিংবা
যাহোক একটা কিছু
সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু[৪]

রবীন্দ্রনাথ নারীকে সন্ধান করেছেন এই আত্মরতি থেকে আত্ম উপলব্ধিতে উত্তরণের রহস্যরমণীয় পথটুকুতে। বিদ্যাপতির কিশোরী শ্রীরাধা যখন উদ্ভিন্ন যৌবনা, আপনাতে আপনি বিভোর তখন 'ক্ষণভরি নহি রহ্ গুরুজন মাঝে, বেকত অঙ্গ না ঝাপায় লাজে'। সে যেন শুনতে পায় 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি'।

নারীর শরীরে-মনে কবিত্বের পরশ। সমাজ বা ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবন্ধকতা নিয়ত নারীত্বের পাপড়িগুলিকে ঝরিয়ে চলেছে। সেই গোপন-গহন ব্যথা কবির মনোভূমিতে প্রস্ফুটিত হয়েছে। সেই অপ্রকাশের বেদনা বা প্রকাশের ইচ্ছে-লতা রবীন্দ্র-ভাবনায় উল্লসিত না হয়ে বিহার চালায়। এখানেই সৌন্দর্যের ভালোবাসা আর ভালোলাগার পথপরিক্রমণ।

'নিস্কৃতি' – কবিতায় বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে আসার পর —

'অবশেষে হলো
মঞ্জুলিকার বয়স ভরা ষোল।
কখন শিশুকালে
হৃদয়লতার পাতার অন্তরালে
বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি,
প্রাণের গোপন রহস্যতল ফুঁড়ি,
জানত না ত আপনাকে সে......
সেই কুঁড়ি আজ অন্তরে তার উঠছে ফুটে
মধুর রসে ভরে উঠে.......
তাই তো থাকি থাকি
চমকে ওঠে নিজের পানে চেয়ে।
আকাশ পারের বাণী তারে ডাক দিয়ে যায়
আলোর ঝরণা বেয়ে।
অন্তরে তার রাঙিয়ে ওঠে স্তরে স্তরে,
তা দেখে সে আপনি ভেবে মরে।'

'চোখের বালি'-র বিনোদিনীর মধ্যে যৌবনের আকস্মিক তীব্র উদ্ভাস নারী প্রেমের বিচিত্র প্রকাশের সাক্ষ্য দেয়।

'বিবাহের অনতিকাল পরে বিনোদিনী বিধবা হইল। (গ্রামের বাড়িতে বিহারীকে লেখা মহেন্দ্রের চিঠি পড়বার সময়) চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কি রস পাইল, (মহেন্দ্র আশার কথা রঙ্গে রহস্যে আনন্দে যেন মাতাল হইয়া লিখিয়াছে) তাহা বিনোদিনীই জানে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মত জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

'অনতিকাল' শব্দটি লক্ষণীয়। অর্থাৎ বিবাহের স্বল্পালোকে রোশনায়ের তেজ, সানাইয়ের সুর গেল কেটে। যুবতী নারী নির্বাসিতা হলেন বৈধব্যের ব্রতপালনে। কুঁড়ির মধ্যে গন্ধ আকুল যৌবনের প্রাপ্তি সুখের অপ্রস্ফুটনে। মহেন্দ্রের চিঠি বিনোদিনীর সঙ্গে বিনোদিনীর নারীত্বের বোঝাপড়া। অপ্রকাশের বেদনা স্বল্প আয়োজনেই কিরণ খুঁজে পেল। এই রতিতে পূর্বরাগের সূচনা।

পরে আশার সঙ্গিনী হয়ে মহেন্দ্রের বাড়িতে যাবার সময়,

'ক্ষুধিত-হৃদয়া বিনোদিনী নববধূর নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জ্বালাময় মদের মত কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল, তাহারে মস্তিষ্ক মাতিয়া শরীরের রক্ত জ্বলিয়া উঠিল... তখন বিনোদিনী বুকের বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া গুনগুন গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট রহিত, তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত... অপরাহ্নে বিনোদিনী নিজে উদ্‌যোগী হইয়া আশাকে সাজাইয়া তাহাকে স্বামী সম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত।' মনে মনে কল্পলতা কবেই অনুরাগের ভ্রমণ হয়ে হৃদয়-পদ্মে উড়ে উড়ে বসে। তারপর অভিসার। অভিসারে তো দয়িতর তমসা-নিবিড় সঙ্গ লাভ হয় না। কেননা উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলম্ব হয়ে তখন সে কলহন্তরিতা। এখানে অবশ্য কলহ নেই। আশা যেন ললিতা অথবা বিশাখা। মহেন্দ্রের কাম সেখানে সম্পন্ন হয়। আর বিনোদিনী বিরহিনী কল্পলোকের অভিসারিকা হয়। আত্মরতি থেকে আত্মপীড়নের যে আদিম তৃপ্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিক্ষেপণ (Projecton) এর মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা কী প্রচন্ড বাস্তবতায় উপস্থাপিত করলেন রবীন্দ্রনাথ। বিনোদিনীর বঞ্চিত জীবনে না পাওয়ার বেদনা তাকে নতুন খেলায় প্রলুব্ধ করে তুলল, স্থুল আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা-বাসনার ইন্দ্রধনুচ্ছটার রক্তিম রাগে মহেন্দ্রের সঙ্গে মর্ত্য লীলায় লিপ্ত হল। প্রবল আবেগ-উত্তেজনায় এই লীলার মধ্যে এক ধরণের উল্লাসময় আনন্দের জগতকে আবিস্কার করে নিতে চাইছিল বিনোদিনী। স্থুল সুখের এই আকর্ষণকে সে হয়তো তার অতৃপ্ত জীবনে তৃপ্ত হবার উপায় রূপে গ্রহণ করতে চেয়ে ছিল। এর কারণ হিসেবে মনে রাখতে হয়, পরিপ্রেক্ষিতরূপে তার অতীত জীবনে কিছু না পাওয়ার ইতিবৃত্তকে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সে তার স্বাদ-আহ্লাদকে পূর্ণ করে তুলতে পারে নি। অতীত জীবনের চিত্রিত সামান্য ব্যঞ্জনায় লেখক তা জানিয়ে যান।

আত্মরতি থেকে নারীর আত্ম-উপলব্ধির পথে এর পরের ধাপ সম্ভবত প্রেম। এই ধর্মের বশেই বালবিধবা মঞ্জুলিকা ('নিস্কৃতি') বাল্যসঙ্গী পুলিনকে একান্তে দেখে আবেগ কম্পিতা, এই ধর্মের বশেই কিরণময়ীর প্রেম ('চরিত্রহীন' ঃ শরৎচন্দ্র) প্রস্ফুটিত হয়েছিল উপেন্দ্রকে আশ্রয় করেই, বিনোদিনী নিজেকে চিনেছিল, ভালোবেসেছিল এবং অকস্মাৎ জোয়ারের বন্যার মতো জেগে ওঠা প্রেমের ঐশ্বর্যভার অর্পণ করতে চেয়েছিল বিহারীকে।

এই উত্তরণের পথে বিনোদিনীর প্রেমিক পুরুষটা বিহরী। তারই আয়োজনে, সম্পূর্ণতায় তার অভিসায়। মহেন্দ্র-পর্ব যেন তার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দেহ-বল্লরীর বন্ধুর পথ। বিহরী-পর্বে তনু-অতনুর কাব্যায়োজন। প্রেমিক সাধকের আদর্শ-কর্তব্য নিষ্ঠতায় মুগ্ধা নারীর অভিযোজন — কখন নিঃশব্দচারিতায়, কখন প্রগলতায়, আবার কখনও তপস্যাচারণে। এ এক অপূর্ব কাব্যের অভিসার। জটিল জীবনের মনস্তত্বের চোরা আঁকবাঁক বিমূর্ত-সৌন্দর্য নিয়ে আসে মূর্ত জীবন মাঝে। নারী তুমি এক কল্পলতা, বিনোদিনী সেই কাব্যশরীরে গাথা।

'মুক্তি' (পলাতকা) কবিতায় দীর্ঘ বাইশ বছর লক্ষ্মী সতী ভালোমানুষ হয়ে স্বামীর পরিবারের দীর্ঘ গলি বেয়ে চলার পর পথের প্রান্তে পৌঁছে মেয়েটি অকস্মাৎ তেইশতম বসন্তের ডাক শুনল, 'খোল রে দুয়ার খোল'। এই প্রথম তার জীবনে নারীসত্তার পরিচয় পেল সে। এর আগেও তার কাছে এই আহ্বান আসেনি এমন নয়। 'হয়তো মনের মাঝে সংগোপনে দিত নাড়া, হয়তো ঘরের কাজে আচম্বিত ভুল ঘটাত, হয়তো বাজত বুকে জন্মান্তরের ব্যথা; কারণ-ভোলা দুঃখ সুখে হয়তো পরাণ রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে।' কিন্তু সে সব আহ্বান তলিয়ে যেত কাজের চাকার ক্লান্ত সুরের তলায়। এখনকার এই হঠাৎ-পাওয়া অনুভবের স্পর্শ, মাধুর্য ও রোমাঞ্চ তাকে ভুলিয়ে দিল তার বয়স, দশের ইচ্ছে বোঝাই করা জীবনশকট টেনে টেনে মরচে-পড়া রোগ জীর্ণ তার শরীর, তাকে তুলে আনল নারীত্বের সেই অমল শ্যামল প্রেক্ষাপটে যেখানে

তাকে ব্যবহার করতে চাইল, বিনোদিনীর তীক্ষ্ণ চোখে এ সত্য ধরা পড়েছে। বিনোদিনী তার ভেতরের জ্বালায় মশাল জ্বালিয়ে চতুর্দিকে এক প্রলয়ঙ্কর অগ্নিকান্ড ঘটাতে চেয়েছে।

মহিন তার প্রতিদিনের কামনা-বাসনা দেহ মনের তৃষ্ণার শান্তি, তার খেলার-ভাঙার-গড়ার, কাছে টানা, দূরে ঠেলার সামগ্রী। একদিকে মহেন্দ্রকে পীড়ন অন্যদিকে বিহারীর জন্য তপস্যা। বুকে জ্বলন্ত কামনা নিয়েই তার কাশীগমন, প্রায়শ্চিত্ত বা শান্তি লাভের জন্য নয়।

উপসংহার

''চোখের বালি' উপন্যাসের শেষাংশে বিহারীর বিবাহ প্রস্তাবে বিনোদিনীর দৃপ্ত উত্তর ''আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হতেই পারে না। ছি! ছি! এ-কথা তুমি মুখেও আনিও না।'' —এ প্রসঙ্গ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যঃ ''...... রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তর্নিহিত ধর্মবোধ হইতে কখনো তাঁহার শিল্পসৃষ্টিকে লালসার পথে নিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। .... সেটিকে ভীরুতা অপবাদ দেওয়া যায় না, সেটি মার্জিত চিত্তের সুরুচিমাত্র। বিহারী ও বিনোদিনীর মধ্যে বিচ্ছেদের ব্যবধনটা বড় হইয়াছে বলিয়া উহা মহৎ দৃষ্টি।''[৫] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিহারী-বিনোদিনীর বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে বলেছেন — ''একটা লৌকিক বন্ধনহীন আত্মিক মিলন — প্রবৃত্তির ঊর্দ্ধে, সব ঝটিকার ঊর্দ্ধে ধ্রুব নক্ষত্রের স্থির দীপ্তিতে জ্যোতির্ময় চিরলাবণ্যের আশ্বাসবহ।'' প্রতিটি সৃজনী প্রতিভা তার ব্যক্তিগত জীবনদৃষ্টি অনুসারে শিল্প-সাহিত্যে শুভাশুভ, সৎ-অসতের মীমাংসা করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে বলেছেন — ''সৌন্দর্যবোধের যথার্থ পরিণতভাব কখনোই প্রবৃত্তির বিক্ষোভ, চিত্তের অসংযমের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে টিকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের বিরোধী।''

কাব্য হিসেবে কুমারসম্ভবের যেখানে আসা উচিত, সেখানেই ও থেমে গেছে, কিন্তু লজিক হিসাবে প্রবলেম হিসাবে ওখানে থামা চলে না। কার্তিক জন্মগ্রহণের পরে স্বর্গ উদ্ধার করলে তবেই প্রবলেমের শান্তি হয়। কিন্তু আর্টের দরকার নেই প্রবলেমকে ঠান্ডা করা, নিজের রূপটিকে ঠান্ডা করাই তার কাজ।[৬]

বিহারী-বিনোদিনীর বিচ্ছেদের সমস্যাটির যে সমাধান রবীন্দ্রনাথ করেছেন, প্রথম তাঁর প্রবীণ দর্শনের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ এবং দ্বিতীয়ত যে শিল্পরূপে তা দিয়েছেন, তার প্রকরণ পদ্ধতি সাধারণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এর বিরোধিতা যাঁরা করেছেন তারা উপন্যাসটির শিল্পরূপকে আর্টের দৃষ্টিতে না দেখে লজিকের পথে মতামত দেন। 'চোখের বালি'র উপসংহারে অসন্তুষ্ট হয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখলেন - 'চোখের বালি'র আলোচনা প্রতিবাদে শেষ হতে বাধ্য, কেননা এর সমাপ্তি দুর্বল, শুধু দুর্বল নয় অগ্রাহ্য। শেষটা কিছুই নয়; একটা নিষ্প্রাণ জোড়াতালি দেওয়া রফা মাত্র এবং এখানেই এই মনের কারখানা ঘরের উপন্যাসটির শেষ, তা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না।' সমালোচক আরও বললেন— ''যে সৎ-সাহস নিয়ে তিনি বইটি লেখা আরম্ভ করেছিলেন, শেষ মুহূর্তে কিংবা মধ্য পথেই তাঁকে তা পরিত্যাগ করেছিল; হিন্দু-বিধবার বিবাহ ঘটাতে সাহস পেলেন না, তার দ্বারা ধ্বংস ঘটাতে গিয়েও পিছিয়ে গেলেন।'' 'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর উল্লিখিত সমালোচনার জবাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'চোখের বালি বেরবার অনতিকাল পর থেকেই তার সমাপ্তিটা নিয়ে আমি মনে মনে অনুতাপ করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত। মাসিক পত্র অনেক সময় লেখকদের অসতর্ক করে দেয়, লেখায় সস্তা দামের মনোরঞ্জনী প্রলেপ ব্যবহার করার ঝোঁক আসে। এই দুষ্কর্ম করেছি কিন্তু তাতে ফল পাইনি। পাঠকরা যথেষ্ট চোখ রাঙিয়েছিল।' কিন্তু এ শুধু কথার কথা। রবীন্দ্র-পূর্বকালে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিচারিণী শৈবলিনীকে (চন্দ্রশেখর) উন্মাদিনী করে শোধন করেছেন, চপলমতি কুন্দ নন্দিনীর (বিষবৃক্ষ) হাতে বিষপাত্র তুলে দিয়েছেন, স্বৈরিণী রোহিনীকে (কৃষ্ণকান্তের উইল) পিস্তলের গুলিতে চরম শিক্ষা দিয়েছেন। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, ''সমাজকে মান্য করিবে''। পরিবর্তিত যুগধর্মে রবীন্দ্রনাথের

জীবনদৃষ্টি কিছু বিবর্তিত হলেও চারু বৌঠানের (নষ্টনীড়) দৃষ্টিতে পদস্খলনের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া মাত্র অমলকে সঙ্গে সঙ্গে দেশান্তরে পাঠিয়েছেন, কুমারী উর্মিমালার (দুইবোন) হৃদয়ে দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়তেই তাকে বিদেশগামী করেছেন, এবং বিবাহিতা স্ত্রী নীরজার (মালঞ্চ) মৃত্যু অবধারিত জেনেই স্বামী আদিত্যকে তার আবাল্য সাথী কুমারী সরলার প্রেমের অভিজ্ঞান লাভ করতে অনুমতি দিয়েছেন। আর লালসাপূর্ণ দেহজ-কামনার প্রতি তাঁর শিল্পরূপ কিভাবে প্রকাশ পায়, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত চতুরঙ্গের আদিম গুহার অন্ধকারে সেই আদিম জন্তুটিকে পদাঘাতে বিতাড়িত করার বিখ্যাত দৃশ্যটি।

'চোখের বালি'র পূর্বে রচিত 'ত্যাগ' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ) গল্পে ব্রাহ্মণ সন্তান হেমন্ত নিজের অজ্ঞাতে কায়স্থ কন্যা, বাল-বিধবা কুসুমকে বিয়ে করেছিল। যেদিন এই অপ্রিয় সত্য উদ্‌ঘাটিত হল, সেদিন ভিন্ন জাতি বা বিধবা বলে হেমন্ত স্ত্রীকে ত্যাগ করেনি, বরং পরিবার ও সমাজকেই সে ত্যাগ করেছে বিনা দ্বিধায়। বিধবা দামিনীর বিয়ে চতুরঙ্গে যা অনায়াসে সম্ভব হয়েছে তা যে কেবল সময়ের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথের সংস্কার মুক্তি এমন চিন্তাও অর্থহীন। উপন্যাসের রস-পরিণতির জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে বিধবার বিয়ে দিতে লেখকের কুণ্ঠা থাকা উচিত নয়, এ অভিমত রবীন্দ্রনাথের। ঔপন্যাসিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'তপস্বিনী' উপন্যাসের উপসংহার প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়— ''নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি করেছেন। ফর ইন্‌স্টান্স, সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে একজন ছোকরার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপন করলেন তবে তার অন্ত্যেষ্টি সৎকার না করে ছাড়লেন কেন ? ও রকম স্থলে যা হতে পারে সেটাকে সরলভাবে তার সম্পূর্ণ বীভৎস মূর্তিতে পরিস্ফুট করলেন না কেন ?''[৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ অনেক অগ্রগামী হলেও সমাজ তাঁর কাছেও যথেষ্ট সম্মানীয় অভিধা। তিনিও সমাজ নামক সেই শিলীভূত, মমতাহীন, অপরিবর্তনীয় অভিধাটির বিরুদ্ধে অসহায় নিরপরাধী মানুষের হাহাকারের প্রতিচিত্র রচনা করেছেন সামাজিক মানুষের, বিশেষ করে সেই অন্ধ হৃদয়হীন সমাজপতিদের চেতনা জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে। আর্টের সীমানা এখানেই শেষ। বুদ্ধদেব প্রমুখদের ইচ্ছা অনুসারে এই দুটি অভিসপ্ত নরনারীকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করলে সে হতো আর্টের সীমানা ছাড়িয়ে লজিকের কাজের পরিচায়ক। ই.এম.ফস্টার কোন কোন শিল্পীর এই প্রবণতাকে বিদ্রুপ ক'রে বলেছেন, 'that idiotic use of marriage as a fimale' রবীন্দ্র দৃষ্টিতে দেহমনের মালিন্য মুক্তির সাধনা তাই তপস্যায়, ত্যাগ আর সংযমের বাঁধা প্রায়শ্চিত্তের মধ্যেই আত্মিক মুক্তি। ভোগসুখের আবিলতা মানুষকে সংকীর্ণতায় বাঁধে, এই সত্যই রূপায়িত হয়েছে বিনোদিনীর প্রায়শ্চিত্তে।

বিনোদিনী-মহেন্দ্র

রাজলক্ষ্মীর সংসার-তরণী যখন আপাত সুখের বাতাসে ভেসে চলেছে, মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্য জীবন যখন ভালোবাসায় বিভোর থেকেও ইন্দ্রিয়প্রবণতার অতিরেকের কারণে মুক্তির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, সেই সংকট মুহূর্তে নারী বিনোদিনী তার সকাম বাসনা নিয়ে দৃশ্যপটের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। সেতো কাদম্বরী নাটকের পত্রলেখা নয় — যে কেবল চন্দ্রাপীড়ের সেবকার্যে নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজে নেবে এবং তার মধুর প্রেমলীলার নীরব সাক্ষী থাকবে। একালের বিনোদিনীর পক্ষে পত্রলেখা হওয়া সম্ভবও নয় —– অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করবার স্বাধীন চিন্তা যুগ এবং কালের প্রেক্ষিতে অনিবার্য হয়ে ওঠে বলে বিনোদিনী আপন আকাঙ্ক্ষায় একাগ্র চিত্তে মহেন্দ্রর সঙ্গে মর্ত্যলীলায় লিপ্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'র সমকালীন রচনা 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে বলেছেনঃ ''দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দেবশাপ লাগিয়েছে; সে মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ

হইয়া আপনার বিচিত্র কারু-ঘটিত পরমসুন্দর বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহব্রত দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ, তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরল নির্মলবেশে কল্যাণের শুভ্র দীপ্তিতে কমনীয় হইয়া উঠিয়াছে।"[৮] ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথও তাঁর কবিত্বের স্পর্শে, গ্লানি-মালিন্যের উর্দ্ধে জীবনের যে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলিত, তাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই বিনোদিনীর মধ্যে প্রবৃত্তির আগুনকে অতিক্রম করে কল্যাণের দীপশিখা অম্লান জ্যোতি নিয়ে জ্বলেছে।

বিনোদিনীর প্রেমের দ্বৈতরূপের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে লেখা কাব্যেও পাওয়া যায়। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয় এ বিষয়ে আলোকপাত ক'রে 'মহুয়া' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'নাম্নী' অংশে সমধর্মীতা দেখিয়াছেন।

নারীমনের বিভিন্ন রূপকে ব্যক্ত করে 'নাম্নী'-র কবিতাগুলির জন্ম। যৌবনের যে দাহ, যে দৃপ্ত রূপ রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তারই কাব্যময় রূপ 'নাগরী', কবি বলেছেন—

সে যেন তুফান
যাহারে চঞ্চল করে যে তরীকে করে খান খান
অট্টহাস্যে আঘাতিয়া এপাশে ও পাশে
অদৃশ্য আগুনে
কুঞ্জ তার বেড়িয়াছে
যারা কাছে আসে
সব থেকে তারা দূরে রয়;
মোহমন্ত্রে যে হৃদয়
করে জয়
তারি পরে অবজ্ঞায় দারুণ নির্দয়।

এ যেন মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্ক। আবার সেই নারীই আচরণে ও মনোভাবে কত পৃথক 'নাগরী' রূপের থেকে—

আপন তপস্যা লয়ে যে পুরুষ নিশ্চল সদাই
যে উহারে ফিরে চাহে নাই,
জানি সেই উদাসীন
একদিন
জিনিয়াছে ওরে
জ্বালাময়ী তারি পায়ে দীপ্ত দীপ দিল অর্ঘ্য ভরে।

এ যেন বিনোদিনীর উদ্দাম চঞ্চল প্রণয়। 'অচঞ্চল স্নিগ্ধ শিখায়' রূপান্তরিত হয়ে নির্বিকার সংযমী পুরুষ বিহারীর চরণে আত্মোৎসর্গ করেছে।

ভাষার বন্ধন

'চোখের বালি' উপন্যাসের নিরলঙ্কৃত অনাড়ম্বর এবং সহজ সরল ভাষায় তৎসম শব্দের সীমিত প্রয়োগ এবং তদ্ভব ও দেশি শব্দের অধিক প্রয়োগ রয়েছে। মান-অভিমান, অনুরাগ-বিতরাগ, সুখ-দুঃখ এবং সংঘাত-মিলনের অনুভবে বাস্তব জীবন তার পারিপার্শ্বিকতা সমেত পেয়েছে সমগ্র জীবনের নানান অভিব্যক্তি প্রকাশের উপযোগী রূপ। ব্যক্তি-মানসের সুক্ষ্ম জটিল আবর্তে পরিবেশ সৃজন উপন্যাসটির চরিত্রগুলির আবেগ-আকুতি, অনুভবের দ্যোতনা প্রকাশে বা চরিত্রের অন্তর মহলের অনুভব্য ভাষা যা একাধারে কাব্য-ধর্মযুক্ত এবং আলঙ্কারিক তাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। হাস্য পরিহাসে এবং মানব মনের সুক্ষ্ম বেদনা বোধ অঙ্কনে অথবা তৎসম শব্দের বাণী ভঙ্গিতে প্রবৃত্তির অনাবৃত রূঢ় বাস্তব রূপকে, আভরণে স্থাপিত হয়েছে অনবদ্য সৌন্দর্য রূপ। উপমা আশ্রিত ভাষাতে চরিত্র ব্যাখ্যান, গদ্য ভাষার অন্তঃপ্রকৃতিতে ছন্দের বিহার, প্রবাদ-প্রবচন, ধর্মীয় বাক্য, বঙ্কিমী ঢঙে সাধু গদ্য রীতি, কাকু-বক্রোক্তির প্রয়োগ সংলাপে কাব্যময়তা এবং ইঙ্গিতময়তার দৃষ্টান্ত রেখেছে। কথ্য রীতিতে সহজ-সরল আবেদন থাকলেও কাব্যময়তা কোনো কোনো জায়গায় লঘু হয়ে গেছে। অথবা একথা বলা যায় কথ্যরীতির মেজাজে কাব্যময়তা কখনো ভারবাহী হয়ে ওঠেনি। অরূপ ও অব্যক্তকে প্রকাশের জন্য কাব্য বচনের সাহায্য নিলেও বাচ্যার্থকে পেরিয়ে অনির্বচনীয়তার দিকে উত্তরণেই তার অভীষ্ট। এখানে তাই জীবন দর্শনের আলোকে ঘটতে দেখি অন্তর্লীন ভাবের প্রকাশ।

উপন্যাসের নির্মাণ শিল্পের মূল আশ্রয় তার ভাষা। উপন্যাসের প্রকরণগত যে বিভিন্ন উপাদান — কাহিনি, চরিত্র, পরিবেশ ইত্যাদি — সব কিছুরই মূল ভিত্তি এই ভাষা। বস্তুত একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ভাষা উপন্যাসের ভাবপ্রকাশের নিছক এক যান্ত্রিক বাহন মাত্র নয়, কেবল জীবনের বহিরঙ্গ অবয়বকে গড়ে তোলার শিল্প সৌন্দর্যহীন উপায় মাত্র নয়, এর অতিরিক্ত আরও গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ এক মাত্রা যোজনা করতে সক্ষম উপন্যাসের ভাষা। "Language like clay or paint, is a transfiguring meterial, not a lens, through which the artist projecs his vision." [৯] ঔপন্যাসিকের জীবন-বিষয়ক যত কিছু বক্তব্য — সামাজিক, পারিবারিক বা রাষ্ট্রীয় প্রক্ষাপটে একান্ত বস্তুগত রূপ, কিংবা জীবনের তীব্র দ্বন্দ্বময় নাট্যস্বরূপ অথবা তার নিহিত সূক্ষ্মগ ভীর কাব্যময় সৌন্দর্য সব কিছুরই সার্থক প্রকাশ প্রাণবন্ত ভাষা-বিন্যাসের বিশ্বস্ত হাত ধরে। উপন্যাসের ভাষা একাত্ম হয়ে আছে উপন্যাসের নির্মিতির সাথেই। জীবনের মন্দ্র এবং তার সপ্তক উভয়রূপের প্রকাশ ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট — তাই ভাষা কোন পৃথক প্রকরণ নয়। জীবনের ব্যাপ্ত চরাচরে খনি ও আকর সংগ্রহের পথে ভাষা তার প্রধান সহচর। ব্যক্তিত্বের যথার্থ স্ফুরণ তার হাত ধরেই। বঙ্কিম তৈরি করে দিয়েছিলেন বাংলা উপন্যাসের ভাষা-বিন্যাসের একটি সুস্পষ্ট কাঠামো। উপন্যাসের বাহন গদ্য ভাষা হলেও যুক্তি-তথ্য নির্ভর। মনন ধর্মী প্রবন্ধের ভাষা কখনোই উপন্যাসের আদর্শ ভাষা রীতি হতে পারে না — 'বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত'।[১০] জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনা ও মননের মিশ্রণে উপন্যাসে যে কাহিনি, চরিত্র, পট-পরিবেশ ইত্যাদি গড়ে তোলেন ঔপন্যাসিক তার ভাষা অন্যান্য প্রবন্ধ-নিবন্ধের গদ্য থেকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই স্বতন্ত্র খাতে বইবে। বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষা কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত সরল বাক্য, প্রশ্ন সূচক বাক্যের প্রাচুর্য, পাঠককে সম্বোধন সূচক মধ্যম পুরুষের ব্যবহারের মাধ্যমে তার সাথে অন্তরঙ্গতা স্থাপন, ভাষায় নাটকীয় চমক এবং আকস্মিকতার প্রয়োগ এ ধরনের বিশিষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত।

'চোখের বালি'র ভাষারীতিতে এই নাটকীয়তার অভাবকে কোন কোন সমালোচক একান্ত ত্রুটিযুক্ত বলে মনে করেছেন। বুদ্ধদেব বসু এ রচনা রীতিকে বলেছেন: 'সমতল রচনা রীতি' বা 'অবন্ধুর আখ্যান ভঙ্গি' কিংবা 'কণ্ঠস্বর একই পর্দায় রেখে একই ভাবে বলে যাওয়া....... কোথাও বেশি জোর না দিয়ে বলার ধরণ'। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, রচনারীতির 'এই

ভাবটি আমাদের ভালো লাগে না'। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ এই রীতিই সচেতন ভাবে অনুসরণ করেছেন — কাহিনি রসের উপর জোর না দিয়ে মনোজীবনের গভীর অনুভবগুলিকে ধীর শান্তভাবে বিন্যস্ত করা, বিশ্লেষণ করা। আর এই কারণেই এই ভঙ্গিই পরবর্তি পর্যায়ের উপন্যাস গুলিতে স্পষ্টতর হয়েছে।

'চোখের বালি' উপন্যাসের ভাষা-বিন্যাসকে কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করে তার মধ্যে কবিত্বের প্রয়োগ কোথায় কোথায় রয়েছে তা দেখানো হল —

(১) কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের ভাষ্য-রচনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভাষা। সহজ সরল বাণী ভঙ্গিমায় এই ভাষা চরিত্রের আন্তর-স্বভাবকে তুলে ধরেছে। পরিবেশে, চরিত্রের অন্তর মহলে, ঘটনার মুহূর্তে প্রায় সর্বত্রি এই ভাষা ব্যবহার চিরকালীন হৃদয়ের করে তোলা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী যাকে বলেছিলেন 'প্রসাদ গুণ', 'চোখের বালি'-তে যেন তার প্রথম পরিচয় (রবীন্দ্র-উপন্যাসে)। আঙ্গিক বিন্যাসে অপ্রসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় বিষয় ছেঁটে তিনি সৃজ্যমান চরিত্রগুলির অন্তর মানসকে স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তাই ঔচিত্য বোধের কারণে বা পরিমিতির বোধে তিনি অনেক সময় কাহিনির প্রয়োজনে ভিন্ন প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছিলেন সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত ধর্মীতায়। যেমন বিধবা বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্র বা বিহারীর বিবাহের প্রস্তাব বাতিল হবার পর সহমর্মী লেখক বিনোদিনীর জীবন কাহিনি আঁকলেন, — ' বিধি নির্বন্ধে যাহার সহিত তাহার শুভ বিবাহ হয়, সেই লোকটির সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্লীহাই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রবল। প্লীহার অতি ভারে সে দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারিল না।' দক্ষ স্রষ্টার তুলির টানে বাচ্যার্থ কী চমৎকার ব্যঞ্জনা দিয়ে যেতে পারে আলোচ্য অংশটি তার প্রমান। এছাড়া আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

(ক) —— অসম্পূর্ণ চেষ্টাকে মহেন্দ্র পুড়াইয়া ছাই করিয়াছে।[১১]

(খ) বিনোদিনী নিঃশব্দে সেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। ঘরে ছুঁচটি পড়িলে শব্দ শোনা যায়, এমনি হইল। অনেকক্ষণ পড়ে মহেন্দ্র হঠাৎ কথা কহিল। অকস্মাৎ নিঃশব্দতা ভঙ্গে বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল —তাহার হাতে ছুঁচ ফুটিয়া গেল।[১২]

(গ) মাঘের অপরাহ্ন তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইবার উপক্রম করিতেছিল।[১৩]

(ঘ) জিহ্বাকে মহেন্দ্র দন্ত দ্বারা দংশন করিল — তাহার পর হইতে রসনা নির্বাক হইয়া রহিল।[১৪]

(ঙ) বিনোদিনী। সমুদ্র তো পড়িয়া আছে, তবু মেঘের ধারা নইলে চাতকের তৃষ্ণা মেটেনা কেন?[১৫]

২) আন্তর স্বভাবের দিক থেকে এই ভাষা অনেকটা আটপৌরে ধরণের। পারিবারিক জীবনে ব্যবহৃত সেকালের ভাষাকে আবিষ্কার করা যায় এই উপন্যাসে, গঠনগত দিক থেকে তা সাধু রীতির অনুবর্তী হলেও ভাষার গতিময়তা ও প্রয়োগ কৌশলে অধিক পরিমাণে আটপৌরে রীতি বা চলিত ভাষারই অনুগামী। ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম টুকু বাদ দিলে এ ভাষাকে কোনভাবেই তৎসম নির্ভর সাধু ভাষার অনুষঙ্গবলে মনে হয় না।

দৃষ্টান্ত —

(ক) কাকি, মা বউকে যে রূপ খাটাইয়া মারিতেছে আমি তো তাহা দেখিতে পারিনা।

(খ) আমাদের দুঃখের শরীরে অসুখ করে না পিসীমা।

(গ) মিথ্যা সন্দেহ করিয়ে আমি বিনোদিনীকে অন্যায় আঘাত করেছি।

(ঘ) বিহারীকে পরিবেশন করিয়া বিনোদিনী যেন একটে বিশেষ সুখ পাইয়াছে।

(ঙ) মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মত আমাকে একটা কিছু দাও।

(চ) সে তোমার নহে, আমি তাহাকে চুরি করিয়া আনি নাই, সে নিজে আমার কাছে আসিয়া ধরা দিয়াছে। — ইত্যাদি।

শব্দ, অর্থ, ভাব এই তিনের সমণ্বয়ে ভাষা-ভঙ্গিমা বাচ্যার্থ ও ব্যাঙ্গার্থ সৃষ্টি করে সাধুতা বজায় রেখেছে। যেখানে তৎসম শব্দ 'সাধ্বী', 'পুষ্পভার লুণ্ঠিত', 'উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত ব্যাকুল',

'হর্ম্যশিখরপুঞ্জ', 'জ্যোৎস্নামদবিহ্বল' প্রভৃতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় সেখানে অনেকটা বঙ্কিমী ঢঙে সাধু গদ্যরীতির স্বীকরণ রয়েছে এবং কাব্যলক্ষ্মীও হোঁচট খেয়েছে। তদ্ভব শব্দ, বিদেশী শব্দ এছাড়া দেশী শব্দ কুলুঙ্গি, (ঘর) কন্যা, টিলা, অমল প্রভৃতির প্রয়োগে সহজ সরল অনাড়ম্বিত জীবনভাষ্য বা ঘটনা মুহূর্তের স্পষ্টরেখা দেখা দিলেও কবিত্ব হারিয়ে যায়নি রাঙামাটির ধুলোতে।

৩) বাস্তব জীবন, তার পারিপার্শ্বিকতা চরিত্রের বিচিত্র অভিব্যক্তিকে ফুটিয়েতোলে। উপন্যাসে নরনারীর কোনো মুহূর্তই যে স্থানগত পরিবেশে সংস্থাপিত না হলে সহজে পাঠক-চিত্তে জীবন্ত হয়ে উঠেনা আয়ান ওয়াটের এই মন্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত ("we cannot easily visualize any particular moment of existence without setting it in its special context also"[১৬])।

মহেন্দ্রের প্রতি রাজলক্ষ্মীর অভিমান, বিনোদিনীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম-সংঘাত — এই ভাষার ইঙ্গিতে বা তির্যকতায় স্পষ্ট হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ রাজলক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার মানসিক সংঘাতের চিত্র ভাষায় প্রকাশ করলেন —

ক) "মহেন্দ্রের ফেল করার সংবাদে রাজলক্ষ্মী গ্রীষ্মকালের আকস্মিক অগ্নিকান্ডের মত দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু তার গর্জন ও দাহনটা সম্পূর্ণ ভোগ করিলেন অন্নপূর্ণা। তাঁহার আহার নিদ্রা দূর হইল।" সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতে রাজলক্ষ্মীর ক্রোধবহ্নিকে চিত্রিত করলেন অসাধারণ দক্ষতায়।

বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের অনুরাগ যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তখনকার একটি চিত্র —

খ) "মহেন্দ্রের স্নানাহার হইয়া গেল, সমস্ত গৃহ কর্মের বিরামে মধ্যাহ্ন নিস্তব্ধ হইয়া গেল, তবু বিনোদিনীর দেখা নেই। দুঃখে এবং সুখে, অধৈর্যে এবং আশায় মহেন্দ্রের মনোযন্ত্রের সমস্ত তার গুলা ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল।"

৪) পরিমিতি বোধে লেখকের দক্ষতা এবং কবিত্বের প্রকাশ ধরা পড়ে। অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্য বর্জিত মেদহীন বাক্য বিন্যাসে চমৎকার রূপ পেয়ে যায় মানবিক অভিব্যক্তি গুলি। যেমন মহেন্দ্রের অভিব্যক্তিতে — "বিনোদিনী আমাকে ভালোবাসে ইহাতে সন্দেহ নাই"। কথাটি সংক্ষিপ্ত অথচ চমৎকার ব্যঞ্জনা নির্ভর। ভাষার প্রসাদ গুণে কাহিনি ও চরিত্রের পরিণতির বিভিন্ন পর্যায় গুলি এভাবেই সংহত রূপ নিয়েছে কখনো সংক্ষিপ্ত তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতে, কখনো কথায় আবার কখনো ভাব-ভঙ্গিতে। বাক্য বিন্যাসে সংক্ষিপ্ততার তির্যক ব্যঞ্জনায় প্রকাশের একটি দৃষ্টান্ত — "আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি যদি আশাকে ভালো না বাসিতে তবে আমার দ্বারা আশার এমন সর্বনাশ হইত না।" বিনোদিনীর এই স্বীকৃতি যেমন তার চরিত্র স্বভাবটিকে প্রকাশ করেছে, তেমনি আশা-মহেন্দ্রের দাম্পত্য জীবনকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাবার নেপথ্যে বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর অনুরাগ বাঁক-সংহতিতে প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। The Psychological Novel, P.251

২। বনস্পতির বৈঠক, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৫৯-২৬৩; রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধকুমার সান্যাল : অলক মন্ডল, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, কার্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র যুগ্ম সংখ্যা, ১৪১২, সম্পাদক সঞ্জীবকুমার বসু

৩। যুবমানস, মে, ১৯৮৬

৪। মুক্তি, পলাতকা

৫। রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৯-৭১, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৬। সাহিত্যের মাত্রা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। চিঠিপত্র-৮ম/পৃঃ ১৩৮, পত্র সংখ্যা ১২৮

৮। প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯। Jane Austen's Novel- Andrew H. Wright, 1957, p.195

১০। বাঙ্গালা ভাষা। দ্র. বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় খন্ড, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খন্ড, সাহিত্য সংসদ, পৃ ৩৭৩

১১। ২০ নং পরিচ্ছেদ, চোখের বালি

১২। ২২ নং পরিচ্ছেদ, ঐ

১৩। তদেব

১৪। তদেব

১৫। তদেব

১৬। The Rise of the Novel (1966) p.26.

নৌকাডুবি

পূর্বাভাস

'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি'র দুই বছর পরের রচনা, ১৩১০-১১ সালের নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ ১৯০৩ সালের বৈশাখ থেকে ১৯০৫ সালের আষাঢ় মাস পর্যন্ত বের হয়। ১৯০৬-এ এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি 'স্মরণ', 'উৎসর্গ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের, 'স্বদেশীয় সমাজ' 'সফলতার সদুপায়' প্রভৃতি বিখ্যাত সামাজিক ও রাজনীতিক প্রবন্ধের প্রায় সম-সাময়িক। আর্ট এবং মননশীলতা উভয় দিক থেকেই উপন্যাসটি 'চোখের বালি' অপেক্ষা অপরিণত। 'চোখের বালি' স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির আনন্দে লিখেছিলেন, 'নৌকাডুবি'র পিছনে ছিল মাসিক পত্রিকার তাগিদ। "নৌকাডুবি উপন্যাস লেখকের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের রচনা নয়, মাসিক পত্রের তাগদায় মাসের পর মাস বিচ্ছিন্ন, অসংলগ্নভাবে লেখা। ... যে বৎসর 'নৌকাডুবি' 'বঙ্গদর্শনে' ছাপা হইতে আরম্ভ হয়, সেই বৎসর সম্পাদকের হাতে ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাস আর ছিল না। ... অন্তরের প্রেরণায় আর প্রয়োজনের তাড়নায় রচনার মধ্যে পার্থক্য কিছু আশ্চর্যের কথা নয়।"[১] রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন যে নৌকাডুবি রচনার পিছনে ছিল 'প্রকাশকের ফরমাশ' ঃ "প্রকাশক জানতে চেয়েছেন নৌকাডুবি লিখতে গেলুম কী জন্যে। এসব কথা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ — বাইরের খবরটা দেওয়া যেতে পারে, সে হল প্রকাশকের তাগিদ। প্রকাশকের ফরমাশকে প্রেরণা বললে বেশি বলা হয়। অথচ তাছাড়া বলব কী? গল্পটায় পেয়ে বসা আর প্রকাশকে পেয়ে বসা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। বলাবাহুল্য ভিতরের দিকে গল্পের তাড়া ছিল না। গল্প লেখার পেয়াদা যখন দরজা ছাড়ে না তখন দায়ে পড়ে ভাবতে হল কী লিখি।"[২] নৌকাডুবিতে সৃষ্টির তারগুলো সব ঢিলে করে বাঁধা। উপন্যাসটি সাইকো অ্যানালিটিক্যাল নভেলের প্রাথমিক স্তরে রয়ে গেছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অভিমত ঃ "নৌকাডুবি'র ব্যর্থতার কারণ তার কাহিনীর ঘটনাবাহুল্যের মধ্যে বা কাহিনির মধ্যে নেই। বাইরের দিক থেকে জটিল এই কাহিনির অন্তরের দিক থেকে কোন জটিলতা সৃষ্টি করেনি। অথচ রবীন্দ্রনাথের কাহিনী বাইরের দিক থেকে সরল — ভিতরে ভিতরে এর প্রতিক্রিয়ার নানামুখী জটিলতায় উপন্যাসের প্রাণ, সেখানেই এ কৌতূহলের স্রষ্টা, নৌকাডুবিতে এটি ঘটেনি। এখানে আকস্মিক ঘটনা থেকে যে সমস্যা উদ্ভূত হল তার মূল ব্যক্তিমানসের গভীর উৎস নয়, ব্যক্তিত্বের গোটা সমস্যার সঙ্গে তার কোন যোগ আছে কিনা তাও উপন্যাসে স্পষ্ট হয়নি।"[৩]

সময় ও সংস্কার ঃ ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে হিন্দুধর্মের নবজাগরণের যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও বিশ্বাসের ওপর তার ছায়া পড়েছিল। হিন্দুধর্মের আদর্শ ও সংস্কারগুলিকে এই সময় নতুন করে মূল্যায়ন করা শুরু হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য হিন্দু বিবাহের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন চন্দ্রনাথ বসু। এই বিতর্কে যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'হিন্দু বিবাহ' (১২৯৪)। পরবর্তীকালে হিন্দু বিবাহের এবং ভারতবর্ষীয় বিবাহের নিগূঢ় তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে লেখেন 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' (১৩৩২)। হিন্দু বিবাহের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল নৌকাডুবি তারই ফলশ্রুতি।

'নৌকাডুবি'র প্রায় কুড়ি বছর পরে লেখা 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' প্রবন্ধে ভারতীয় দাম্পত্য আদর্শের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — "স্বামী বলে একটি ভাবকে শিশুকাল হতেই বালিকারা ভক্তি করতে শেখে! নানা কথা কাহিনী ব্রতপূজার ভিতর দিয়ে এই ভক্তিকে মেয়েদের রক্তের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে স্বামীকে যখন পায় তখন তাকে তারা ব্যক্তি বলে নয়, স্বামী বলে দেখে। সেই স্বামী অনেকখানিই তাদের নিজেরই মনের জিনিস, বাইরের জিনিস নয়। বিচার-বুদ্ধি পরিণত হবার পূর্ব হতেই অনির্দিষ্ট ব্যক্তির উপরে এই স্বামী-ভাব আরোপ করে দিনে দিনে এই পতিগত সংস্কার তাদের দেহমনকে অধিকার করে তোলে।"[৪]

উদ্ধৃত অংশের মধ্যেই 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের রসনিষ্পত্তির মূল সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যাবে। ভারতীয় হিন্দুর দাম্পত্য আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে এর সময় প্রভূত অনুপ্রাণিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ এই সময় ভারতীয় দাম্পত্য আদর্শে স্বামী-স্ত্রীর সমান অধিকার স্বীকার করেননি। তাঁর মধ্যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর প্রশ্নাতীত আনুগত্য কোনো সামাজিক সমস্যার কারণ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — "ভারতীয় বিবাহের বিচার করতে হোলে একথা জানা চাই যে, এ-বিবাহে স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের সাম্য নেই। এখানে অধিকার বলতে আমি বাহ্য অধিকারের কথা বলছি নে। এই অসাম্যের দ্বারা স্ত্রীলোকের চরিত্রে হীনতা ঘটতে পারত। তা যে ঘটেনি তার কারণ, স্বামী তার পক্ষে

আইডিয়া। ব্যক্তির কাছে পাশববলে সে নত হয় না, আইডিয়ার কাছে ধর্মবলে সে আত্মসমর্পণ করে।"[৫]

রক্ষণশীল হিন্দু মানসিকতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের দৈবনিয়ন্ত্রিত আকস্মিকতা সর্বস্ব, দুর্বল-গ্রন্থী উপন্যাস 'নৌকাডুবি'। নায়ক-নায়িকার জীবনে প্রকান্ড একটা ভুলের দম লাগিয়ে দিয়েও তিনি শেষ রক্ষা করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে পরিণত শিল্পচেতনার মাপকাঠিতে বিচার করে 'নৌকাডুবি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য — "বন্ধনটা এবং সংস্কারটা দুই সমান দৃঢ় হয়ে যদি নারীর মনে শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষের অস্ত্র-চালাচালি চলত তা'হলে গল্পের নাটকীয়তা হতে পারত সুতীব্র, মনে চিরকালের মতো দেগে দিত তার ট্র্যাজিক শোচনীয়তার ক্ষতচিহ্ন।"[৬] বন্ধন ও সংস্কারের মধ্যে সংস্কারের প্রতি অতি পক্ষপাতের ফলে উপন্যাসখানির সমস্ত সম্ভাবনাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

চরিত্র

কমলা

কমলা চরিত্র অঙ্কনে কবিকল্পনার বিচিত্র বর্ণসম্পাত ঘটেছে। জীবনের বিচিত্র ঘটনাবৃত্ত তার চরিত্রে যে পরিবর্তন ও রূপান্তরের সৃষ্টি করেছে তার সহজ ও বাস্তবনিষ্ঠ বর্ণনা উপন্যাসটির সম্পদ। কমলা চরিত্রের ক্রমপরিণতি, তার ক্রমবর্ধিত প্রণয়াবেগ, গৃহিণীপনার মধ্যে আপন অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ছোটখাট ঘটনা কমলা চরিত্রের অন্তর্দেশ আলোকিত করেছে। বিবাহের পর নৌকাডুবিতে একদিকে বাঁচল রমেশ অন্যদিকে অনুরূপ দুর্ঘটনায় বাঁচল অন্য একটি নববধূ কমলা। ভুল করে তারা পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী রূপে গ্রহণ করল। কিছুদিনের মধ্যেই রমেশ তার ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত হল। কিন্তু কমলা কিছুই জানল না। একান্ত নির্ভরতার মধ্য দিয়ে নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে রমেশকেই সে তার স্বামী বলে গ্রহণ করেছিল। এই দিনগুলিতে রমেশের প্রণয় চর্চার মধ্য দিয়ে কমলার অপরিণত নারী মন কিভাবে ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথ তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু যেদিনই রমেশ জানতে পেরেছে কমলা তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, তখনই সে সুকৌশলে নিজেকে কমলার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। কমলার চরিত্রকে লেখক খুব সহজেই বিকশিত করে তুলেছেন বলে রমেশের ব্যবহারে কমলার হৃদয়ে একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। ঘটনাক্রমে নলিনাক্ষকে স্বামী বলে জানা মাত্রই কমলা তার হৃদয় উৎসর্গ করেছে সেই অজানা অচেনা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, আর প্রতিদিনের চেনা মানুষকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। কমলার মানসিক বিপর্যয়ের রূপ দু'দিক থেকে ফুটিয়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল। একদিকে রমেশের সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবনযাপনে দৈহিক অশুচিতাবোধ, অন্যদিকে নলিনাক্ষের বিবাহিতা স্ত্রীরূপে তার সংস্কার। মানসিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাকে উদঘাটন করেনি। কমলা চরিত্র অঙ্কনে যেখানে 'বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ' লেগেছে সেটুকুই আলোচনা করব।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কমলার মনের অব্যক্ত বেদনা রূপময় হয়ে উঠেছে। ''কমলা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না, তাহার মনের মধ্যে কী একটা গূঢ় বেদনা পীড়ন করিতেছে। শরৎকালের এই শিশির বাষ্পাম্বরা ঊষা কেন আজ তাহার আনন্দমূর্তি উদঘাটন করিতেছে না? কেন একটা অশ্রুজলের আবেগ বালিকার বুকের ভিতর হইতে কণ্ঠ বাহিয়া চোখের কাছে বারবার আকুল হইয়া উঠিতেছে? .... ইতিমধ্যে কি ঘটিয়াছে যাহাতে আজ তাহার মনে হইতেছে, একলা রমেশ মাত্র তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল নহে? কেন মনে হইতেছে এই বিশ্বভুবন অত্যন্ত বৃহৎ এবং সে বালিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র।''[১]

এখানে রবীন্দ্রনাথ কমলার অন্তর্নিহিত বেদনাকে প্রকাশ করার মাধ্যামে ঘটনার ইঙ্গিতকে আভাসিত করেছেন। এই অভিমান ক্রমশঃ বিপুল আকার ধারণ করেছে। কমলার অন্তরে একটা বিদ্রোহের বেগ এসেছে; সে বিদ্রোহ হচ্ছে সমস্ত কিছু প্রাণপণ শক্তিতে অস্বীকার করার বিদ্রোহ। প্রবল ঝড়ের রাত্রির সঙ্গে কমলার হৃদয় একাত্ম হয়ে গেছে।

''এই প্রলয়ের মধ্যে যে একটা বাধাহীন শক্তি, একটা বন্ধনহীন স্বাধীনতা আছে তাহা যেন কমলার হৃদয়ের মধ্যে একটা সুপ্ত সঙ্গিনীকে জাগাইয়া তুলিল। এই বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের বেগ কমলার চিত্তকে বিচলিত করিল। কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাহার উত্তর কি এই ঝড়ের গর্জনের মধ্যে পাওয়া যায়? না, তাহা কমলার হৃদয়াবেগেরই মতো অব্যক্ত। একটা কোন অনির্দিষ্ট অমূর্ত মিথ্যার, স্বপ্নের অন্ধকারের জাল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য আকাশপাতালে এই মাতামাতি, এই রোষগর্জিত ক্রন্দন। পথহীন প্রান্তরের প্রান্ত হইতে বাতাস কেবল 'না না' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নিশীথরাত্রে ছুটিয়া আসিতেছে — একটা কেবল প্রচন্ড অস্বীকার। কিসের অস্বীকার? তাহা নিশ্চয় বলা যায় না — কিন্তু না, কিছুতেই না, না, না, না,''।

এখানে রবীন্দ্রনাথ কমলার হৃদয়ে বেদনার অনুভূতি থেকে ধীরে ধীরে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছেন। এই আঘাতেই তার মধ্যে প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। তার উৎস কোথায় সে নিজেও জানে না। কিন্তু তার অচেতন মনের গহনে কোথায় যেন একটা তীব্র অভাব অনুভূত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে মনোবিশ্লেষণের নিপুণ শিল্পী। হৃদয়ের পট ধীরে ধীরে কিভাবে উন্মোচিত হচ্ছে, সেই চিত্রাঙ্কণ উপন্যাসের এই অংশ পর্যন্ত সার্থক।

এরপর শৈলজার সঙ্গে কমলার গভীর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। শৈলজার দাম্পত্য জীবনের রূপ

কমলার দৃষ্টিতে পূর্ণতা নিয়ে এল। গভীর শূন্যতায় তার দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই শূন্যতার উৎস কোথায় সে রহস্য কমলারর অজ্ঞাত ছিল। কারণ " কমলার জীবনের চিত্রপটে তাহার দাম্পত্যের যে একটা ছবি উঠিয়াছে, তাহা একটি পেনসিলের ক্ষীণ রেখামাত্র, ... কমলা এতদিন এই শূন্যতা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার অবকাশ পায় নাই। .... বন্ধুত্বের প্রথম আরম্ভেই শৈলজা যখন তাহার স্বামীর কথা বলিতে আরম্ভ করিল — যে সুরে শৈলজার হৃদয়ের সব তারগুলি বাঁধা রহিয়াছে, আঙ্গুল পড়িবামাত্র যখন সেই সুরগুলি বাজিয়া উঠিল, তখন কমলা দেখিল, কমলার হৃদয় হইতে এ সুরের কোন ঝঙ্কার দিবার নাই; স্বামীর কথা সে কি বলিবে, বলিবার বিষয়ই বা কি আছে। বলিবার আগ্রহই বা কোথায়! সুখের বোঝাই লইয়া শৈলজার ইতিহাস যেথা হু হু করিয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে কমলার শূন্য নৌকাটা সেখানে মাটিতে ঠেকিয়া অচল হইয়া আছে।" তার হৃদয় শূন্য, কিন্তু দৃষ্টি অস্পষ্ট নয়। অপরিণত নারী হৃদয়ের ক্রমিক উন্মোচনের এই চিত্র রবীন্দ্রনাথের মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির একটি সার্থক প্রকাশ।

২৭ নং পরিচ্ছেদে কমলার শূন্যতার বেদনা ও বিদ্রোহের অন্তর্জ্বালাকে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছো। তার উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ স্বাভাবিক পথে চরিতার্থ হয়নি, তাই তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। যেখানে নির্ভরতাও নেই, সেখানে তার সঙ্কট চরমে উঠেছে। দু'পাশে শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়ে গ্রাম্যপথে বধূরা জল নিয়ে ঘরে ফিরে যায়। — "ঘর বলিতেই তাহার প্রাণ যেন বুকের বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। একটুখানি মাত্র ঘর — কিন্তু সে ঘর কোথায়? শূন্য তীর ধূ ধূ করিতেছে, প্রকান্ড আকাশ দিগন্ত হইতে দিগন্তে স্তব্ধ। অনাবশ্যক আকাশ, অনাবশ্যক পৃথিবী — ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে এই অন্তহীন বিশালতা অপরিসীম অনাবশ্যক — কেবল তাহার একটি মাত্র ঘরের প্রয়োজন ছিল।"

হেমনলিনী

হেমনলিনী চরিত্রকে গভীর রেখায় আঁকা হয়নি, তীক্ষ্ণ-দীপ্ত বিশ্লেষণের সাহায্যেও তার হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুর আলোকিত করা হয়নি। কিন্তু এই অভিজাতরুচি, অ-বাক্‌পটু, শান্ত-সংযত চরিত্রটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেমনলিনী বাংলা সাহিত্যের নতুন নায়িকা। বঙ্কিমচন্দ্রের ও বঙ্কিমযুগের লেখকদের উপন্যাসে এই শ্রেণীর নায়িকার আভাসমাত্রও ছিল না। এর আগে স্ত্রী-শিক্ষার অভাবাত্মক দিকটির বিদ্রুপাত্মক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তার যে একটি সৌকুমার্য ও সুসঙ্গতিরও দিক আছে, তা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে সর্বপ্রথম উদ্‌ঘাটিত হল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — 'ইতিপূর্বে বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষে', তারক গাঙ্গুলি 'স্বর্ণলতা'য় ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু 'মডেল ভগিনী' গ্রন্থে ব্রাহ্মসমাজের অভাবাত্মক দিকের অতিরঞ্জিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'য় ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনা আছে সত্য, কিন্তু তিনি অভাবাত্মক দিকটিই কেবল দেখান নাই, সমাজের প্রতি সুবিচারেরও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন।'[৮] হেমনলিনীর চরিত্রে কোন রূঢ়তা বা আতিশয্য নেই। তার প্রেমের মধ্যেও একটা শান্ত-সমাহিত বিরল মাধুর্য আছে। কবি হেমনলিনীর যে ছবি এঁকেছেন, তাতেই তার চরিত্র ব্যঞ্জিত হয়েছে ঃ

"রমেশ একেবারে তাহার পার্শ্বে যাইতে কুণ্ঠিত হইল। পশ্চাৎ হইতে কিছুক্ষণের জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। শরতের অপরাহ্ন আলোকে ঐ বাতায়ন-বর্তিনী স্তব্ধ মূর্তিটি রমেশের মনে একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া দিল। ঐ সুকুমার কপোলের একটি অংশ, ঐ সযত্নরচিত কবরীর ভঙ্গি, ঐ গ্রীবার উপরে কোমলবিরল কেশগুলি, তাহার নীচে সোনার হারের একটুখানি আভাস, বাম স্কন্ধ হইতে লম্বিত অঞ্চলের বঙ্কিমপ্রান্ত, সমস্তই রেখায় রেখায় তাহার পীড়িত চিত্তের মধ্যে যেন কাটিয়া বসিয়া গেল।"[৯]

অক্ষয়ের চক্রান্তে যখন রমেশ ও কমলার সম্পর্ক প্রকাশিত হল, তখন হেমনলিনী ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছে কিন্তু রমেশের উপর সে অভিমান করেনি। অক্ষয়ের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল না, তবু সে তাকে আঘাত করেনি। রমেশের প্রতি তার ভালোবাসা যে কত গভীর, তা নলিনাক্ষের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া থেকে জানা যায়। নলিনাক্ষকে সে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু ভালোবাসে রমেশকেই। তাই নলিনাক্ষের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে তার মনে হয়েছে ঃ "কিন্তু যখনই বিবাহের প্রস্তাবে তাহাকে তাহার হৃদয়ের গভীরতম দেশের আশ্রয়সূত্র হইতে টানিয়া আনিতে চাহে তখনি সে বুঝিতে পারে, সে বন্ধন কী কঠিন! তাহাকে কেন ছিন্ন করিতে আসিলেই হেমনলিনীর সমস্ত মন ব্যাকুল হইয়া সেই বন্ধনকে দ্বিগুণবলে আঁকড়িয়া ধরিতে চেষ্টা করে।" হেমনলিনীর চরিত্রের চারদিকে একটি সুকোমল মাধুর্য আছে, কিন্তু সহনশীলতা ও সংযম তার চরিত্রে দৃঢ়তা সঞ্চার করেছে। এই দৃঢ়তা ও উত্তেজনাহীন

মনোধর্মই তাকে চরম আঘাতের মুহূর্তে অবিচলিত রেখেছে। কিন্তু হেমনলিনী পূর্ণাঙ্গ চরিত্র বলা যায় না। কেবল পিতার সঙ্গে স্নেহ-বাৎসল্য সম্পর্কটি ছাড়া, তার চরিত্রের অনেকখানি অংশই যেন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু "হেমনলিনীর মূল্য ঐতিহাসিক। কিন্তু সাধারণভাবে তাহার নীরব সংযত সমাহিত স্বভাব, সুক্ষ্ম অনুভবক্ষম মন ও হৃদয়, কোমল অথচ দৃঢ়বীর্য, বিরুদ্ধশক্তির সম্মুখে অবিচল দীপ্তি নারীত্বের এক নূতন পরিচয় বহন করিয়া আনিয়াছে এবং এই পরিচয়ই জীবনের পূর্ণতার অভিজ্ঞতায়, বিচিত্রতর রসে ও সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ হইয়া পরে সুচরিতায়, লাবণ্যে, কুমুদিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। হেমনলিনী ইহাদের সকলের পূর্বাভাস।"[১০]

শিক্ষিতা, সরল হৃদয়া, অপাপবিদ্ধা, অন্নদাবাবুর মতো দেবকল্প পিতার কাছে মানুষ, সে যেন এ কাহিনীর লেখকের হাতে দশ-পঁচিশের ঘুঁটি। বারে বারে তাকে নিয়ে তিনি খেলেছেন। প্রথমে কোন ব্যারিষ্টার গেছে, তারপর রমেশ, অতঃপর বিদূষক চরিত্র অক্ষয়ের কাঙ্ক্ষিত তরুণী, শেষে নলিনাক্ষ জননীর মকরমুখো সোনার বালা-সহ আশীর্বাদ পর্যন্ত হয়ে যাবার পর মুহূর্তে পূর্ণচ্ছেদ! এ কেমন শিল্পরীতি? অন্নদাবাবুর মতো পিতার সঙ্গে সব স্বপ্নকল্পনার ওপর যবনিকা টেনে হেম যখন একটা মহামূল্যের মধ্যে বসে কলকাতা প্রত্যাগমন করেছে, তখন 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র শিল্পীর উদার হৃদয়ে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বা একফোঁটা চোখের জল ফেলার সময় আর রইল না। 'সূচনা'য় হতভাগ্য রমেশের ট্রাজেডিতে তিনি ব্যথিত হয়ে উঠেছেন, কিন্তু রমেশের চরিত্রে ট্রাজেডির দৃঢ়তা, ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সামান্যতম ব্যক্তিত্ব তার কোথায়? স্রষ্টার নিষ্করুণ দৃষ্টিতে হেমের এই দুর্ভাগ্য, চরিত্রের মধ্যে কবিত্বের রং-মুছে ফেলা। তাই হেমনলিনী পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের অবয়ব পায়নি।

প্রকৃতির রূপ-ভাষ্য (পরিবেশ)

জীবনের শেষ সময়ে 'সূচনা' লিখতে গিয়ে তিনি সম্ভবত তাঁর মৌলিক দুর্বলতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবেন, তাই উপন্যাসে শিল্পের ঐশ্বর্যের প্রশ্ন বাদ দিয়ে তিনি তার মধ্যে "কবিত্বের স্পর্শে"-র গৌরব করেছেন। "গল্পের মধ্যে যে অংশে বর্ণনায় এবং বেদনায় কবিত্বের স্পর্শ লেগেছে, সেটাতে যদি রসের অপচয় না ঘটে তাহলে সমস্ত নৌকাডুবি থেকে সেই অংশ হয়তো কবির খ্যাতি কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখতে পারে।"

নৌকাডুবি উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কবিত্বের জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ করে নেননি। কিন্তু নদী-প্রকৃতি কাহিনির মধ্যে বেশ খানিক জায়গা করে নিয়েছে। উপন্যাসে কলকাতা গাজিপুর কাশী সুনির্দিষ্ট স্থান পরিবেশ হিসেবে অবস্থান করলেও তা পটভূমিতেই থেকেছে— লোকাল কালার, স্থান বিশেষের বিশিষ্ট রূপ-রঙ-মেজাজকে সামনে এনে উপভোগ্য করে তোলেননি। তবে উপন্যাসের একটা অংশ জুড়ে পদ্মা-গঙ্গা বাড়তি মোহ বিস্তার করেছে। আটটি পরিচ্ছেদ ব্যয়িত রয়েছে নায়ক-নায়িকার স্টিমার ভ্রমণে। কিঞ্চিৎ অতিবিস্তার যদি কোথাও থাকেও তবু তাকে অপব্যয় বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের জীবনে-মনে, কবিতায় - ছোটগল্পে কয়েক বছর আগে থেকেই রূপে ভাবে পদ্মার বিস্তার ঘটেছিল। উপন্যাস নৌকাডুবিতে তার স্বাদ কিছু পাওয়া গেল।

পদ্মায় ঝড়ে নৌকা ডুবে যাওয়ার বর্ণনায় নিপুণ বস্তুনিষ্ঠা আছে। কিন্তু অভিনবত্ব ধরা পড়েছে নদীবক্ষে দীর্ঘকাল ষ্টিমার ভ্রমণের পরিকল্পনায়। গোয়ালন্দ থেকে গাজিপুর পর্যন্ত প্রথমে পদ্মায়, পদ্মা থেকে গঙ্গায় ওরা ভেসে চলেছে। সকাল সন্ধ্যা দুপুর রাত্রি। নদীর রং বদলেছে, রূপও। তার মধ্যে ষ্টিমারে নবদম্পতির গেরস্থালি গড়ে উঠেছে। জাহাজ আটকে রইল চড়ায়। কোনো রাতে বা ঝড় ওঠে। মাঝে মাঝে ঘাটে থামে। জাহাজীদের সঙ্গে গ্রামগুলোর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বল্পস্থায়ী। ভেসে যেতে যেতে নদীর ধারের জীবনকে এক ঝলক দেখা। দু-একটি দৃষ্টান্ত ঃ

(১) "সেদিন অনেক ঠেলাঠেলিতেও ষ্টীমার ভাসিল না। উঁচু পারের নিচে জলচর পাখিদের পদাঙ্কখচিত একস্তর বালুকাময় নিম্নতট কিছু দূর হইতে বিস্তীর্ণ হইয়া নদীতে আসিয়া নামিয়াছে। সেই স্থানে গ্রামবধূরা তখন দিনান্তের শেষ জল সঞ্চয় করিয়া লইবার জন্য ঘট লইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনে প্রগলভা বিনা অবগুণ্ঠনে এবং কোনো কোনো ভীরু ঘোমটার অন্তরাল হইতে ষ্টীমারের দিকে চাহিয়া কৌতূহল মিটাইতে ছিল। ঊর্দ্ধনাসিক স্পর্ধিত জলযানটার দুর্বিপাকে গ্রামের ছেলেগুলো পাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া চিৎকার স্বরে ব্যঙ্গোক্তি করিতে করিতে নৃত্য করিতেছিল।"

চরে যান আইটে যাওয়ার মধ্যে রমেশ কি তার জীবনের প্রতিরূপ দেখেছিল নিষ্ক্রিয় নিরর্থক ভবিষ্যৎহীন জীবনের? না হলেও কম দামী নয় ঈষৎ অলস নিস্পৃহ চোখে দেখা এই ছবি-কাহিনির সাধারণ পটভূমি।

(২) "তীরের বনরাজি অবিচ্ছিন্ন মসীলেখায় সন্ধ্যাবধূর সোনার অঞ্চলে কালো পাড় টানিয়া দিল। গ্রামান্তরের বিলের মধ্যে সমস্ত দিন চরিয়া বন্য হংসের দল আকাশের ম্লানায়মান সূর্যাস্তদীপ্তির মধ্য দিয়া ওপারের তরুশূন্য বালুচরে নিভৃত জলাশয়গুলিতে রাত্রি-যাপনের জন্য চলিয়াছে। কাকেদের বাসায় আসিবার কলরব থামিয়া গেছে। নদীতে তখন নৌকা ছিল না; একটি মাত্র বড় ডিঙি গাঢ় সোনালি-সবুজ নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়া আপন কালিমা বহিয়া নিঃশব্দে গুণ টানিয়া চলিয়াছে।"

নয়নলোভন এই কালোয় সোনালিতে মেশানো বর্ণাঢ্য দীপ্ত অথচ শান্ত সন্ধ্যার ছবিটি রমেশের আত্মমগ্নতার পটভূমি মাত্র। তার ভাবনার ও বেদনার কোনো প্রতীক-দ্যোতনায় তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এই রূপসী নদী-প্রকৃতির মুখোমুখি রমেশ হেমের কথা ভেবে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে-ব্যাকুলতাও শান্ত সংযমের সীমায় বদ্ধ ও ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসের মত।

(৩) "....নিস্তব্ধ জলের উপর সূক্ষ্ম একটুখানি কুয়াশার আচ্ছাদন পড়িয়াছে, অন্ধকার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং পূর্বদিকে তরুশ্রেণীর পশ্চাতের আকাশে স্বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে নদীর পাণ্ডুর নীলধারা জেলে ডিঙির সাদা-সাদা পালগুলিতে খচিত হইয়া উঠিল।"

নদীবক্ষে ঊষাকালের ছবি। বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা। কমলার চোখে দেখা। রমেশ্বর আচরণে, স্বামী হয়েও তাকে

দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টায় তার মনে যে অস্পষ্ট সংশয় ও নিগূঢ় অভিমান জন্মেছে তার যোগ্য পটভূমি।

(৪) "আশ্বিনের সুন্দর দিনগুলি নদীপথেরর বিচিত্র দৃশ্যগুলিকে রমণীয় করিয়া তাহারই মাঝখানে কমলার এই প্রতিদিনের আনন্দিত গৃহিণীপনাকে যেন সোনার জলের ছবির মাঝখানে এক-একটি সরল কবিতার পৃষ্ঠার মতো উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।"

জাহাজ থেকে নদী ও নদী তীরের কিছু শারদ দৃশ্যখণ্ড এবং জাহাজের মধ্যে কমলার ঘরকন্নার নানা বিবরণ দেবার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত অংশটিতে রমেশের মনের কথা বলেছেন। নদীপ্রকৃতির সঙ্গে স্টিমারের চলার সঙ্গে মিলে কমলা রমেশের অন্তর জুড়ে ধীরে ধীরে কিন্তু অনিবার্য ভাবে আসন পেতে বসছে।

(৫) ঝড়ের বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের ভাষা-শক্তির উপযুক্ত। কমলার চোখ দিয়ে এই ঝড়কে দেখা হয়েছে —

"ঝড়ের বেগের সঙ্গে জলের কল্লোল ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। খালাসিদের গোলমাল শোনা যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে এঞ্জিন-ঘরে সারেঙের আদেশ সূচক ঘন্টা বাজিয়ে উঠিল। ... কমলা বিছানা ছাড়িয়া কামরার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকালের জন্য বৃষ্টির বিশ্রাম হইয়াছে, কিন্তু ঝড়ের বাতাস শরবিদ্ধ জন্তুর মতো চীৎকার করিয়া দিগ্‌বিদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু উর্দ্ধে-নিম্নে, দূরে-নিকটে, দৃশ্যে-অদৃশ্যে একটা মূঢ় উন্মত্ততা, একটা অন্ধ আন্দোলন অদ্ভুত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া যমরাজের উদ্যত শৃঙ্গ কালো মহিষটার মতো মাথা ঝাঁকা দিয়া উঠিতেছে।"

উপমা এবং সরাসরি বর্ণনাতে ঝড়ের স্বরূপ অসাধারণ হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিক কমলার মনের উদ্বেল অবস্থার সঙ্গে একে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। স্বামীর বাইরে সহৃদয়তা এবং ভিতরে নিষ্ঠুরতা — তার প্রতি অকারণ বিমুখতার ফলে কমলার মনে যে বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তারই প্রতিবাদী শক্তির বহিঃপ্রকাশ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে। তবে তার এই প্রবল হৃদয় আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ সে জানে না। ঝড় থেমে গেলে, মেঘমুক্ত চন্দ্রালোকে ডেকের উপরে ভারমুক্ত হৃদয়ে রমেশ স্থির করেছে কমলাকেই স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে জীবন কাটাবে। মন্ত্রবন্ধনের অভাবকে গ্রাহ্য করবে না।

ঝড়বৃষ্টির রাত্রিতে একটা ভয়ঙ্কর জন্তুর রূপকে কমলার অন্তরের মধ্যে ঝড়ের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা তার বর্তমান ব্যক্তিমানসের ওপর আলোকপাত করে। এই গুণ পরিবৃত্তি সূচক বাক্যালঙ্কারে শোভিত রূপকটিকে ইংরেজিতে বলা হয় Pathetic fallacy. যে মনোবিকলনের কথা কবি এই গ্রন্থের সূচনায় দাবি করেছেন, এই অতুলনীয় প্রকৃতিচিত্রটি তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। বয়স এবং বুদ্ধি কম হলেও কমলার ব্যক্তিসত্তা যেন লৌহময়, বিরুদ্ধ পরিবেশে স্থিত হয়েও উন্নতশির, তার বচন এবং উচ্চারণে বিদ্যুতের দীপ্তি, তার চরিত্রে অনমনীয় প্রতিবাদের সুর। ঐ জান্তব রকমের ঝড়বৃষ্টির মত সে নির্ভীক মনে যেন বলে চলেছে, না, না। কোনো বিরুদ্ধ শক্তির কাছেই সে ভয়ে মাথা নত করবে না। এই প্রাকৃতিক রোষ, ঝড়ঝঞ্ঝার এই রুদ্ররূপ তার ব্যক্তিসত্তার প্রতীক।[১১]

প্রকৃতি বিষয়ে আর কিছু কবিত্বের স্পর্শ ঃ

"শ্রান্ত হৃদয় যখন রোদন বন্ধ করিল, তখন চন্দ্র অস্ত গেছে। অন্ধকারের মধ্যদিয়া এই নির্জন ধরাখণ্ড অদ্ভুত স্বপ্নের মতো বোধ হইল। বালুচরের অপরিস্ফুট শুভ্রতা প্রেতলোকের মতো পাণ্ডুবর্ণ। নক্ষত্রের ক্ষীণালোকে নদী অজগর সর্পের চিক্কন কৃষ্ণচর্মের মতো স্থানে স্থানে ঝিক ঝিক করিতেছে।"

(১) ২য় পরিচ্ছেদে দেখি, দূর নদীপারের কোন এক স্থানের কন্যার সঙ্গে পিতা-নির্দিষ্ট বিবাহ-প্রক্রিয়া সমাপনান্তে তারা ফেরার পথে। নির্মল পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দেখা গেল ঃ

"একটা প্রকান্ড এদৃশ্য সম্মার্জনী ভাঙা ডালপালা, খড়কুটা, ধূলাবালি আকাশ উড়াইয়া প্রচন্ড বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। 'রাখ্ রাখ্, সামাল সামাল হায় হায়' করিতে করিতে মুহূর্তকাল পরে কি হইল, কেহই বলিতে পারিল না। একটা ঘূর্ণি হাওয়া একটি সংকীর্ণ পথমাত্র আশ্রয় করিয়া প্রবলবেগে সমস্ত উন্মূলিত বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া নৌকা-কয়টাকে কোথায় কী করিল, তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।"

পদ্মার মধ্যে এক চরে রমেশ জ্ঞানলাভ করে দেখল, দূরে লাল চেলি পরা এক নববধূ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর সেখানে কোন প্রাণী দেখা গেল না। অর্থাৎ আর সকলের সলিল সমাধি হয়েছে। অনেক চেষ্টায় রমেশ জ্ঞানহীন নববধূর চেতনা ফিরিয়ে এনে তারা শূন্য ঘরে প্রত্যাবর্তন করল। রমেশ ভাবল, এই তার স্ত্রী সুশীলা, সেও

নির্বিবাদে রমেশকে স্বামী বলে বলে গ্রহণ করল, কিন্তু আসলে সে ছিল পরস্ত্রী। এই হল শিল্পীর 'ভুলের দম'। অতঃপর লেখকের পরিকল্পনার গতি প্রকৃতি।

২য় পরিচ্ছেদে বিবাহ ও দুর্ঘটনা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রায় শূন্য বাড়িতে এই দুই তরুণ নরনারীর জীবনখেলা আরম্ভ। এখানের সবকটি চরিত্রই যেন হঠাৎ - আসা একটা ঝোড়ো হাওয়ার ক্রীড়ণক।

(২) ১০ নং পরিচ্ছেদ, বর্ণনায় কবিত্ব ঃ সঙ্গীতচর্চা। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের অবিরল বৃষ্টিধারার মধ্যে 'বায়ু বহে পুরবৈঞা, নিদ নহি বিন সৈঞা' সহযোগে একদিন যখন আবহটা ভারী হয়ে ওঠে, তখন এই দুই মানব-মানবীর মুখের ওপর গাছের ছায়া নেমে আসে। ক্ষণমাত্র বৃষ্টি থামার ফাঁকে রমেশ বাড়ি ফেরে। কিন্তু রাত্রিতে সে ঘুমোতে পারে না। ঝুপঝুপ বৃষ্টির সঙ্গে সেই মনে ধরা গানের সুরটা তাকে পাগল করে তোলে। আর হেমনলিনী? গভীর অন্ধকারের মধ্যে একধারে চুপ করে বসে বসে বৃষ্টির শব্দ শোনে, কখন কানে বাজে সেই 'বায়ু বহে পুরবৈঞা'-র মনমাতানো সুরটা। তারও চোখে ঘুম নেই। — পরিস্থিতেই হেম-রমেশের বিবাহ স্থির হল।

(৩) ২৩ থেকে ৩০ এই আটটি পরিচ্ছেদে উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ স্টীমারে ভাসমান একটি ক্ষুদ্র সংসারে হাসি-কান্না, রাগ-বিরাগের ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল যে জীবনকাহিনী চিত্রিত করেছেন, শিল্পরীতির সূক্ষ্ণ, কুশলী প্রয়োগে কবিত্বের শিখর স্পর্শ করেছে। নদীর ওপর ভাসমান মাত্র দিন কয়েকের একটি সংসার শিল্পীর প্রকরণ-পদ্ধতির মহিমায় এমনই জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে মনে হয়, এ যেন স্টীমার নয়, নদীর পারে কোন এক অজানা গ্রামাঞ্চলে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের সত্যকার কাহিনী লেখক বাণীবদ্ধ করে চলেছেন।

ভাষার বন্ধন

'নৌকাডুবি'- ভাষারীতি অনেকটা 'চোখের বালি'র অনুরূপ হলেও তা যেন আরও সহজ স্বচ্ছন্দ ও নির্ভার। শব্দবিন্যাসে তৎসম ও অলঙ্কারের প্রয়োগ যেন আরও হ্রাস পেয়েছে। 'নৌকাডুবি'-তে কাহিনির ভূমিকা 'চোখের বালি'-র তুলনায় বেশি জোরালো হওয়ার ফলে ভাষাকে অধিকতর গতিশীল করতে হয়েছে। গল্পের গতিশীলতা ফোটাতে এই সহজ মসৃণ সংক্ষিপ্ত বাক্যযুক্ত ভাষা নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু 'নৌকাডুবি'র ভাষা সর্বত্র নিশ্চয় এমন নয়। 'চোখের বালি'র মতো আঁতের কথা বের করে দেখানোর দায় এই উপন্যাসের না থাকলেও হৃদয়ধর্মের আবেগময় প্রকাশের দৃষ্টান্ত গ্রন্থটিতে অবিরল। সেই আবেগ বিহ্বল হৃদয়ের প্রকাশে কিংবা অনুরূপ বিহ্বল চিত্তের দর্পণে প্রতিফলিত পরিবেশ বর্ণনায় যে চিত্র -সঙ্গীতময় ব্যাঞ্জনাধর্মী ভাষাবিন্যাস চোখে পড়ে, তা নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষারীতির অভ্রান্ত নিদর্শন ঃ

"ক্ষণকালের জন্য বৃষ্টির বিশ্রাম হইয়াছে, কিন্তু ঝড়ের বাতাস শরবিদ্ধ জন্তুর মতো চীৎকার করিয়া দিগ্‌বিদিক ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মেঘ সত্ত্বেও শুক্লচতুদর্শীর আকাশ ক্ষীণ আলোকে অশান্ত সংহারমূর্তি অপরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করিতেছে। তীব্র স্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে না; নদী ঝাপসা দেখা যাইতেছে; কিন্তু উর্দ্ধে-নিম্নে, দূরে-নিকটে, দৃশ্যে-অদৃশ্যে একটা মূঢ় উন্মত্ততা, একটা অন্ধ আন্দোলন যেন অদ্ভুত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া যমরাজের উদ্যতশৃঙ্গ কালো মহিষটার মতো মাথা ঝাঁকা দিয়া উঠিতেছে।[১২]

প্লট নির্মিতি

'নৌকাডুবি'তে গল্প বিন্যাসের পিছনে পরিচিত জীবনের বাস্তবতার চেয়ে জোরালো প্রেরণা রয়েছে একটি প্রমাণ নিরপেক্ষ প্রকল্পের। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যাকে Working hypothesis[১৩] বলে অভিহিত করেছেন। মূল কাহিনীর সূত্রপাত এক আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে। এই আকস্মিক দৈবদুর্ঘটনাই কাহিনীর সকল সমস্যা-জটিলতার মূল ভিত্তি। জীবনে আকস্মিক ঘটনা যে ঘটে না এমন নয়। কিন্তু শিল্পের দাবী হল তাকে বিশ্বাসযোগ্যরূপে বিন্যস্ত করতে হবে। কিন্তু সমগ্র 'নৌকাডুবি'র কাহিনিতে এ ধরনের বিন্যাসের অভাব বারবার চোখে পড়ে। ঘটনার মধ্যে কার্যকারণহীন অসঙ্গতি ঘটনায় স্বাভাবিক গতির বদলে কৃত্রিমতার আরোপ-উপন্যাসের নির্মাণশিল্পকে বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে। কাহিনীর গোড়ার দিকেই এ ধরনের একটি প্রধান ত্রুটি হল — কমলা যে তার স্ত্রী নয়, রমেশের কাছে এ রহস্য উন্মোচিত হতে সময় লেগেছে তিন মাস। অথচ রমেশের নিজের ও তার পরিবারের অন্য স্ত্রীলোকদের পক্ষে এ কথা বহু পূর্বেই জানা স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া পরবর্তী পর্যায়ে দীর্ঘদিন অনবহিত থাকার পর যে পরিস্থিতিতে কমলা হেমনলিনীকে লেখা রমেশের চিঠি পড়ে নিজের যথার্থ পরিচয় জানতে পারে — তা নিতান্তই কৃত্রিমভাবে সাজানো এক পূর্বপরিকল্পিত ব্যবস্থা। কাশীতে এসে কমলার নলিনাক্ষের সাক্ষাৎ পাওয়া, মোগলসরাই ষ্টেশনে হঠাৎ উমেশের সঙ্গে দেখা হওয়া এবং নৌকাডুবির পর যখন নলিনাক্ষ কমলার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, তখন তার পক্ষেকমলার সন্ধানে তেমনভাবে সচেষ্ট না হওয়া ইত্যাদি সব ঘটনাই কৃত্রিমভাবে আরোপিত মনে হয়। প্রথম দুটি ঘটনায় কার্যকারণের অনিবার্য সঙ্গতির চেয়ে নাটকীয় আকস্মিকতার পরিচয়ই যেন বেশি মেলে। অবশ্য নিছক গল্পরসিক পাঠকের কাছে এই কাহিনির এক ধরনের জোরালো আকর্ষণ আছে। এর প্রধান কারণ, গল্পের মধ্যে একটা 'সাসপেন্স' সৃষ্টি করে গল্পের 'ঔৎসুক্য' অল্প বিস্তর আগাগোড়া বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন লেখক। এই 'ঔৎসুক্য' রচনার দিক থেকে গোটা কাহিনীটিকে আদি-মধ্য-অন্ত — এই তিন স্তরে বিন্যস্ত করা চলে।

"'আদি' স্তর হল, অক্ষয়ের গোয়েন্দাগিরিতে অতিষ্ঠ রমেশের কমলাকে নিয়ে গোপনের পশ্চিমযাত্রার আগে পর্যন্ত (১-২২ পরিচ্ছেদ) 'মধ্য'স্তর হল, রমেশ-কমলার ষ্টিমারে পশ্চিম যাত্রা ও গাজীপুরে অজ্ঞাতবাস (২৩-৩৫ পরিচ্ছেদ)। এই স্তরের শেষেই কমলা যেখানে হঠাৎ পাওয়া চিঠি থেকে আপন পরিচয় জানল — তারপর থেকেই বস্তুত শেষ স্তরের সূচনা। এরপর থেকে নলিনাক্ষের সঙ্গে কমলার পুনর্মিলনের মধ্যে দিয়ে সকল উৎকণ্ঠার অবসান পর্যন্ত পর্বটিই 'অন্ত্য'পর্ব (৩৬-৬২ পরিচ্ছেদ)।

সমগ্র কাহিনীটি লক্ষ্য করলেই মনে হতে পারে — এতে কতকটা রহস্য রোমাঞ্চ গল্পের 'প্যাটার্ন' আছে যেন। এরকম হবার কারণ — এই উপন্যাসের কাহিনীতে গ্রন্থির পর গ্রন্থি যুক্ত হয়েছে, কিন্তু চরিত্রের উপর তার প্রভাব কখনই গভীর বা জটিল হ'তে পারে নি। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসে কাহিনী পরিণামের দুটি দিক। — একটি

সুখান্তক, অন্যটি বিয়োগান্তক কমলার স্বামীলাভ ও রমেশের ট্র্যাজেডি। কিন্তু এর মধ্যে কোন কাহিনি, কার জীবন কাহিনি মুখ্য, কমলার না রমেশের — উপন্যাস পড়া শেষ হয়ে গেলেও যেন সেটা অস্পষ্ট থেকে যায়। মনে হয় লেখক নিজেই যেন এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত। উপন্যাসটির 'সূচনা' অংশেই তাঁর এ দ্বিধা প্রতিফলিত — রমেশের 'ট্র্যাজেডি' এবং কমলা সংক্রান্ত 'চরম সাইকলজি' দুটি দিকেই যেন তাঁর আকর্ষণ। এর দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত যেন বিপন্নবোধ করেছেন লেখক — ঠিক যেন মনস্থির করতে পারেন নি। উপন্যাসের প্রথম ৩৫ পরিচ্ছেদে বস্তুত কমলার কোন অন্তর্দ্বন্দ্বই নেই যেন। ওই পর্বের কাহিনীতে তার ভূমিকা তাই কতকটা গৌণ। সেখানে, বলাবাহুল্য, রমেশেরই বিশেষ প্রাধান্য — হেমনলিনীর আখ্যান বস্তুত রমেশের মনস্তাত্ত্বিক প্রাধান্যকেই স্ফুটতর করেছে যেন। আবার শেষদিকে (৩৫ পরিচ্ছেদের পর থেকে) রমেশের চিঠি কমলার চোখে পড়া ও তারও পরে নলিনাক্ষের আবির্ভাব থেকে কাহিনী আশ্রয় করেছে মুখ্যত কমলাকে, কমলার দিক থেকে বিবৃত ঘটনাকে। এই দ্বৈধতা বা বিভাজনের ফলে গল্পের ঐক্যবন্ধন সুদৃঢ় হতে পারেনি।

শুধু তাই নয়, গল্পের শেষাংশে রমেশের ট্রাজেডি যে গাঢ়বন্ধ হতে পারেনি, তার অন্যতম কারণ — সেখানে তার মননের দ্বন্দ্ব সংহত হবার আর সুযোগ পায়নি। বস্তুত এই পর্বে কমলা-নলিনাক্ষের পুনর্মিলন রহস্য-উন্মোচনের ধাক্কায় রমেশ ক্রমশই কতকটা যেন পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকায় পর্যবসিত হয়ে গেছে — ট্র্যাজিক চরিত্রের গুরুত্ব বা তাৎপর্য অর্জনের সম্ভাবনা থেকে সে তখন প্রায় ভ্রষ্ট।

উপন্যাসের শেষাংশ কাহিনী বিন্যাসের দিক থেকে সবচেয়ে দুর্বল। এই অংশে ঘটনার স্বাভাবিক গঠন বা বাস্তবতার চেয়ে রূপকথাধর্মী রোমান্সের ইচ্ছাপূরণ-প্রবণতা স্ফুটতর। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী', বিশেষ ভাবে, 'ইন্দিরা'-র ঘটনা-পরিণামের বিন্যাসের সঙ্গে এর সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। 'নৌকাডুবি'র শেষাংশে দেখি, লেখক যেন ক্রমশ একদিনের ছড়ানো বিচিত্র ঘটনা ও চরিত্রের জাল গুটিয়ে আনছেন। উপন্যাসটির যে ঘটনাস্থল দূরব্যাপ্ত ছিল, তা যেন একটি ক্ষুদ্রায়ত মঞ্চে সীমিত হল — কিন্তু তা রহস্যময়ী নিয়তির নির্দেশে নয়, নিতান্তই লেখকের 'অসঙ্গত' ইচ্ছায়, জোর করে ঘটনার পূর্বনির্ধারিত পরিণতি সৃষ্টির সংকল্পে। নলিনাক্ষের সঙ্গে কমলার আকস্মিক সাক্ষাতের পরে ঘটনার পরিণাম সম্পর্কে পাঠক স্পষ্ট ইঙ্গিত পেয়ে যান — তখন আর নলিনাক্ষ - ক্ষেমংকরী - হেমনলিনী-কমলা প্রভৃতিকে নিয়ে মন্থর ঘটনাবিন্যাস পাঠককে তৃপ্ত করে না। লেখক এ বিষয়ে অনেকটাই সচেতন; তাই তিনি সচেষ্ট হন অন্তর্লীন মন্থরতা সত্ত্বেও ঘটনাকে বাইরের দিক থেকে অনাবশ্যক জটিল করে নাটকীয় ফ্রেমে বেঁধে তোলার। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় না — মনস্তাত্ত্বিক সঙ্গতি এবং এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার কার্যকারণগত সংযোগের অনিবার্যতার আত্যন্তিক অভাবের ফলে।

উল্লেখপঞ্জী

(১) রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (১ম সং), ড. নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ৪১৫।

(২) নৌকাডুবির সূচনা, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৫ম খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস সংগ্রহ, বিশ্বভারতী, প্রকাশ-অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭।

(৩) বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, পৃ. ১৬৩।

(৪) 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ', সমাজ।

(৫) 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ', সমাজ।

(৬) 'সূচনা', 'নৌকাডুবি'।

(৭) ২৭ পরিচ্ছেদ, ঐ।

(৮) রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

(৯) ১৪ পরিচ্ছেদ, 'নৌকাডুবি'।

(১০) রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, ড. নীহাররঞ্জন রায়।

(১১) ২৯ পরিচ্ছেদ, 'নৌকাডুবি'।

(১২) তদেব।

১৩) দ্র. রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা,২য় খণ্ড।

গোরা

পূর্বাভাস

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের সদ্যনির্বাপিত চিতাধূম থেকে যে বহ্নিকণার বিস্তার, 'গোরা'-র বিনয়-গোরা-আনন্দময়ী-সুচরিতার কাহিনি সেই প্রাণবহ্নির বিচিত্র বর্ণগৌরবের অভিব্যক্তি। ১৯০৭ থেকে ১৯০৯ সালের মধ্যে ৩২টি কিস্তিতে 'গোরা'-র প্রবাসীতে প্রকাশ। কন্যাদায়ের অর্থসংগ্রহে গ্রন্থের সূচনা এবং পুত্রবিয়োগের পরেও নিয়মিত রচনা। স্পষ্টতই বোঝা যায়,বাইরের তাগিদ গৌণ,অন্তরের তাড়না অত্যন্ত প্রবল। উপন্যাসটি লেখার আগের কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা : (১) ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা — কার্জন রোয়েদাদ ;(২) কার্লাইল সার্কুলার — ছাত্রদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ;(৩) যার প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে চিন্তাভাবনা ;(৪) রাখি-বন্ধন প্রস্তাব — হিন্দু মুসলিম ঐক্য নিয়ে ভাবনা ;(৫) শিবাজী উৎসব — জাতীয়তা হিন্দু জাতীয়তা একাত্ম ; (৬) রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বিশেষ রচনা — 'ব্যাধি ও প্রতিকার', 'মা ভৈঃ', 'অত্যুক্তি, 'ব্রাহ্মণ', 'চীনাম্যানের চিঠি', 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'রাষ্ট্রনীতি', 'ধর্মনীতি', 'সফলতার সদুপায়', 'সমস্যা', 'স্বদেশী সমাজ', 'ততঃ কিম' প্রভৃতি ; (৭) নৈবেদ্য কাব্যে অতীত ভারতে মনভ্রমণ এবং বিশ্বাস 'সেই একপথ আছে নাহি অন্য পথ' ইত্যাদি। 'ধর্মপ্রচার' বক্তৃতাটির মধ্যে আছে যে, মানুষ যখন সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম সাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলে গ্রহণ করে তখন ধর্মসাধনা খণ্ডিত ও বাধাপ্রাপ্ত হয়।ধর্ম কোন বিশেষ কালের মধ্যে, স্থানের মধ্যে, বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে, শাস্ত্র ও আপ্তবাক্যের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই। এইসব প্রবন্ধ, আলোচনা ও বক্তৃতারাজির মধ্যে এমন সব যুক্তি, ভাবোদ্দীপনা, চিন্তাপর্যায়, এমন কি বাক্যভঙ্গি ও বক্তব্যাংশ আছে যা 'গোরা' উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের চরিত্রে, ব্যবহারে, কথাবার্তায়, তর্কবিতর্কে একেবারে রূপ ধরে ফুটে উঠেছে।

সময় বিন্যাস : 'গোরা'-র কাহিনি বিংশ শতকের প্রথম দশক নয়, উনবিংশ শতকের আটের দশক। লেখক নিজের কাল থেকে বছর তিরিশ পিছিয়ে ঘটনার পটভূমি তৈরি করেছেন।গোরার জন্ম, সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে। গোরা এম.এ. পাশ করার পরে এ গল্পের শুরু। গোরার বয়স বাইশ বা তার বেশি। সময়টা ১৮৭৯/৮০। আরোও পরে নয় এই কারণে যে, বিনয় কেশব সেনের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল। অবশ্য উপন্যাসটিতে এমন কিছু পরোক্ষ প্রমাণ আছে যাতে সময় নিয়ে একটু গোলমাল বেধে যায়। যেমন নীলচাষ হাঙ্গামার যে বিবরণ আছে তা ১৮৬৮-তে মৃদু হয়ে যাবার সম্ভাবনা। নীলচুক্তি আইনের অনেকগুলি প্রজাপীড়নমূলক ধারা ঐ বছর রদ হয়। দ্বিতীয়ত, সিভিল ম্যারেজ আইন পাশ হয়েছে অল্প আগে, তা নিয়ে গোরা বিনয়ের আলোচনার কথা উপন্যাসে আছে। ঐই আইন পাশ হয় ১৮৭২ সালে। তৃতীয়ত, উপন্যাসে উল্লেখ আছে, তখন দু-একজন মাত্র বাঙালি সিভিল সার্ভিস হয়ে এসেছে। তাহলে কাহিনিটির সময় ৭১/৭২-এ সরে যায়। কিন্তু কিছুতেই ঘটনাকাল ৭৯/৮০-র আগে হতে পারে না। আবার গোরার বয়স ২২/২৩ না হলে এ গল্প দাঁড়ায় না। নীলচাষ পীড়ন তখনও চলা অসম্ভব নয়, কিন্তু অন্য উল্লেখ দুটি লেখকের অনবধান বশতঃ ঘটেছে।

কিছু সমালোচক উপন্যাসটির কালসীমা অর্থাৎ Fictional time- কে তিন মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। তাদের এ সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, 'গোরা'-র ঘটনাধারার সময়কাল প্রায় ছ'মাস। প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমেই পাই, 'শ্রাবণমাসের সকালবেলায়', সুতরাং কাহিনি আরম্ভ শ্রাবণে, ১৫ পরিচ্ছেদে ভাদ্র মাসে গোরা-বিনয় ছাদে আলাপে মগ্ন , ৩৬ পরিচ্ছেদে 'অগ্রহায়ণের ঘনায়মান নিভৃত সন্ধ্যা' বিনয়-আনন্দময়ীর কথোপকথন, ৫৩ পরিচ্ছেদে গোরা শীত-মধ্যাহ্নের আকাশের দিকে বাইরে চেয়ে দেখল। সময়টা যদি অঘ্রাণ-পৌষ ধরা হয় তবে প্রায় ছ'মাস। সময় নির্ধারণে আরো এক উদাহরণ, গোরার বৈমাত্রেয় ভাই মহিমের কন্যা.........'বয়স প্রায় দশের কাছাকাছি' বলেছে তার পিতা মহিম (১৬ পরিচ্ছেদ) এবং ৬১ পরিচ্ছেদে কাহিনির শেষ দিকে সেই মহিমই

তখন মেয়ের কোন ব্যবস্থা করতে না পেরে বলেছে, "ঐ এগারো বছরের মেয়েটাকে.........",
সুতরাং 'গোরা' আখ্যানের কাহিনি কাল ছ'মাসের কম নয়।

চরিত্র

গোরা

গোরা চরিত্রে যেন সমগ্র জীবনের বিপুল প্রতিবিম্ব পড়েছে — যেন বৃহৎ নদীর মতো চলমান এক জীবনপ্রবাহের উপর বিরাট আকাশের প্রতিফলন ঘটেছে। প্রসঙ্গত বলা চলে যে, চরিত্রটির যে স্বতঃস্ফূর্ত 'হয়ে ওঠা' (becoming), যার সঙ্গে তুলনা চলে জলস্রোতের সহজ বহমানতার, গোরার ব্যক্তিসত্তার সেই 'হয়ে ওঠা'-কে রূপায়িত করতেও রবীন্দ্রনাথ বার বার তার জীবন ও চরিত্রের অনুষঙ্গে নানাভাবে নদী, সমুদ্র ও তৎসংশ্লিষ্ট রূপকল্পের প্রতিমান ব্যবহার করেছেন।

৪র্থ পরিচ্ছেদ : বিনয় যখন গোরাকে জিজ্ঞাসা করল ভারতবর্ষ সে কেমন করে মনে রাখে তখন — ''গোরা লেখা ছাড়িয়া কিছুক্ষণ তাহার তীক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল ; তাহার পরে কলমটা রাখিয়া চৌকির পিঠের দিকে ঠেস দিয়া কহিল, 'জাহাজের কাপ্তেন যখন সমুদ্রে পাড়ি দেয় তখন যেমন আহারে বিহারে কাজে বিশ্রামে সমুদ্রপারের বন্দরটিকে সে মনের মধ্যে রেখে দেয় আমার ভারতবর্ষকে আমি তেমনি করে মনে রেখেছি।'

সমগ্র উপন্যাসটি পর্যলোচনা করলে গোরার হৃদয়বৃত্তির তিনটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি আনন্দময়ীর সঙ্গে তার সম্পর্ক, সেখানে মাতৃভক্তির উজ্জ্বল প্রকাশ ; আরেক দিকে বিনয়ের প্রতি তার প্রগাঢ় প্রীতি ; কিন্তু সর্বোপরি সুচরিতার সঙ্গে তার আত্মার সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কে সূত্র ধরেই গোরা নিজের কাছে নিজে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মূর্তিমান বিদ্রোহের রূপ নিয়ে গোরা সুচরিতার সান্নিধ্যে এসেছে। এই পরিচয়েই তার অবচেতন মনে প্রথম প্রেমের অঙ্কুর দেখা দিল। তাই বিনয় যখন পরিপূর্ণ আবেগ নিয়ে তার মনের কথার রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করল, তখন গোরাও যেন তার প্রভাব সহসা অস্বীকার করতে পারল না। এইখানে রবীন্দ্রনাথ প্রথম গোরার মনোবিশ্লেষণ করলেন।

''মানবহৃদয়ের এমন একটা সত্য পদার্থ, এমন একটা প্রবল প্রকাশ এমন করিয়া গোরার সামনে আসিয়া পড়ে নাই। এই সমস্ত ব্যাপারকে সে এতদিন কবিত্বের আবর্জনা বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে — আজ সে ইহাকে এত কাছে দেখিল যে ইহাকে আর অস্বীকার করিতে পারিল না। শুধু তাহাই নয়, ইহার বেগ তাহার মনকে ঠেলা দিল, ইহার পুলক তাহার সমস্ত শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের মতো খেলিয়া গেল। তাহার যৌবনের একটা অগোচর অংশের পর্দা মুহূর্তের জন্য হাওয়ায় উড়িয়া গেল এবং সেই এতদিনকার রুদ্ধকক্ষে এই শরৎনিশীথের জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়া একটা মায়া বিস্তার করিয়া দিল।''

''.......গোরা আপনার চতুর্দিকের আকাশের মধ্যে একটা সজীব সত্তা অনুভব করিল — তাহার হৃদয়কে চারিদিক হইতেই একটা হৃদয়ের হিল্লোল আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল, একটা কিসের নিবিড়তা তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিল। এরূপ অপূর্ব উপলব্ধি তাহার জীবনে কোনদিন ঘটে নাই।'' গোরা পরম উৎসাহে তার মতবাদ নিয়ে সুচরিতার সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে। তার অন্তরালে একদিকে আছে সুচরিতাকে স্বমতানুবর্তিনী করার আকাঙ্ক্ষা, তার থেকে বেশি তার অবচেতন মনের বিপুল প্রেমাবেগ। এই প্রেমের আবেগই যুক্তি তর্ককে অতিক্রম করে গোরার হৃদয়ে প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।

উপন্যাসের ২১ পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ গঙ্গাতীরের নির্জন নিস্তব্ধ পটভূমিতে বলিষ্ঠচিত্ত গোরার হৃদয়ের গোপন নিভৃত রূপকে উন্মোচিত করেছেন। গোরার চিত্তে যেমন নারী প্রেমের স্থান ছিলনা,তেমনিই বহিঃপ্রকৃতির আকর্ষণও তার মধ্যে প্রবল ছিলনা। আজ সেই নারী ও প্রকৃতি এক হয়ে গোরার হৃদয়-সমুদ্র মন্থন করতে লাগল। এখানে গোরা গভীর আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন। ''আজ এই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর মনকে যেন অভিভূত করিয়া দিল।....... প্রকৃতি এতকাল ধৈর্য ধরিয়া স্থির হইয়াছিল — আজ গোরার অন্তঃকরণের কোন দ্বারটা খোলা

পাইয়া সে মুহূর্তের মধ্যে এই অসতর্ক দুর্গটিকে আপনার করিয়া লইল। এতদিন নিজের বিদ্যাবুদ্ধি চিন্তা ও কর্ম লইয়া গোরা অত্যন্ত স্বতন্ত্র ছিল — আজ কি হইল !........বারবার সে নিজেকে প্রশ্ন করিতে লাগিল যে, তাহার জীবনে এ কিসের আবির্ভাব এবং ইহার কি প্রয়োজন। যে সংকল্প দ্বারা সে আপনার জীবনকে আগাগোড়া বিধিবদ্ধ করিয়া মনে মনে সাজাইয়া লইয়াছিল তাহার মধ্যে ইহার স্থান কোথায়? ইহা কি তাহার বিরুদ্ধে ? সংগ্রাম করিয়া ইহাকে কি পরাস্ত করিতে হইবে ? এই বলিয়া গোরা মুষ্টি দৃঢ় করিয়া যখনই বদ্ধ করিল অমনি বুদ্ধিতে উজ্জ্বল নম্রতায় কোমল, কোন দুইটি স্নিগ্ধ চক্ষুর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল — কোন অনিন্দ্যসুন্দর হাতখানির আঙুলগুলি স্পর্শ সৌভাগ্যের অনাস্বাদিত অমৃত তাহার ধ্যানের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল ; গোরার সমস্ত শরীরে পুলকের বিদ্যুত চকিত হইয়া উঠিল।একাকী অন্ধকারের মধ্যে এই প্রগাঢ় অনুভূতি তাহার সমস্ত প্রশ্নকে, সমস্ত দ্বিধাকে একেবারে নিরস্ত করিয়াদিল। সে তাহার এই নূতন অনুভূতিকে সমস্ত দেহমন দিয়া উপভোগ করিতে লাগিল — ইহাকে ছাড়িয়া সে উঠিতে ইচ্ছা করিল না।''বিহারীর সুপ্ত পৌরুষকে জাগ্রত করেছিল বিনোদিনী, আর গোরার আত্মার উদ্বোধন ঘটেছিল সুচরিতার স্পর্শে। প্রেমের অনাস্বাদিত অনুভূতি যখন গোরার দেহমনকে আচ্ছন্ন করেছে, তখনও তার মধ্যে ধিক্কারের মধ্যে দিয়ে তাকে দূর করার প্রয়াস দেখা গেছে। গোরার মনে প্রেমের এই উপলব্ধিকে রবীন্দ্রনাথ অতি সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করেছেন। সে সমাজ নিয়ে, ধর্ম নিয়ে প্রচন্ড তর্ক করেছে, নিজের মতকে সকলের উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। কিন্তু যে নতুন প্রানের আহ্বান তার চিত্তকে ক্রম-উদ্বেলিত করে তুলেছিল, তাকে নিয়ে সে কোনদিন সোচ্চার হতে পারে নি।তার মনের গভীর সংশয় বাইরে ব্যক্ত হয় নি। এখানেই বিনয়ের সঙ্গে গোরার পার্থক্য। বিনয় তার হৃদয়ের অনুভূতিকে গোরার কাছে ব্যক্ত করতে কোন সঙ্কোচ করে নি। কারণ বিনয় জানত যে জীবনে প্রেমের আবির্ভাব অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সে প্রথম থেকেই জীবনের সহজ গতিকে অনুসরণ করেছে। অপরপক্ষে গোরা, তার জীবনে প্রেমের উন্মেষকে একটা আকস্মিকতারূপে গ্রহণ করেছে। এক সময়ে নিজের জীবনে সে নারীর আবির্ভাব কল্পনা করতে পারে নি। কিন্তু যখন তা বাস্তবে পরিণত হল, তখন সে তার হৃদয় উজাড় করে সেই প্রেমের বার্তা কোথাও জানাতে পারল না। গোরার দোলাচলচিত্তে সুচরিতার প্রতি তার গভীর নিভৃত প্রণয় অতি সংগোপনে ক্রমবর্ধিত হতে লাগল।কিন্তু সেই সঙ্গে গোরার মনের তীব্র আলোড়ন তার অশান্ত হৃদয়কে আরও বিক্ষুব্ধ করে তুলল। সুচরিতার কাছ থেকে সবলে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গোরা ভ্রমণে উদ্যোগী হল। এই যাত্রায় নানারকম বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত গোরাকে কারাবরণ করতে হয়েছে। কিন্তু সুচরিতার স্মৃতি তার হৃদয়ে অম্লান ছিল। এখানেও রবীন্দ্রনাথ একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে গোরার মনকে ব্যাখ্যা করেছেন। গোরা তার প্রেমের আবির্ভাবকে একপ্রকার জোর করে অস্বীকার করেই ভ্রমণে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সুচরিতার নম্র সুন্দর মুখশ্রী বিস্মৃত হতে পারে নি। সেখানে গোরা নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়েছে এই ভেবে - "কল্পনামূর্তিকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই।........ভয় করিবার বিষয় কেবল মাত্র বাস্তব পদার্থ।" কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে এসে পরেশবাবুকে দেখে গোরা যেরকম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, তার দ্বারা সে নিজেই অনুভব করল যে, পরেশবাবুকে গোরা আকর্ষণ করার অন্তরালে রয়েছে সুচরিতার প্রচ্ছন্ন স্পর্শ। সুতরাং সুচরিতার কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেও গোরার জীবনে তার আকর্ষণ যে কত প্রবল এখন সে অনুভূতি তার কাছে সূর্যালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল। গোরা যে সকলের মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র, এ নিয়ে তার নিজের মনে কোন আক্ষেপ ছিল না। কিন্তু যেদিন দেখেছে বিনয় অতি সহজে সুচরিতার পরিবারে নিজের স্থান করে নিয়েছে, আর সেই স্থানে গোরা বহিরাগতরূপে পরিগণিত হয়েছে তখনই তার নিজের প্রকৃতির অভাব সম্বন্ধে তার খেদ জেগেছে। রবীন্দ্রনাথ মানবমনের এই সূক্ষ্মদিকগুলি অতি নিপুণভাবে গোরার চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। এইভাবেই গোরার ব্যক্তিত্ব, তার স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবন সুচরিতার স্পর্শে প্রদীপ্ত সূর্যের মত উজ্জ্বল ও বর্ণময় হয়ে উঠেছে।

আত্মপ্রকাশের এই আনন্দের মধ্যেও গোরা পূর্ণতার সন্ধান পায় নি। এখানেও রবীন্দ্রনাথ গোরার মনোবিশ্লেষণ করে তার সেই অভাবের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়েছেন। ললিতাকে বিবাহ করা নিয়ে বিনয় ও গোরার মধ্যে যেদিন সামাজিক বিচ্ছেদ ঘটল, সেদিন "সমুদ্রগামিনী দুই নদী একসঙ্গে মিলিলে যেমন হয়, তেমনি বিনয়ের প্রেমের ধারা আজ গোরার প্রেমের উপরে আসিয়া পড়িয়া তরঙ্গের দ্বারা তরঙ্গকে মুখরিত করিতে লাগিল। গোরা যাহাকে কোন প্রকারে বাধা দিয়া, আড়াল দিয়া, ক্ষীণ করিয়া নিজের অগোচরে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাই আজ কুল ছাপাইয়া আপনাকে সুস্পষ্ট ও প্রবল মূর্তিতে ব্যক্ত করিয়া দিল।" প্রেমের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই গোরা তার জীবনের পূর্ণতার সন্ধান পেয়েছে। তাই গোরা বলেছে "যে আমারই তাহাকে আমি লইব। নহিলে পৃথিবীতে আমি অসম্পূর্ণ, আমি ব্যর্থ হইয়া যাইব।" সেই আবেগ নিয়ে উপস্থিত গোরা যখন সুচরিতার গৃহের রুদ্ধ দেখল, তখন সে আরেকবার আত্মসংযমের চেষ্টা করল। প্রেমের সেই বিপুল উন্মাদনাকে প্রতিহত করে, সে নিজেকে দেশের সেবায় বিলীন করে দেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করল। কিন্তু কোন প্রতিজ্ঞাই সুচরিতাকে অতিক্রম করে উঠতে পারল না। তাই গোরার তপস্বী হওয়ার আগে হরিমোহিনী যখন তাকে অনুরোধ করলেন সুচরিতাকে কৈলাশের সঙ্গে বিবাহে রাজী করাতে, তখন একদিকে গোরার মন উন্মুখ হয়ে উঠল সুচরিতাকে দেখবার জন্য, আরেকদিকে প্রবলভাবে বিদ্রোহ করে উঠল এই ভেবে, "আর কাহারও সঙ্গে সুচরিতার মিলন হওয়া অসম্ভব ; বুদ্ধি ও ভাবের গভীরতায় পরিপূর্ণ সুচরিতার নিস্তব্ধগভীর হৃদয়টি পৃথিবীতে গোরা ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষের সামনে এমন করিয়া প্রকাশিত হইতে পারে না।" এরপরে আবার গোরার মনে সংশয় জেগেছে। গোরা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনের ব্রত গ্রহণে সংকল্প করেছে। কিন্তু যে জীবন সে কল্পনা করেছে, সেই জীবনকে সে মনের দিক থেকে কতখানি গ্রহণ করতে পারবে, তাই নিয়ে গোরার মনের দ্বিধাকে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। সে স্পষ্টই অনুভব করতে পারছে যে সুচরিতা তার হৃদয়ের কতখানি অংশ নিয়ে বিরাজ করছে। তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার মতো কোন শক্তি গোরার নেই। তার হৃদয় নানাপ্রশ্নে, নানাদ্বিধায়, ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু সংশয় নিরসনের কোন পথ সে খুঁজে পায় নি। সুচরিতার সঙ্গে বাঁধনকে কাটিয়ে ফেলার জন্য সে নির্মম হাতে তাকে বিবাহ করার জন্য উপদেশ দিল, কিন্তু "তাহার হৃদয় যে সে দলিলকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিল।" অবশেষে সকল সংশয়ের অবসান ঘটাল গোরার জন্মবৃত্তান্ত। প্রবল ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে আবৃত গোরা বিপুল বিস্ময়ে জানাল সে মিউটিনী সময়কার এক আইরিশ ম্যানের ছেলে ; তার মা তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। গোরা তার বিমূঢ় অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার যেন এক মুক্তির স্বাদ অনুভব করল। যে সংস্কারের দ্বারা সে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল, সেই সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে, আজ সুচরিতার সঙ্গে মিলনে আর কোন বাধা রইল না। গোরার মনের যে শূন্যতাকে প্রথম প্রত্যক্ষ করেছিল সুচরিতা, গোরার নবলব্ধ অনুভূতিতে সেই শূন্যতা পূর্ণ হয়ে উঠল সুচরিতার সঙ্গে মিলনে। তীক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে প্রেমের মিলনে গোরা চরিত্র রবীন্দ্র-উপন্যাসে এক অসাধারণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুচরিতার সঙ্গে গোরার হৃদয়-বন্ধনের মধ্য দিয়ে এক বৃহৎ মিলনের সঙ্কেত রবীন্দ্রনাথ রেখে গেছেন এই উপন্যাসে এবং তারই মধ্য দিয়ে মানবমনের চিরন্তন কবিত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

সংযোজন : মতবাদের, যুক্তিতর্কের সংঘর্ষের ভিতর দিয়েই গোরার অন্তরে প্রেমের রক্তকমল ফুটেছে ; তর্ক-মন্থনের ফলেই গোরার হৃদয়-সমুদ্রও মন্থিত হয়েছে। গোরা পরম উৎসাহে প্রবল আগ্রহে সুচরিতার সঙ্গে তার মতবাদ নিয়ে তর্ক করেছে ; তা সুচরিতাকে তার মতানুবর্তিনী করবার জন্য তো বটেই, কিন্তু সেই উৎসাহ ও আগ্রহের পশ্চাতে আছে তার অবচেতন চিত্তের বিপুল প্রেমাবেগ। এই প্রমাবেগই গোরার যুক্তিতর্ককে প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত কম্পিত করেছে। যুদ্ধ সজ্জার বহিরাবরণ, যুক্তিতর্কের বর্ম ভেদ করে এক অসতর্ক মুহূর্তে নির্জন গঙ্গাতীরে একদিন যে-প্রেম বিদ্যুৎ চমকের মত দেখা দিয়েছিল, সেই একটি মুহূর্তেই শুধু গোরার সুগভীর

ব্যক্তিজীবনের একমাত্র পরিচয় নয়, প্রতিদিনের তর্কবিতর্কের মধ্যেও অবচেতন চিত্তের এই প্রেম প্রচ্ছন্ন।

সুচরিতা

নারীর যে স্নিগ্ধ কমনীয় রূপসৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য, তার প্রথম আভাস 'নৌকাডুবি'-র হেমনলিনীর মধ্যে এবং তারই পূর্ণতম প্রকাশ সুচরিতায়। পরেশবাবুর সান্নিধ্য, তাঁর গভীর স্নেহ সুচরিতার মধ্যে এমন একটি প্রশান্ত দীপ্তি নিয়ে এসেছিল, যার প্রভাব সমগ্র উপন্যাসে অনুভূত হয়। সে স্নিগ্ধতা ও নম্রতায় সদা আনত, তার নিজের সম্বন্ধে রয়েছে একটা পরম ঔদাসীন্য। গোরার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে, তার জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করেছে। তখন থেকেই সুচরিতার মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি ও আত্মানুসন্ধানের সূচনা। সেই প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথ সুচরিতার মার্জিত, কোমল মনটি তাঁর উপন্যাসের পাঠকের কাছে অনাবৃত করেছেন।

প্রথম পরিচয়ে গোরার ঔদ্ধত্য সুচরিতার মনে বেদনার সৃষ্টি করেছে। কারণ সকল তর্কবিতর্কের ঊর্ধ্বে হৃদয়ের যে পূর্ণতা, তার প্রতিই সে আস্থাশীল ছিল। সুচরিতা অনুভব করেছিল যে গোরার সমস্ত চিন্তার মধ্যে কোথাও একটা অভাববোধ আছে। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ সুচরিতার সঙ্গে সংযোগের মধ্যে দিয়ে গোরাকে পূর্ণতার পথে নিয়ে গেছেন। তার হৃদয়ের তন্ত্রীতে যে বেদনা ধ্বনিত হয়েছে, সেই বেদনা অনেক সংশয়, অনেক দ্বিধার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে চরিত্রকে একটি কমনীয় মাধুর্যে পরিপূর্ণ করেছে। হারাণবাবু ও গোরার তর্কযুদ্ধে প্রথম সুচরিতা অনুভব করল যে গোরা তার কাছে একটি বিশেষ মানুষ। উপন্যাসের এই অংশে রবীন্দ্রনাথ সুচরিতার আত্মবিস্মৃত চিত্তের একটি সুন্দর আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। সুচরিতা অনিমেষনেত্রে গোরাকে দেখেছে, তার মুখের প্রত্যেকটি ভাবলীলার মধ্যে আত্মমর্যাদার প্রবল প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছে। "আজ সুচরিতা তাহার মুখের দিকে একমনে চাহিতে চাহিতে সমস্ত দল, সমস্ত মত, সমস্ত উদ্দেশ্য হইতে পৃথক করিয়া গোরাকে কেবল গোরা বলিয়াই যেন দেখিতে লাগিল। চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতে থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া, তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ কী, মানুষের আত্মা কী , সুচরিতা এই তাহা প্রথম দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব অনুভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল।" এরপরে গোরা যখন সুচরিতার মতই তীব্র দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত তখন সে নিরুদ্দেশ ভ্রমণের পথে যাত্রা করেছে। কিন্তু সুচরিতা একে উপেক্ষা বলেই মনে করেছে। তবুও সে গোরাকে কোনমতেই মন থেকে সরাতে পারছে না। সুচরিতার মনের এই দ্বিমুখী দ্বন্দ্বকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছেন। গোরার বিশ্বাস, গোরার স্বদেশপ্রেমের মধ্যে সুচরিতা এমন একটা মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছে, যার দ্বারা তার মনে হয়েছে — "সে মানুষ সামান্য মানুষ নহে। তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে যে হাত ওঠে না। অত্যন্ত একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া, সুচরিতার কান্না আসিতে লাগিল। কেহ যে তাহাকে এতো বড়ো একটা দ্বিধার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ উদাসীনের মতো অনায়াসে দূরে চলিয়া যাইতে পারে এই কথা মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে চাহিল অথচ কষ্ট পাইতেছে বলিয়াও ধিক্কারের সীমা রহিল না।" এই দ্বিধার মধ্য দিয়েই সুচরিতার জীবন ক্রমশঃ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে।

গোরা ভারতবর্ষের মহিমাকে প্রদীপ জ্বেলে বরণ করার জন্যে সুচরিতাকে আহ্বান জানিয়েছে — "তোমাকে নহিলে চলিবে না, তোমাকে লইবার জন্য আসিয়াছি, তুমি নির্বাসিত হইয়া থাকিলে যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইবে না।" সেই প্রথম সুচরিতা বিগলিত অশ্রুধারার মধ্য দিয়ে তার হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনাকে বন্ধনহীন করেছে। দুটি হৃদয় প্রথম পরস্পরের সম্মুখে একাত্মতা অনুভব করল। কিন্তু এই অনুভূতিও তার হৃদয়ের মতই নীরব ও স্তব্ধ। এই প্রেমের মধ্যে দিয়েই, সুচরিতা গোরার বাইরের আবরণ ভেদ করে তার অন্তরের জ্যোতির্ময় রূপকে ফুটিয়ে তুলেছে, আর সেই আলোকে নিজেও হয়ে উঠেছে দীপ্তিময়ী।

প্রকৃতির রূপ-ভাষ্য (পরিবেশ)

'গোরা'-র পরিবেশের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিক হল — নিসর্গপট ও মানব প্রকৃতির গূঢ় সংশ্লেষ। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ বলেছেন[১], — রবীন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যে 'গোরা'-য় তারই প্রথম সার্থক সুষ্ঠু প্রকাশ দেখতে পেলাম (যদিও আগেই বলেছি এর কিছুটা আভাস চোখে পড়ে 'বউঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষী'-তে)। এর সবচেয়ে পরিস্ফুট প্রকাশ ঘটেছে উপন্যাস-ধৃত নরনারীর হৃদয়ে প্রেমের প্রথম আবির্ভাব-মুহূর্তকে আশ্রয় করে। ১৩০৮ সালের ভাদ্রে রবীন্দ্রনাথ যে কথা লিখেছেন — ''নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে, তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জলস্থল আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন''।[২] যে সত্য তাঁর 'গোরা' পূর্ববর্তী বহু রোম্যান্টিক প্রেম-কবিতায় শিল্পিত অবয়ব লাভ করেছে, —তা-ই 'গোরা' উপন্যাসে গোরা-সুচরিতা ও বিনয়-ললিতার অন্তর্গূঢ় প্রণয়-চেতনা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে।

১১ সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখি, বর্ষণ ব্যাকুল শ্রাবণরাত্রি যেন সুচরিতার মনে প্রেমের প্রথম অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম। — ''রাত্রি যখন দুইটা সুচরিতা জাগিয়া দেখিল, বাহিরে ঝম ঝম করিয়া বৃষ্টি হইতেছে ; মাঝে মাঝে তাহাদের মশারির আবরণ ভেদ করিয়া বিদ্যুতের আলো চমকিয়া উঠিতেছে ; ঘরের কোণে যে প্রদীপ ছিল সেটা নিবিয়া গেছে। সেই রাত্রির নিস্তব্ধতায় অন্ধকারে, অবিশ্রাম বৃষ্টির শব্দে, সুচরিতার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধ হইতে লাগিল।''

এই একাত্মতা স্ফুটতর হয়েছে ২১ সংখ্যক পরিচ্ছদে গোরার গূঢ় প্রণয়-বাসনার অনুষঙ্গে — ''আজ কিন্তু নদীর উপরকার ঐ আকাশ আপনার নক্ষত্রালোকে অভিষিক্ত অন্ধকার দ্বারা গোরার হৃদয়কে বারংবার নিঃশব্দে স্পর্শ করিতে লাগিল। নদী নিস্তরঙ্গ। কলিকাতার তীরের ঘাটে কতকগুলি নৌকায় আলো জ্বলিতেছে আর কতকগুলি দীপহীন নিঃস্তব্ধ। ওপারের নিবিড় গাছগুলির মধ্যে কালিমা ঘনীভূত। তাহারই ঊর্ধ্বে বৃহস্পতিগ্রহ অন্ধকারের অন্তর্যামীর মতো তিমিরভেদী অনিমেষদৃষ্টিতে স্থির হইয়া আছে।

আজ এই বৃহৎ নিস্তব্ধ প্রকৃতি গোরার শরীর-মনকে যেন অভীভূত করিয়া দিল। গোরার হৃৎপিণ্ডের সমান তালে আকাশের বিরাট অন্ধকার স্পন্দিত হইতে লাগিল।''

সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে গঙ্গার ধারে বেড়ানোর সময় নদী-প্রকৃতি, নদীতীর, মাথার ওপরকার বিশাল অন্ধকার আকাশের সৌন্দর্য গোরার শরীর-মনের সঙ্গে একসূত্রে যেন গাঁথা হইয়া গেছে। Amiel কথিত 'A landscape is a state of mind'উক্তিটি এখানে যেন গভীর তাৎপর্যে অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

৩০ সংখ্যক পরিচ্ছেদে বর্ণিত স্টীমার যাত্রাকালে বিনয়-ললিতার প্রেমের প্রথম জাগরণের মুহূর্ত গুলিতেও প্রকৃতি ও মানবস্বভাবের তরঙ্গ সংযোগের ছবিটি পরিস্ফুট।

গোরা-সুচরিতা-বিনয়ের প্রেমানুভূতির সঙ্গে প্রকৃতির এই অন্তরঙ্গ যোগের চিত্রপটগুলি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে হার্ডির আঁকা ছবির মতো অতো গাঢ় বর্ণ হয়তো নয়। তবু এ ধরনের ছবি দেখে সহজেই মনে আসতে পারে হেনরী জেমসের 'গোল্ডেন বোল' উপন্যাসে প্রেমিক অ্যাডাম ভার্ভার — এর চেতনায় উদ্‌ঘাটিত জ্যোৎস্নালোকিত শরৎরাত্রির কথা, যখন সমগ্র নৈশ পরিবেশ — ''all met him ....as a vast experience of 'discovery',a world that looked, so lighted , extraordinarily new ....''[৩]

'গোরা'-র মত সমাজ-রাষ্ট্রের পটে মানবিক সমস্যামূলক ও মননশীল চিন্তা-বিতর্কপূর্ণ উপন্যাসে নিসর্গ-চিত্র তথা চিত্রল পরিবেশে বর্ণনা হয়ত খুব বেশি প্রত্যাশিত নয়। তবু এরই মধ্যে নিসর্গাশ্রিত পরিবেশ-বিন্যাসের যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ, তা তাঁর কবি-মনের পরিচায়ক।

অলংকার ও চিত্রকল্প সৃজন

'গোরা' উপন্যাসে প্রযুক্ত বিভিন্ন উপমা-উৎপ্রেক্ষা তথা বাক্‌প্রতিমা বা চিত্রকল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কবি-দৃষ্টির পরিচয় মেলে, উপমা-উৎপ্রেক্ষাদির বহুল প্রয়োগ বিভিন্ন উপন্যাসেই চোখে পড়ে। কিন্তু উপন্যাসে এক বিশেষ মাত্রা যোজনা করে, যখন এই অলঙ্কারগুলি বিশদ চিত্রকল্পের রূপ নেয়। অবশ্য কোন কবিতায় একটি চিত্রকল্পের একবার মাত্র প্রয়োগেই যে অবিস্মরণীয় সৌন্দর্যের সৃষ্টি হতে পারে, উপন্যাসে তা প্রত্যাশিত নয়। সেখানে সাধারণত একই চিত্রকল্পের অনুপুঙ্খ বিন্যাস কিংবা পুনরাবৃত্তির সাহায্যেই কেবল সে নান্দনিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

উপন্যাসে ভাষার সহায়তায় লেখক যেমন একদিকে পাঠকের মনে সঞ্চার করতে চান জীবনের বাস্তবতার সংবেদন, অন্যদিকে পাত্র-পাত্রীর মনের সুগভীর ভাবসম্পদকে, তার মনের গূঢ় স্বপ্ন-কল্পনা-অনুভবকে ভাষার মাধ্যমেই ব্যক্ত করেন ঔপন্যাসিক। আর চরিত্রের এই গূঢ় সঞ্চারী ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রেই ভাষার সাহায্যে চিত্রকল্প রচনা করতে হয় তাঁকে। বলাবাহুল্য, সেই চিত্রকল্প বাইরের পটপরিবেশ রচনা করে না, তা আশ্রয় করে পাত্রপাত্রীর মনোজীবনকে, চিত্রকল্পের নিহিত ব্যঞ্জনা উপন্যাসের চরিত্রের মানস অনুষঙ্গ হিসেবে বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে। বস্তুত এই সূক্ষ্ম শিল্পক্রিয়া যিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন, তিনি নিছক বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক নন, তিনি নিঃসংশয়ে 'কবি'ও। 'গোরা' উপন্যাসে এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। উপন্যাসটির প্রায় গোড়া থেকেই এক ধরনের উপমাধর্মী চিত্রকল্প বারে বারেই দেখা দিয়েছে। সেই চিত্রকল্প সমুদ্র কিংবা নদী, জাহাজ ও বন্দর সংক্রান্ত। চতুর্থ পরিচ্ছেদের একই পৃষ্ঠায় এর প্রয়োগ ঘটেছে অন্তত চারবার। কয়েকটি দৃষ্টান্ত —

(ক)আমি পথভুলতে পারি, ডুবে মরতে পারি, কিন্তু আমার সেই লক্ষ্মীর বন্দরটি আছে।

(খ)সব টান মেরে ফেলে দিয়ে সেই বন্দরের দিকেই জাহাজ ভাসাতে হবে — ডুবি তো ডুবব, মরি তো মরব।

উপন্যাসের মধ্যে প্রবেশ করলে এই চিত্রকল্পেরই কিছুটা রূপান্তরিত ভিন্নধর্মী রূপের সাক্ষাৎ পাই। সেখানে নদী, নদীস্রোত, নৌকা বা ঢেউ-এর ইমেজ প্রায়শই চোখে পড়ে। কিন্তু সব মিলিয়ে সেই একই তরঙ্গক্ষুব্ধ নদী বা সমুদ্রপথে অভিযানের চিত্রকল্পের পুনরাবর্তন। বলাবাহুল্য এর কোনটিই কবি রবীন্দ্রনাথের নিছক আড়ম্বর-সৃজনী অলঙ্কৃত ভাষার রূপের পরিচায়ক নয়, এ তাঁর কবিজনোচিত ব্যঞ্জনাসৃষ্টির আশ্চর্য অর্থবহ নিদর্শন — যা অপরিহার্য, উপন্যাসের নায়কের মানস উত্তরণের মহৎ আকাঙ্ক্ষাকে ও সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের দুর্গম পথের কঠিন বাধা ও তজ্জনিত যন্ত্রণাকে বাণীরূপ দেওয়ার জন্য। বলা নিষ্প্রয়োজন, বিশেষত সমুদ্র-বন্দর-জাহাজের 'এপিক'-ধর্মী চিত্রকল্পে বাণীবদ্ধ সমুদ্রাভিযানের ব্যঞ্জনা, 'গোরা' উপন্যাসে অনেক পরিমাণে মহাকাব্য-ধর্মের মহিমা এনে দিয়েছে।

(১) '..........বিনয় তাহাদের মধ্যে কেবল এক জনের তরুণ মুখ রাস্তার গ্যাসের আলোকে ক্ষণকালের জন্য দেখিল — তাহার পরে গাড়ির চাকার শব্দ হইল এবং এই দৃশ্যটুকু অন্ধকারের মহাসমুদ্রের মধ্যে একটি বুদ্‌বুদের মতো মিলাইয়া গেল।'[৪]

(২) '..........জাহাজের কাপ্তেন যখন সমুদ্রে পাড়ি দেয় তখন যেমন আহারে বিহারে কাজে বিশ্রামে সমুদ্রপারের বন্দরটিকে সে মনের মধ্যে রেখে দেয় আমার ভারতবর্ষকে আমি তেমন করে মনে রেখেছি।'[৫]

(৩) 'দুইজনে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বাকিপথ গোরা আর কোন কথা কহিল না। ডেস্কের মধ্যে ঐ ছবিখানি দেখিয়া গোরাকে আবার সহসা স্মরণ করাইয়া দিল যে বিনয়ের চিত্তের একটা প্রধান ধারা এমন একটা পথে চলিয়াছে যে পথের সঙ্গে গোরার জীবনের কোন সম্পর্ক নাই। ক্রমে বন্ধুত্বের আদিগঙ্গা নির্জীব হইয়া ঐ দিকেই মূল ধারাটা বহিতে পারে এ আশঙ্কা অব্যক্তভাবে গোরার হৃদয়ের গভীরতম তলদেশে একটা অনির্দেশ্য ভাবের মতো চাপিয়া

পড়িল। সমস্ত চিন্তায় ও কর্মে এতদিন দুই বন্ধুর মধ্যে কোন বিচ্ছেদ ছিল না — এখন আর তাহা রক্ষা করা কঠিন হইতেছে — বিনয় এক জায়গায় স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতেছে।'[৬]

(৪) 'চাঁদকে সমুদ্র যেমন সমস্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যাবহারের অতীত করিয়া দেখিয়াই অকারণে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতে থাকে, সুচরিতার অন্তঃকরণ আজ তেমনি সমস্ত ভুলিয়া, তাহার সমস্ত বুদ্ধি ও সংস্কার, তাহার সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিয়া যেন চতুর্দিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ কী, মানুষের আত্মা কী, সুচরিতা এই তাহা প্রথম দেখিতে পাইল এবং এই অপূর্ব অনুভূতিতে সে নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেল।'[৭]

ভাষার বন্ধন

''গোরা' ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিন্যাসের দিক থেকে বলিষ্ঠ স্বকীয়তার প্রথম সুনিশ্চিত আত্মপ্রকাশ'।[৮] এখানে বিষয়বস্তু, পটভূমি ও চরিত্র-পরিকল্পনায় যে বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত জীবন বোধের নিদর্শন রাখলেন, বৃহৎ এক সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিসত্তার আত্মজিজ্ঞাসার, আত্ম উন্মোচন প্রয়াসের যে ভাবগম্ভীর কাহিনি এই গ্রন্থে লেখক বিন্যস্ত করলেন, তা অবশ্যই এ তাবৎকাল বাঙালী পাঠকের অগোচর ছিল। নতুন কালের উপযোগী এই ভাবগম্ভীর কাহিনী শোনাবার জন্য প্রয়োজন ছিল অভিনব উদাত্ত স্বরগ্রামযুক্ত এক নতুন কণ্ঠস্বরের। বস্তুত 'গোরা'-য় বাঙালী পাঠক মুগ্ধ, বিস্ময়ে সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে — যা বৃহৎ প্রসারিত ভাবধর্মী-পটপরিবেশে রচিত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ সহগামী। 'গোরা'-য় দেখলাম — বাক্যগুলি বঙ্কিমী ভাষারীতির অনুসরণ করে তেমন সংক্ষিপ্ত নয় — এর কারণ সহজেই অনুমেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মতো কাহিনির গুরুত্ব নেই এখানে, কাহিনিকে কোনভাবেই গতিশীল করতে আগ্রহী নন লেখক। ভাষার সাহায্যেও তাই ঠিক ওই ধরনের গতিশীলতা বা নাট্যলক্ষণ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস এখানে তেমনভাবে চোখে পড়ে না। ভাষা এখানে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বাক্যে বিন্যস্ত হয়ে অনেক সময়েই কিছুটা মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়েছে — সেই ভাষায় অলঙ্কারবাহুল্য না থাকলেও তৎসম শব্দের ব্যবহার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। বলাবাহুল্য, তৎসম শব্দযুক্ত এই ভাষাবিন্যাস 'গোরা'-র মহাকাব্যোচিত আবহ সৃষ্টিতে একান্ত অনুকূল হয়েছে। যথেষ্ট তৎসম শব্দযুক্ত এই ভাষা কিন্তু কোথাও বক্তব্য বিষয়কে অস্পষ্ট বা জটিল করে তোলে নি।

'গোরা'-র ভাষারীতির অন্যতম প্রধান গুণ এর ঋজুতা, স্পষ্টতা ও বলিষ্ঠতা, বলাবাহুল্য, 'গোরা'-র ভাষার এই নিহিত প্রবণতাগুলি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব গোরা চরিত্র ও জীবন ভাবনারও সহজাত প্রবণতা। সেদিক থেকে উপন্যাসটির এই ভাষা পরিকল্পনাই নিঃসন্দেহে অমোঘ ও অপরিহার্য। আর এই ভাষালক্ষণই যে 'এপিক' ধর্মী রচনার অচ্ছেদ্য অঙ্গ, তা সকল সমালোচকই নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। C.M. Bowra এপিক-এর লক্ষণ বিচার প্রসঙ্গে এর রচনারীতির এই 'Simplicity and strength and straight-forwardness' — এর উপর যে শুধু বিশেষ জোর দিয়েছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে আরেকটি অপরিহার্য লক্ষণের কথাও বলেছেন তা হল — 'The unhesitating sweep of its narrative'.[৯] 'গোরা' সম্পর্কে এই শেষোক্ত লক্ষণটিও একান্ত সত্য। বাওরা যে প্রসঙ্গে এই 'narrative' কথাটি এখানে বলেছেন, তা হল বিশেষভাবে ন্যারেটিভ স্টাইল বা রীতি।

'গোরা' উপন্যাসেও রচনারীতির বাইরের মন্থরতার গভীরে একধরনের 'unhesitating sweep'এর সাক্ষাৎ পাই। উপন্যাসটির ভাষায় যদিও তৎসম শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট আছে, যদিও বাক্যগুলি অনেক সময়েই বেশ দীর্ঘ এবং নাট্যধর্মী ঘটনা 'সমৃদ্ধ' না হওয়ার ফলে যদিও এর বাগ্‌বন্ধে আপাত-দ্রুতগতির তেমন পরিচয় মেলে না — তবুও এসব কিছু সত্ত্বেও একথা সত্য যে, 'গোরা'-র নায়ক চরিত্রের মতই এর ভাষারও একধরনের প্রবহমানতা বা গতিশীল 'Dynamism', আছে — যা বিরামহীন এক ধ্বনি তরঙ্গের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে পাঠকচিত্তে : ''ভারতবর্ষের যে কাজ অন্তহীন, যে কাজের ফল বহুদূরে, তাহার জন্য তাহার প্রকৃতি আনন্দের সহিত প্রস্তুত হল — ভারতবর্ষের যে মহিমা সে ধ্যানে দেখিয়াছে তাহাকে তাহাকে নিজের চক্ষে দেখিয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া তাহার কিছুমাত্র ক্ষোভ রহিল না। সে মনে মনে বারবার করিয়া বলিল 'মা আমাকে ডাকিতেছেন — চলিলাম যেখানে অন্নপূর্ণা, যেখানে জগদ্ধাত্রী বসিয়া আছেন সেই সুদূরকালেই অথচ এই নিমিষেই, সেই মৃত্যুর পরপ্রান্তেই অথচ এই জীবনের মধ্যেই, সেই — যে মহামহিমান্বিত ভবিষ্যৎ আজ আমার এই দীনহীন বর্তমানকে সম্পূর্ণ সার্থক করিয়া উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে — আমি চলিলাম সেইখানেই — সেই অতিদূরে সেই অতিনিকটে মা আমাকে ডাকিতেছেন।''[১০]

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এখানে ভাষায় সাবলীল গতিশীলতা সঞ্চারের মূলে আছে উপন্যাসের তথা এর নায়কের অন্তর্নিহিত আবেগপ্রবণতা। এই হৃদয়াবেগ তরল ফেনিল উচ্ছ্বাস মাত্র নয়, এ মননশীল চিত্তের ঘনীভূত আবেগ যা ভাষায় সংহত বেগ-সঞ্চার করেছে, যাকে টিলিয়ার্ড বলেছেন, 'to density language' [১১] এবং যা বস্তুত এপিকের ভাষারীতির একটি মৌল লক্ষণ।

প্লট নির্মিতি

'গোরা' উপন্যাসের নিছক ঘটনাগত আকর্ষণকে অতিক্রম করে গেছে উপন্যাসটির অন্য দুটি উপাদান — (১) এর বৃহত্তর সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রিক পটভূমি, এবং (২) গোরার ব্যক্তিত্ব।'গোরা'-র কাহিনির বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা বিচারে এই দুটি উপাদানের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। 'গোরা'-র কাহিনির ভূমিকা যে মুখ্য নয়, গ্রন্থটি যে অনেক পরিমাণেই পূর্বোক্ত বৃহৎ প্রেক্ষাপটে এক অসামান্য ব্যক্তিসত্তার আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মবিকাশের ইতিবৃত্ত, এতে সংশয়ের অবকাশ নেই। কিন্তু তবু এই উপন্যাসে একটি কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে। সে কাহিনি দীর্ঘ, ধারাবাহিক ও সুবিন্যস্ত এবং নিশ্চিতভাবে আদি-মধ্য-অন্ত যুক্ত।

এই কাহিনিতে অনেক ঘটনা আছে, পরিবেশ আছে, আছে অনেক ব্যক্তি — স্ত্রী ও পুরুষ ; সব মিলিয়ে এ কাহিনি মুলত 'গোরা'-র কাহিনি। বিনয়-ললিতার যে গল্প, সেও আসলে গোরা-র আপন ব্যক্তিসত্ত্বার গূঢ় সত্যকে জানার পথ সন্ধানের গল্প। ওরা দু'জন পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে গোরাকে, ওদের প্রেম, ওদের বিদ্রোহ, আনুকূল্য করেছে গোরার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ স্ফূরণে। সবকিছুই যে এভাবে গোরার জীবনের দ্বন্দ্বময় বিকাশ বিবর্তন ও পরিণামের অভিমুখে সংহত হয়ে এসেছে — এখানেই এই বহুধা-প্রসারিত গল্পের স্বাতন্ত্র্য — এই 'অভিনব' ঐক্যবন্ধনে।

১ পরিচ্ছেদ থেকে ২৫, ২৬-৫২ এবং ৫৩ থেকে শেষ পরিচ্ছেদ (পরিশিষ্ট সহ) পর্যন্ত প্রতিটি অংশের আয়তনের এই প্রায় সমতা ঘটনাবিন্যাসে লেখকের সচেতন সামঞ্জস্যবোধ সূচিত করে। (ক) প্রাক্-চরঘোষপুর পর্ব, (খ) চরঘোষপুরের ঘটনা ও কারাবাস পর্ব এবং (গ) কারাবাস-পরবর্তী শেষ পর্ব — গোরার জীবন কথায় এই তিনটি পর্বকে লেখক কেবল আয়তনের দিক থেকে প্রায় সমান করে গড়েছেন তাই নয়, সমগ্র উপন্যাসে এদের নিজস্ব ভূমিকাকে যথাবিহিত তাৎপর্যে সঙ্গতিপূর্ণ করেও তুলেছেন।

শ্রাবণমাসের মেঘমুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে কলকাতা শহরের এক দোতলা বাড়ির বারান্দায় কর্মহীন সঙ্গীহীন বিনয়কে — বাউলের গানের 'অচিন পাখি'-র ইশারা যার মনকে ঈষৎ ব্যাকুল করেছে। এর পরেই দেখি, গাড়ির দুর্ঘটনায় বিপন্ন পরেশবাবু ও সুচরিতাকে। সেই দুর্ঘটনার মাধ্যমে সুচরিতার প্রতি বিনয়ের এক গূঢ় আকর্ষণবোধ। সব মিলিয়ে যেন কবিতার সুরে বাঁধা এক মনোরম রোম্যান্টিক প্রণয়কাহিনির সূচনা। কাহিনির এক মুখ্য অংশ প্রেমের আখ্যান — সে প্রেম গোরা ও বিনয় দুজনেরই। এখানেই কবিত্বের ছোঁয়ায় বিশালতার সঙ্গে কাব্যের মিলনসন্ধি। আরম্ভ 'দৃশ্যে'ও একটি রোম্যান্টিক প্রেমের অস্ফুট আভাস আছে। কিন্তু সে প্রেমের পাত্রপাত্রী বিনয় ও সুচরিতা। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের তথা প্রণয়-কাহিনির একেবারে গোড়াতেই এক বিচিত্র 'বিপরীত' সিচুয়েশন-এর আভাস দিয়েছেন। এর আসল উদ্দেশ্য বোধ করি গোরা ও সুচরিতার প্রেম-স্বরূপের স্বাতন্ত্র্যকে সুচিহ্নিত করা। নচেৎ নিছক বিনয়কে যদি ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করাই এই দুর্ঘটনা দৃশ্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হত — তাহলে সুচরিতার পরিবর্তে ললিতাকেই প্রথম পরিচ্ছেদে উপস্থাপিত করলে চলত। তাতে প্রণয়-কাহিনি সহজ মসৃণ পথে যাত্রা শুরু করতে পারতো। এমন বিভ্রমের সৃষ্টি হত না। কিন্তু লেখকের এই 'বিপরীত' প্রবণতা থেকেই বোঝা যায়, প্রণয় আখ্যান এই উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাসে প্রধান এক ভূমিকা নিলেও সাধারণ এক রোম্যান্টিক প্রণয়-কাহিনি রচনা লেখকের অভিপ্রেত নয়, প্রেমের এক বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ রূপ যা জীবনের পক্ষে গভীর অর্থবহ, তারই রূপায়ণে তিনি যথার্থ আগ্রহী। বস্তুত উপন্যাসে 'আরম্ভ'-এর (Beginning) ভূমিকা যে কত তাৎপর্যপূর্ণ, তার এক সূক্ষ্ম নিপুণ পরিচয় রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গ্রন্থে দিয়েছেন।

'আদি' পর্বের কাহিনি বিন্যাসের আরেকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উপকরণ হল - ব্রাহ্মবিরোধী ও প্রবল নারী-বিদ্বেষী গোরার জীবনে প্রেমের নিঃশব্দ পদসঞ্চার এবং অপরদিকে

তাকে প্রতিহত করার কঠিন প্রয়াস। এই প্রয়াসের ছবি কাহিনিরূপে ফুটে উঠেছে, যেখানে গোরা দীর্ঘকালব্যাপী দেশ ভ্রমণের সংকল্প নিয়ে পথে বেরুচ্ছে। উপন্যাসের এই প্রধান কাহিনির গ্রন্থিকে আরো নানা দিক থেকে জটিল করে তোলার ইচ্ছায় তৎকালীন সমাজ, ধর্ম, পরিবারের নানা ঘটনার স্রোতকে ঐ মূল কাহিনির সঙ্গে যুক্ত করে কাহিনীর প্রবাহকে আরও কিছুটা ব্যাপক করে তোলার প্রয়াসে লেখক এই পর্বেই উপস্থাপিত করেছেন বিনয়ের সঙ্গে কন্যা শশিমুখীর বিবাহ দেওয়ার জন্য গোরার আপত্তি সত্ত্বেও মহিমের অক্লান্ত চেষ্টা, অন্যদিকে, সুচরিতার প্রতি গোঁড়া ব্রাহ্মশিক্ষক পানুবাবুর দুর্বলতা ও তাকে বিবাহের ইচ্ছা জ্ঞাপনের আখ্যান — প্রসঙ্গ।

গোরার অনুপস্থিতির মুহূর্তেও গোরার কাহিনি ব্যক্তিত্ব ও জীবনবোধের পরোক্ষ অথচ সুস্পষ্ট ক্রমিক উন্মোচনের বিশিষ্ট নিদর্শন উপন্যাসের মধ্যপর্ব (২৬-৫২সংখ্যক পরিচ্ছেদ) গোরার কারাবাস কালের কাহিনি। এই পর্বের প্রথম দিকে পাই, গ্রামবাংলার দুঃখী দুর্গত জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষায় গোরার চরঘোষপুরে যাওয়ার কাহিনি। একদিকে 'যথার্থ' স্বদেশের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার তীব্র ইচ্ছা, অন্যদিকে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বিবাদ-বিরোধ — চরঘোষপুর ও তার পরবর্তী পর্যায়ের কাহিনিতে গোরার জীবনের এই দুই বিরোধী ঘটনার আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে উপন্যাসের পটভূমি কেবল যে বৃহৎ বিস্তৃতি লাভ করল তাই নয়, উপন্যাসের কাহিনিও এক নতুন জটিল সংকট মুহূর্তে এসে পৌঁছল। গোরা কারারুদ্ধ হল।

গোরার অসামান্য ব্যক্তিত্বের পাশে যে বিনয় উপন্যাসের প্রথম পর্বে পুরোপুরি ফুটে উঠতে পারে নি, গোরার অনুপস্থিতি তার ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পেয়েছে। তার ব্যক্তিসত্ত্বা ললিতার প্রতি গভীর প্রেমের মধ্য দিয়েই আপন স্বাতন্ত্র্যকে উপলব্ধি করেছে। বিনয়-ললিতার প্রেম-কাহিনি বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি প্রথম পর্যায়ে, যখন তা কিছুটা দ্বিধান্বিত, পুরোপুরি স্বপ্রতিষ্ঠিত নয়, তখন গোরার পাশে পাশে সমান্তরালভাবে চলার শক্তি অর্জন করতে পারে নি। তাই গোরা কাহিনির পুরোভাগ থেকে সরে যাওয়ার পরেই কেবল ঐ কাহিনি পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করেছে। বস্তুত মধ্যপর্বের অধিকাংশ স্থান জুড়েই বিনয়-ললিতার কাহিনি। এ কাহিনি ওদের নিছক রোম্যান্টিক প্রেমের গল্প নয়, ওদের প্রতিরোধ ও সংগ্রামের এক সুসংবদ্ধ কাহিনি। সে সংগ্রাম মুখ্যত ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে।

বস্তুত এই উপন্যাসে শেষ পর্যন্ত বিনয়-ললিতার কাহিনি বা হরিমোহিনী-আশ্রিত আখ্যান গোরার জীবন পরিণাম বা তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ-বিবর্তনেরই আনুকূল্য করেছে। বিনয়-ললিতার যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, যে প্রতিকূল রক্ষণশীলতাকে বিচূর্ণ করার কঠিন প্রয়াস, তা তো শেষ পর্যন্ত সুচরিতার জন্য গোরার চূড়ান্ত আত্মপ্রসারণ ও আত্মসঙ্কোচন — প্রচেষ্টারই প্রেক্ষাপট রচনা করেছে। অর্থাৎ কারান্তরাল থেকে যে গোরা বেরিয়ে এসেছে, যে গোরা কারাকক্ষের নির্জনতায় ব্রাহ্মপরিবারের মেয়ে সুচরিতার প্রতি প্রগাঢ় প্রণয়-বাসনায় যন্ত্রণাবিহ্বল হয়েছে, সেই গোরা শেষ পর্যন্ত বিনয়-ললিতার ঘটনা থেকে গূঢ় প্রেরণা ও উদ্দীপনা সংগ্রহ করতে চেয়েছে। আর তাই দেখা যায়, বিনয়-ললিতার কাহিনি তখন আর গোরার মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সত্ত্বেও স্তিমিত হয়ে আত্মগোপন করছে না, তা সমান্তরাল এক তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনিরূপে গোরার কাহিনির পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে।

মধ্যপর্বের কাহিনিতে হরিমোহিনী সংক্রান্ত আখ্যানেরও অনুরূপ তাৎপর্য আছে। গোরার অনুপস্থিতিতে হরিমোহিনীর বাসায় যখন সুচরিতা চলে এসেছে, তখন সেখানকার সেই নির্জন পরিবেশের অনুকূল হাওয়ায় গোরার প্রতি সুচরিতার প্রেমের মুকুল সহজেই ফুটে উঠতে পেরেছে তার পরিপূর্ণতায়। কারাবাসপর্ব এভাবেই গোরার ও সুচরিতার মতো দুটি অন্তর্মুখী ভাববাদী ব্যক্তিসত্ত্বার প্রেমের পুষ্টি সাধনে বিশেষ সহায়তা করে কাহিনিকে তার পরিণতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

অন্য সব ছোট ও মাঝারি কাহিনি এভাবে এক অনিবার্য সংযোগের মাধ্যমে যতটা গোরার জীবনবিন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পেরেছে, ততটাই এই উপন্যাসের কাহিনিগত ঐক্য ও সংহতি যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের শেষ অংশে সমস্ত ঘটনা

গোরার ব্যক্তিসত্তার এক মহৎ উন্মোচনের, এক পরম উত্তরণের অভিমুখে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সেই উন্মোচন বা উত্তরণেই এ উপন্যাসের উপসংহার। সেটি হচ্ছে গোরার গোঁড়া হিন্দুত্বের সংকীর্ণ আবরণ খসে গিয়ে 'শুদ্ধ ভারতীয় মানবস্বরূপ'-এর উদঘাটন। আর সেই অন্তিম উপসংহারের প্রকাশ ঘটেছে একটি বিশিষ্ট ঘটনায়। সেটি গোরার জন্ম রহস্য উন্মোচন।

২৯-৩০ নং পরিচ্ছেদে কবিত্ব (বিনয়-ললিতার প্রেমে):-

দুইটি পরিচ্ছেদে যে লেখনী এক সংগ্রাম-মনস্কা তরুণী ও এক সংবেদনশীল তরুণের মধ্যে উদ্ভিন্ন প্রেমের এমন প্রতিচিত্রটি রচনা করেছেন, সেই একই লেখনী দিয়ে আর এক কৌশলে গোরা-সুচরিতার প্রেমের অঙ্কুরিত কাহিনি রচনা করেছেন। এক জায়গায় আত্মনিবেদন ও জয়, এখানে বিদ্রোহ ও বিজয়। সেখানেও ছিল গোরার দৃষ্টিতে সুচরিতার স্নিগ্ধ, শুভ্র প্রতিচিত্র, আর এখানেও আছে বিদ্রোহিনী ও তার মমতাপূর্ণ সহযাত্রীর কর্ষিত মনোভূমি। এমন দুটি বিরুদ্ধ প্রকৃতির সমান প্রকরণ পদ্ধতিতে যথাযথ প্রতিচিত্র রচনার লিপিকুশলতা শ্রেষ্ঠ কলাকুশলীর পরিচায়ক। এমন শিল্পরূপের পরতে পরতে ধ্বনি-ব্যঞ্জনার প্রতিভাস।

প্রথমে বিনয়ের দৃষ্টিতে ললিতা :

"ললিতার এই পরিণামবিহীন সাহসে এবং অন্যায়ের প্রতি একান্ত ঘৃণায় তাহার প্রতি বিনয়ের ভক্তি জন্মিতে লাগিল।..........সে নিজের সমস্ত অহঙ্কার,সমস্ত ক্ষুদ্রতাকে এই মাধুর্যমন্ডিত শক্তির কাছে আজ একেবারে বিসর্জন দিল।"

নিদ্রিত ললিতার নির্ভয়, কান্তিময় অবয়বের চিত্ররূপ :

"এই সুন্দর, এই বিশ্বাসপূর্ণ নিদ্রাটুকুকে ললিতা আজ বিনয়ের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছে।..........সেই নিপুণ কবরীর একটি বেণীও বিস্রস্ত হয় নাই, সেই নারী-হৃদয়ের কল্যাণ-কোমলতায় মন্ডিত হাত দুখানি পরিপূর্ণ বিরামে বিছানার উপর পড়িয়া আছে, কুসুম সুকুমার দুইটি পদতল তাহার সমস্ত রমনীয় গতিচেষ্টাকে উৎসব-অবসানের সঙ্গীতের মতো স্তব্ধ করিয়া বিছানার উপর মেলিয়া রাখিয়াছে — বিশ্রব্ধ বিশ্রামের এই ছবিখানি বিনয়ের কল্পনাকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল।..........'আমি আছি, আমি জাগিয়া আছি'— এই বাক্য বিনয়ের বিস্ফারিত বক্ষকুহর হইতে অভয়শঙ্খধ্বনির মতো উঠিয়া মহাকালের অনিমেষ জাগ্রত পুরুষের নিঃশব্দ বাণীর সহিত মিলিত হইল।"

একই পরিচ্ছেদে ললিতার দৃষ্টিতে বিনয়। তার কেবিনে ললিতা নিদ্রিতা, ভোর রাত্রে ঘুম ভেঙে ললিতা বাইরে এসে দেখে :

"অনতিদূরে বিনয় একটা গরম কাপড় গায়ে দিয়া বেতের চৌকির উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়াই ললিতার হৃৎপিন্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল, সমস্ত রাত্রি বিনয় ওখানেই বসিয়া পাহারা দিয়াছে। এত নিকটে তবু এত দূরে।........সম্মুখের দিকপ্রান্তের তারাগুলি যেন বিনয়ের নিদ্রাকে বেষ্টন করিয়া তাহার চোখে পড়িল, একটি অনির্বচনীয় গাম্ভীর্যে ও মাধুর্যে তাহার সমস্ত হৃদয় একেবারে কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ললিতার দুই চক্ষু কেন যে জলে ভরিয়া আসিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না।........নদীর ওপরে এই তরুপল্লবনিবিড় নিদ্রিত তীরে রাত্রির অন্ধকারের সহিত নবীন আলোকের যখন প্রথম নিগূঢ় সম্মিলন ঘটিতেছে, সেই পবিত্র সন্ধিক্ষণে পরিপূর্ণ নক্ষত্র সভায় কোন একটি দিব্যসঙ্গীত অনাহূত মহাবীণায় দুঃসহ আনন্দ বেদনার মতো বাজিয়া উঠিল।"

মিলনমুখী এমনি দুটি ব্যক্তিমানস শুভ্র-শান্তপ্রকৃতির বিশ্বজাগতিক প্রেক্ষাপটে খুব ভোর বেলায় স্টিমারে রেলিং-এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সামনে পূর্বের আকাশে দিগন্ত রেখা বিদীর্ণ করে জবাকুসুমের রং-এর সূর্য ওঠার সঙ্কেত দিয়েছে :

"ইহারা দুইজন জীবনে এমন প্রভাত আর কোনদিন দেখে নাই। আলোক তাহাদিগকে এমন করিয়া কখনো স্পর্শ করে নাই — আকাশ যে শূন্য নহে তাহা যে বিস্ময়-নীরব আনন্দে সৃষ্টির দিকে অনিমেষ চাহিয়া আছে, তাহা ইহারা এই প্রথম জানিল। এই দুইজনের চিত্তে

চেতনা এমন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে যে, সমস্ত জগতের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের সঙ্গে আজ যেন তাহাদের একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হইল। কেহ কোন কথা কহিল না।"

উল্লেখপঞ্জী

১। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' — বিবিধ প্রবন্ধ
২। 'কেকাধ্বনি' — বিচিত্র প্রবন্ধ
৩। The Golden Bowl, Methuen.1957
৪। ৪র্থ পরিচ্ছেদ, গোরা
৫। তদেব
৬। ১৭ পরিচ্ছেদ, ঐ
৭। ২০ পরিচ্ছেদ, ঐ
৮। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প
৯। From Virgil to Milton-C.M.Bowra
১০। ৫৪ পরিচ্ছেদ, গোরা
১১। The epic strain in the English Novel — Tillyyard (1958)

চতুরঙ্গ

পূর্বাভাস

"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে ?" — সে কোন অনাদিকাল থেকে যে তিনি বের হয়েছেন তা কে জানে ! সেই জন্যই তো এই পরিচিত জগদ্দৃশ্যের মধ্যে সেই অদৃশ্যের ছায়া পড়ে— 'O world invisible, we view thee !' সকল সৌন্দর্যের মধ্যে যে অনির্বচনীয় বেদনা তা এই বিরহেরই বেদনা। গ্রহতারার অনিমেষ দৃষ্টির মধ্যে সেই বিরহের চিরব্যাকুলতা। মানব প্রেমের ও বাসনার সকল অতৃপ্তির মধ্যে সেই অনাদিবিরহের বেদনা। এই বিরহই রূপ ধরছে বলে রূপ ক্রমাগতই 'flowing and changing' বহমান এবং পরিবর্তমান। গীতিমাল্যের একটি কবিতায় —

আমি আমায় করব বড়
এই তো আমার মায়া;
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে
ফেলব রঙীন ছায়া।
তুমি তোমায় রাখবে দূরে
ডাকবে তারে নানা সুরে
আপনারি বিরহ তোমার
আমায় নিল কায়া।

কবি বলছেন, এই যে আমি নিজেকে তার থেকে স্বতন্ত্র বলে বলে জানছি এ তো মায়া। কিন্তু এই মায়া যদি না থাকত, তবে কি আমাদের কান্না-হাসি, আশা-ভয় এমন নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠত — তবে যে বিচিত্রতার কোথাও কোন স্থানই থাকত না। এতে আমার যে আড়াল রয়েছে, তাতেই তো "দিবা-নিশির তুলি দিয়ে হাজার ছবি আঁকা" হচ্ছে — এই মায়ার পর্দাখানি না থাকলে কি এত রং, এত আকাবাঁকা কিছুই থাকত—বর্ণ ও আকার লোপ পেয়ে সমস্তই একমাত্র অখন্ড এক হয়ে যেত না' ভাগ্যে এই মায়া ছিল, নইলে ঈশ্বরেরই বা আপনাতে আপনি থেকে কি আনন্দ ছিল এবং আমাদেরই বা অহঙ্কার বিলুপ্ত হয়ে তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে কি আনন্দ ছিল ?

তাই তোমার আনন্দ আমার পর।
তুমি তাই এসেছ নীচে।
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।

মায়ার আড়ালে সসীম ও অসীমের এই খেলাটাই সমস্ত জগতের খেলা, এমন কি সৃষ্টির খেলাও। এটাই আমাদের জীবনের খেলা বলে সসীম ক্রমাগতই অসীমে নিজেকে হারিয়ে ফেলে এবং অসীম ক্রমাগতই সসীমরূপে নিজেকে ধরা দিচ্ছে। আমাদের জীবনের পথে যেমন আমাদের জীবন 'প্রতিপদেই উৎসুক, অজানা কোন নিরুদ্দেশের তরে', সেরকম সেই পথের যিনি চিরসঙ্গী তারও রূপের কোন শেষ নেই। ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি। সন্ধ্যার গভীর ছায়াঘন নদীর ঘাটে কোন 'অজানার বীণাধ্বনি' বাজে, ঝরের রুদ্র নাচের মধ্যে 'মেঘের জটা' উড়িয়ে দিয়ে কার হঠাৎ আর্বিভাব ঘটে 'প্রভাতের আলোর ধারায়', কার একটি নত মুখ মুখের ওপর প্রেমদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ঋতুতে ঋতুতে সেই চিরন্তন পথিক কত নব নব রঙীন বেশে দেখা দিয়ে যায়। আবার প্রভাতে অরুণবরণ পারিজাত হাতে নিয়ে সোনার রথে চেপে একটি বার জানালার কাছে এসে ঘরের অন্ধকারকে আনন্দে ভরিয়ে দিয়েই কি সে চলে যায় ? তার ঝড়ের রূপ, তার রঙের রূপ, প্রেমের রূপে তার মনোহরণ বেশ, জীবনের সমস্ত রূপের মধ্যে সেই অপরূপের লীলা চলে।

১৯১৪ সালে এপ্রিল মাসে সবুজপত্র প্রকাশিত হয়। ঐ একই বছরে আগস্ট মাসে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় ঘটনার প্রভাব ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ওপর যদিও সুগভীর, বাংলার সমাজ, সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর সবুজপত্রের প্রকাশের প্রভাবও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'গোরা'র পর থেকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের গভীর ভাবগত পরিবর্তন বিশেষ লক্ষ্যনীয়। প্রতিটি উপন্যাস

একেকটি ভাবকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে। যেখানে স্ত্রী চরিত্রে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সৃজন প্রতিভা অভিনব রূপে প্রকাশিত। দামিনী, বিমলা, কুমোদিনী, লাবণ্য ও এলা — স্মরণীয় এই চরিত্রগুলো সেই সময়ের সমাজ এবং পাঠকের মনে বিপুল এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ের প্রতিটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তার দৃষ্টিভঙ্গি, রচনারীতির মৌলিকতা ও ক্রম প্রাগ্রসরতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। ভবানী ভট্টাচার্য[১] বলেছেন, "The curious fact about Tagore is that the end he reached always become the point of a new beginning. That is perhaps the most striking feature in the development of his art spread over six decade. 'Thou hast made me endless, such is thy pleasure-that is Tagore's discovery of himself and the testament to own youthfulness." 'চতুরঙ্গ' এবং 'ঘরে বাইরে' এই দুটি উপন্যাসই ১৯১৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। প্রথমত 'সবুজপত্রে' ধারাবাহিকভাবে এবং গ্রন্থাকারে। সবুজপত্রের পাতায় পাতায় সমাজ পুনরুজ্জীবনের আত্যন্তিক প্রয়োজনের কথা এবং জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে।

প্রেমসম্পর্ক এবং দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েনের ভেতর শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের জীবন চিত্রের মধ্য দিয়ে চতুরঙ্গ উপন্যাসে রবীন্দ্রদৃষ্টি মানবমনের গহনলোকের অন্দমহলে ঢুকে পড়েছে। S.C.Sengupta সঠিক ভাবেই বলেছেন "It is one of the best of it works, it rivals the English Gitanjali and the Bengali, Balaka." চতুরঙ্গ সবুজপত্রের সাতটি ছোট গল্প (হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা) ও একটি বৃহৎ উপন্যাস (ঘরে বাইরে) রচনার মাঝখানে রচিত বলে এর মধ্যে ছোট গল্পের রীতি ও উপন্যাসের গতি উভয়ই স্পষ্ট। আবার বলাকা পর্বে লেখা বলে ঐ কাব্যের দার্শনিকতা উপন্যাসটির মর্মকথা হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাই একে 'কাব্য-উপন্যাস' আখ্যা দিয়েছেন।

চরিত্র

শচীশ

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শচীশ ও দামিনীর সম্পর্কের সূত্র ধরেই মানব মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় ভাব-গভীর রূপ এখানে রবীন্দ্রনাথ পরিস্ফুট করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব উপন্যাসেরই সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে যে তাঁর সৃষ্ট নায়ক-নায়িকারা সাধারণ সংসারের মানুষ হয়েও অসাধারণত্বের গৌরবমন্ডিত। শচীশও তার ব্যতিক্রম নয়। জ্যাঠামশায় জগমোহনের "প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন"-এর আদর্শে পরিপূর্ণভাবে অণুপ্রাণিত হয়েছিল শচীশ। একান্তভাবেই জগমোহনের শিক্ষায় ও আদর্শে গঠিত, পরিমার্জিত দৃষ্টিসম্পন্ন শচীশ তার পিতার সংসারের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ছিল। শ্রীবিলাসের উক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শচীশের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন সে চিত্র তার অসাধারণত্বের ইঙ্গিতবাহী। "শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ— তাহার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রঙ যেন রঙ নহে, তাহা আভা।" শচীশের অন্তরাত্মার মধ্যে যে একটি অনন্ত-অভিলাষী ব্যাকুলতা রয়েছে। তার রূপের বর্ণনা তারই ব্যঞ্জনার বহন করছে।

শচীশের এই মানসিক যন্ত্রণার রূপকে লেখক চিত্রিত করেছেন এই ভাবে —

"....... জ্যাঠামশায়ের ভিতর দিয়াই সে আপনার যাহা কিছু পাইয়াছে এবং তাঁর মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা কিছু দিয়াছে। তাঁর কাছে বিচ্ছেদের শূন্যতা প্রথমটা শচীশের কাছে কেমনতরো ঠেকিয়াছিল তা ভাবিয়া ওঠা যায় না। সেই অসহ্য যন্ত্রণার দায়ে শচীশ কেবলই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, শূন্য এত শূন্য কখনোই হইতে পারে না; সত্য নাই এমন ভয়ংকর ফাঁকা কোথাও নাই; এক ভাবে যাহা 'না' আর একভাবে তাহা যদি 'হ্যাঁ' না হয় তবে সেই ছিদ্র দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে।"

এইখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে আত্মানুসন্ধানের পথে শচীশের যাত্রা, আর সেই পথেরই আরেক প্রান্তে রয়েছে দামিনী। ননিবালার আত্মহত্যা থেকে আরম্ভ করে জগমোহনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শচীশের জীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে সেই আলোড়ন আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে দামিনীর সংস্পর্শে এসে। এখানে রবীন্দ্রনাথ শুধু ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে শচীশের মনের সেই দ্বন্দ্বমুখর রূপকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

নাস্তিক-কর্মযোগী শচীশ লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যত্ব নিয়ে ভক্তিরসের সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হল। তার এই আশ্চর্য পরিবর্তনে শ্রীবিলাস তাকে প্রশ্ন করেছে — "জন্মকাল হইতে তুমি মুক্তির মধ্যে মানুষ, আজ তুমি এ কী বন্ধনে নিজেকে জড়াইলে ? জ্যাঠা-মশায়ের মৃত্যু কি এত বড় মৃত্যু ?"

এর উত্তরে শচীশ বলেছে— "জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়াছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে।"

প্রত্যক্ষ জগৎকে বাদ দিয়ে পূর্ণতাকে সে শুধু ভাবরসে নিমগ্ন হয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছিল। তাকে দেখে শ্রীবিলাসের মনে হয়েছে —"মিলনমাত্র যে আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে আমি শ্রীবিলাস নয়, সে আমি 'সর্বভূত'; সে আমি একটা আইডিয়া।

দামিনী তার তীব্র জীবন পিপাসা নিয়ে ক্রমশঃ সেই আশ্রম জীবনে একটা ভাঙনের সুর নিয়ে এল। তার মধ্যেই শ্রীবিলাস প্রত্যক্ষ করেছিল 'রসের স্বর্গ'। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দামিনীর "বিদ্রোহের কর্কশ আবরণটা কোন ভোরের আলোতে নিঃশব্দে একেবারে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল....। দামিনীর সেবা এখন এমন সহজে এমন সুন্দর হইয়া উঠিল যে, তার মাধুর্যে ভক্তদের সাধনার উপরে ভক্তবৎসলের যেন একটি বিশেষ বর আসিয়া পৌঁছিল।"

একদিন "শচীশ কী একটা কারণে অসময়ে তার শোবার ঘরে ঢুকিতে গিয়া চৌকাঠের কাছে চমকিয়া দাঁড়াইল। দেখিল দামিনী তার চুল এলাইয়া দিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া পাড়িয়া মেঝের উপর মাথা ঠুকিতেছে এবং বলিতেছে - পাথর, ওগো পাথর, ওগো পাথর, দয়া করো, দয়া করো, আমাকে মারিয়া ফেলো।

ভয়ে শচীশের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, সে ছুটিয়া ফিরিয়া গেল।"

কত স্বল্প পরিসরে শুধু ব্যঞ্জনার সাহায্যে একটিমাত্র ভয়ের ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ শচীশের মনের একটি

আলেখ্য তুলে ধরলেন। নির্জন দ্বিপ্রহরে দামিনীর এই আর্তনাদ তার অবচেতন মনে আবার তীব্র আঘাত দিয়ে গেল, যার স্বরূপ শচীশ তখনও উপলব্ধি করতে পারে নি। তবু একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা তার হৃদয়কে বিদ্ধ করতে লাগল।

মনোবিজ্ঞান মানুষের অবচেতন মনের যে সন্ধান দিয়েছে, শচীশের এই বিবৃতির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই অপ্রত্যক্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষের এক নিবিড় সংযোগরে চিত্র অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। শচীশ লিখেছে— 'গুহার মধ্যে অনেকগুলির কামরা। আমি তার মধ্যে একটাতে কম্বল পাতিয়া শুইলাম।

সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো — তার ভিজা নিঃশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। আমার মনে হইল সে যেন আদিম কালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু; তার চোখ নাই, কান নাই, কেবল তার মস্ত একটা ক্ষুধা আছে; সে অনন্তকাল এই গুহার মধ্যে বন্দী; তার মন নাই— সে কিছুই জানে না, কেবল তার ব্যথা আছে, সে নিঃশব্দে কাঁদে।....

মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনো দিকে আর বাহির হইবার পথ নাই। এ কেবল একটা কালো ক্ষুধা, এ আমাকে অল্প অল্প করিয়া লেহন করিতে থাকিবে এবং ক্ষয় করিয়া ফেলিবে। ইহার রস জারক রস, তাহা নিঃশব্দে জীর্ণ করে।

জানি না কতক্ষণ পরে — সেটা বোধকরি ঠিক ঘুম নয় — অসাড়তার একটা পাতলা চাদর আমার চেতনার উপরে ঢাকা পড়িল। এক সময়ে সেই তন্দ্রাবেশের ঘোরে আমার পায়ের কাছে প্রথমে একটা ঘন নিঃশ্বাস অনুভব করিলাম। ভয়ে আমার শরীর হিম হইয়া গেল। সেই আদিম জন্তুটা।

তারপর কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁয়া আছে — এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুন্ড, কী রকম গা, কীরকম লেজ কিছুই জানা নাই — তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ।

ভয়ে ঘৃণায় আমার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। আমি দুই পা দিয়া তাহাকে ঠেলিতে লাগিলাম। মনে হইল সে আমার পায়ের উপর মুখ রাখিয়াছে — ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছে — সে যে কী রকম মুখ জানি না। আমি পা ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া লাথি মারিলাম।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পথ ধরে শচীশের মনের গভীরে প্রবেশ করেছেন, যে মনে নিরন্তর আলো-আঁধারের বিচিত্র লীলা চলছে। সেই অবচেতন মনের কোন পথ ধরে শচীশের জীবনে আবার বিপর্যয় আসতে পারে তার খবর শচীশ রাখেনি। কিন্তু দামিনীর প্রেমপিপাসিত হৃদয়ের হাহাকার যেদিন শচীশ প্রত্যক্ষ করল, সেদিন তার নিজের মনের গভীরেও কোন রহস্য আত্মগোপন করে আছে কিনা সেই ভেবে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। একটা স্বপ্নময়তার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ শচীশের অন্তরাত্মাকে আলোকিত ক'রে তুলেছেন। শচীশ নির্জন গুহাকক্ষে তার হৃদয়ের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, যে অংশ এতদিন পর্যন্ত, তার কাছে নিবিড় অন্ধকারময় ছিল। দামিনীর মর্মবেদনা সূর্যালোকের মত স্পষ্ট, আর শচীশের হৃদয় রাত্রির মত রহস্যময়। দামিনী চৌকাঠে মাথা ঠুকেছে সম্পূর্ণ সজ্ঞান অবস্থায়, আর অবচেতন মনের দুয়ারে বারবার আঘাত পেয়েছে শচীশের মন। সেই মনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রতীক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন। শচীশকে তিনি একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাবের জগতে নিয়ে গেছেন। কারণ, সজ্ঞান অবস্থায় মানুষ সর্বদাই তার মনকে সংযত রাখে; আর অবচেতন অবস্থায় মনের গোপনরূপ, তার অবদমিত আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সেই কথাই প্রমাণিত হয়েছে। "আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু" অনন্তকাল গুহায় বন্দী, সে তার ক্ষুধার পুঞ্জ নিয়ে নিঃশব্দ ব্যথায় কাঁদে —এ শচীশেরই অবচেতন মনের রুদ্ধ বেদনা। সে প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করেছে, তার জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণ হয়নি, তার প্রতি দামিনীর ভালবাসাকে সে শঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখেছে। তার 'জাগ্রৎচৈতন্য'তে কামনাবাসনা-অতৃপ্তিকে দহন করে রেখেছিল গুহার এই বিপুল অন্ধকারে স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় সেই আকাঙ্ক্ষা উৎসারিত হতে লাগল শচীশের অন্তর থেকে।

গুহা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শচীশ প্রাণপণ শক্তিতে দামিনীকে বর্জন করার চেষ্টা করল। কিন্তু যেদিন সন্ধ্যায় দামিনী তার মনের কথা উজাড় করে শ্রীবিলাসকে জানিয়েছিল, সেদিন শচীশও অন্তরাল থেকে দামিনীর মর্মবাণী শ্রবণ করেছিল। কীর্তনের পালা শেষ হবার অনেক আগেই শচীশ চলে এসেছে দামিনীর কাছে। দমিত হৃদয়াবেগ যে আর বাধা মানছে না, একথা শ্রীবিলাস অনুভব করেছিল। কিন্তু তবুও শচীশ

আত্মসংবরণ করে যখন দামিনীকে তাদের সঙ্গ পরিহার করার জন্য অনুরোধ জানাল, তখন দামিনীর প্রচন্ড অসম্মত ও তীব্র অভিমান তাকে বিহ্বল করে দিল। শচীশ ক্রমশঃ তার এই রসের সাধনার খন্ডিত রূপকে উপলব্ধি করল। আবার শচীশের হৃদয় সমুদ্র প্রচন্ডভাবে আন্দোলিত হতে লাগল। শ্রীবিলাসের মাধ্যমে শচীশের এই মনের রূপ রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন-'শচীশ আজকাল কেমন এক-রকম হইয়া গেছে। যে ঘুড়ির লখ ছিঁড়িয়া গেছে তারই মতো এখনও হাওয়ায় ভাসিতেছে বটে, কিন্তু পাক খাইয়া পড়িল বলিয়া, আর দেরি নাই। জপে তপে অর্চনায় আলোচনায় বাহিরের দিকে শচীশের কামাই নাই, কিন্তু চোখ দেখিলে বুঝা যায় ভিতরে ভিতরে তার পা টলিতেছে।" একদিকে শ্রবিলাসের প্রতি দামিনীর পক্ষপাতিত্বে শচীশের ঈর্ষা আরেক দিকে সেই দামিনীকে কেন্দ্র করে তার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ মন—দুয়ের আঘাতে জর্জরিত শচীশ দামিনীর সংস্রব এড়িয়ে কিছুদিনের জন্য আশ্রম ত্যাগ করেছে। যখন ফিরে এসেছে তখন "প্রচন্ড ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা"। তার বিক্ষুব্ধ হৃদয় যে আরও প্রচন্ড শক্তিতে উদ্বেলিত হয়েছে শচীশের এই রূপবর্ণনার মধ্য দিয়ে তারই সংকেত ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। এইবার শচীশ দামিনীকে বর্জন করার পরিবর্তে তার সাধনপথের সঙ্গিনীরূপে আহ্বান জানাল। একদিন দামিনী শচীশের সাধনায় বিঘ্ন ঘটিয়েছিল, প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত শচীশ তার পরের স্তরে দামিনীকে তার সাধনার পথে সহায়িকারূপে দেখতে চেয়েছে। "কিন্তু শচীশ যাহা ভাবিয়াছিল তার কিছুই হইল না। আর-একবার দামিনী যখন এমনি করিয়াই নত হইয়াছিল তখন শচীশ তার মধ্যে কেবল মাধুর্যকেই দেখিয়াছিল, মধুরকে দেখে নাই। এবারে স্বয়ং দামিনী তার কাছে এমনি সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে গানের পদ, তত্ত্বের উপদেশ সমস্তকে ঠেলিয়া সে দেখা দেয়, কিছুতেই তাকে চাপা দেওয়া চলে না। শচীশ তাকে এতই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে তার ভাবের ঘোর ভাঙিয়া যায়। এখন সে তাকে কোনমতেই একটা ভাবরসের রূপকমাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না। এখন দামিনী গানগুলোকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজাইয়া তোলে।"

শচীশ দামিনীর প্রেমকে তার অন্তরে অনুভব করেছিল। কিন্তু সত্যোপলব্ধির যে ব্যাকুলতা তার সমস্ত জীবন জিজ্ঞাসার মধ্যে নিবিড় ভাবে জড়িত ছিল, তাকে সে তখনও খুঁজে পায়নি। নাস্তিক্য-আস্তিক্য, দামিনীর প্রেম, স্নেহ সেবা — যখন যাকে আশ্রয় করেছে, তাকেই পরম সত্য বলে গ্রহণ করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শচীশের যুক্তি পিপাসী মন কোথাও সমগ্রতার সন্ধান পায়নি।। তা বার বার যত পরিবর্তমনের মধ্য দিয়ে সে পূর্ণভার অভিমুখী হয়েছে।

এবার এসেছে শচীশের স্টীমের জীবনের চতুর্থ স্তর-আত্মিক উপলব্ধিই যে পর্বের মূল সাধনা। এতদিন ভক্তির উন্মাদনায় মনের সমস্ত চেষ্টা প্রত্যেক মুহূর্তে ফুঁকিয়ে দিয়া একেবারে সে নিজেকে দেউলে করিয়া দিত। এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।" গভীর রাত্রে সে দামিনী ও শ্রীবিলাসকে ডেকে তার অরূপ সাধনার পথে যাত্রা করার কথা জানিয়েছে। এই 'উপলব্ধি তাকে সব বন্ধন ছিন্ন করিয়েছে; তাই দামিনীর সমস্ত আর্তনাদের প্রত্যুত্তরে বলেছে; "যাকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার — আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী তুমি আমাকে দয়া করো তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।" এই অংশে অরূপ উপলব্ধির তীব্র আর্তি অতি উজ্জ্বল বর্ণে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন।

সাধনার ব্যাকুলতা নিয়ে শ্রীবিলাসকে সে বলেছে 'একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর এক দিন রসের উপর ভর করিলাম দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই।" আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে একটা কিনারার মত শচীশ দেখিছিল, সেখানে পৌঁছানোর জন্য তার যাত্রাপথ থেকে দামিনীকেও সে বর্জন করেছে। প্রথমনাথ বিশী 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' গ্রন্থে বলেছেন — "পরের প্রদীপে যখন আর চলিল না, নিজের দীপটি সন্ধান করিয়া জ্বালিয়া লইবে তখন সে বাধ্য হইল। এ পথের পরিণাম লেখক দেখান নাই, কারণ সে পথের পরিণাম আনায়াস্ সদৃশ নয়; তাহায় লক্ষ্য মহৎ বলিয়াই তাহার অন্ত অনিদিষ্ট। নিরীশ্বর কর্মযোগে ছিল নিছক অরূপের সন্ধান, ভক্তিযোগে ছিল প্রত্যক্ষরূপের সন্ধান।

শচীশ এখন বুঝিতে পারিয়াছে রূপেও নয়, অরূপেও নয়, রূপা রূপের সম্বন্বয়ের মধ্যেই সার্থকতার সন্ধান করিতে হইবে।'' সেই উপলব্ধির আলোকেই তার জীবনের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অগ্নিসম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

চতুরঙ্গ প্রকাশের পর কবিকে এক পত্রে অমিয় চন্দ্র আসাম থেকে[২] লেখেন ঃ শচীশ কি কম কষ্ট পেয়েছিল...... এমনকী দামিনী বিচিত্র সুখ দুঃখ চঞ্চলিত সংসারের অপূর্ব মূর্তি – তাকেও তার সাধনার বাধা বলেই মনে হল— তাকে বলতে হলো ''আমার তাঁকে বড় দরকার, তুমি আমার পথে দাঁড়িও না'' চরম স্বার্থ ত্যাগের ভেতর দিয়ে শচীশ ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্যের পর পারে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হলো। সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[৩] জানিয়েছেন— ''...... তাঁর এই উক্তির কোন প্রতিচিত্র প্লটে কোথাও নেই। এই উক্তি ব্যাখ্যাতার সৃষ্টিকল্পনা, লেখকের শিল্পরূপে কোথাও পাওয়া যাবে না। সুতুরাং এসব উক্তি মূল্যহীন প্রক্ষেপ মাত্র, স্রষ্টাকেন্দ্রিক সমালোচনার প্রত্যাশিত ফলশ্রুতি।''

পীড়িতের প্রতি করুণা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সেবা ধর্মে আত্মনিয়োগ জগমোহনেরই শিক্ষার ফল হলেও শচীশের স্বভাবে সব রঙ গন্ধ নিয়ে পুর্ণ হয়ে ফুটে উঠেছিল।

মানুষের মনের যে অংশ প্রকাশ্য-ব্যক্তির মনে বা কাজে, বিচার-বিশ্লেষণ চলে, কিন্তু যে অংশ ডুবে আছে— যেমন ডুবে থাম হিম শৈলের নয় ভাগই জলের তলায়, তাকে তো কোন ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় না। হঠাৎ তা জাহাজের তলা ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজেকে জানিয়ে দেয়। এই চেতনা থেকেই মনস্তাত্বিক ক্রমানুগ রীতির স্থানে এসে হাজির হয় ক্রমভঙ্গ রীতি – রবীন্দ্র-উপন্যাসে চতুরঙ্গ থেকে তার চমৎকার সূচনা। শচীশের নিজের কথা ঃ 'জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছিলেন, ছোট ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোট ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে। .... সে যে ছিল ডাঙ্গার উপরকার মুক্তি, তখন কাজের ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায় আমার হাত-পাকে সচল করিয়া দিয়াছিলেন। আর এ যে রসের সমুদ্র, এখানে নৌকার বাঁধনই যে মুক্তির রাস্তা।'

লেখক তাঁর জাগ্রত স্বপ্ন পথ অভিজ্ঞতার একটি ছবি এঁকেছেন। বিশ্লেষণী রীতির সঙ্গে প্রতীকী রীতির মিশ্রণ ঘটল চৈত্র রচনায়। গুহার সেই অভিজ্ঞতা এবং তার মানস প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষের বর্ণনায় প্রতীকের ব্যবহার যেন, আবার স্বপ্নের মত অস্পষ্ট। অবচেনাশ্রয়ী চিত্র বলেও মাঝে মাঝে ভ্রান্তি জন্মানো হয়েছে। এর মধ্যে দামিনীর দেহ নিবেদনের তীব্র জৈব আকুতি, শচীশের বোধে হয়ে উঠেছে আপনার চিত্তের গুহাস্থিত গভীরতা থেকে উঠে আশা অন্ধ কামনার সর্বাতিশয়ী আক্রমণ। সেখানে কামনাকে মারতে চেয়েছে প্রবল বিতৃষ্ণায় তার সন্নাস-সাধনার সব শক্তি নিয়ে।

কিন্তু সন্নাসীর প্রকৃতি বিরোধীতায় কামনা উৎসাদিত হয় না। তার অস্থৈর্য, ব্যাকুলতা ঔপান্যাসিক ছোট ছোট ঘটনা তরঙ্গের উত্থান-পতনে নিপুণ বিশ্লেষণী কুশলতায় প্রকাশ করেছেন। দামিনীকে দূরে রেখে শান্তি নেই, লীলানন্দ ধর্ম গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ ভাঙ্গন ঘটাচ্ছে শচীশের চিত্তে। তাকে ধর্ম সাধনায় শান্ত, নম্র করে আনলে যদি দ্বন্দ্বমুক্ত হওয়া যায়— শচীশ দামিনীকে ভক্তি ভজনের দলে টানল। শচীশ হয়তো এতে সাময়িক শান্তি পেত, হয়ত পেত না। কিন্তু নবীনের স্ত্রীর আত্মঘাতি হওয়ার ফলে ওরা লীলানন্দ স্বামীকে ছেড়ে চলে এলো। শচীশের মন থেকে নিঃশেষে ঝরে গেল লীলানন্দ গুরু তার সব ভক্তিতত্ত্ব সব প্রভাব নিয়ে। যদিও শচীশ দামিনীর ভাষা জানেনি, নিজের মত করে বুঝে নিয়েছিল। শ্রীবিলাসের জবানিতে জানা গেল যে, 'ভক্তিবাদ ও লীলানন্দের চেলাগিরির ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা ফেলিয়া আসে নীরবে শান্ত হইয়া বসিল— কী মানিল আর কী না মানিল তাহা বোঝা গেল না।'' শচীশের এই দ্বিতীয় বড় পরিবর্তন— একেও

লেখক চোখের অন্তরালে ঘটতে দিলেন। শচীশের চরিত্র ১) আত্মমগ্ন হয়ে স্তব্ধ থাকা। ২) কসমিক কনসাশনেস তথা পিওর রিজন-এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে, তবে ব্রহ্ম চেতনা ও মরমিয়া সুলভ ভগৎ প্রেমের মিশ্রণের ফলে যে অরূপ তত্ত্ব গড়ে তুলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শচীশের চরিত্রে তারই মানবিক প্রকাশ। ৩) ''স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ, জ্বলিতেছে, তার জীবনটা একদিক হইতে আর একদিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।''

শচীশের জীবনের সঙ্গে গাঁথা পড়েছে দুটি নারীর জীবন। এই দুটি নারীর প্রেম ও পরিণতি, অনুভব ও বিশ্বাসের জগতে ঢেউ তোলে। সেই সঙ্গে দেখা দেয় দাম্পত্য বিষয়ক কিছু মৌলিক প্রশ্ন। অবাঞ্ছিত সন্তান-সম্ভাবনার মর্মান্তিক গ্লানিতে যখন সে দিশাহারা, ঠিক তখনই শচীশ তাকে বিয়ে করে নারীত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। নাস্তিক জ্যাঠামশায়ের শিষ্য শচীশ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জ্যেষ্ঠের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছে। কিন্তু এই দুর্লভ দাম্পত্যের নিশ্চিত মর্যাদা ননিকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। প্রেম ননিবালার কাছে জীবনের চেয়ে বড়— প্রেম বর্জিত এই দাম্পত্যকে সে বরণ করে নিতে পারেনি। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় প্রেমকে সে পরম ও চরম স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রাণের মূল্যে ননিবালা প্রমাণ দাম্পত্যের পরিপূরক— যার অভাবে বিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র।

বিনোদিনীর মতো বিধবা, লাস্যময়ী ভোগাকাঙ্ক্ষায় উত্তপ্ত। জীবনের বন্ধুর যাত্রা পথে বিনোদিনী পথের প্রান্তে এসে থেমেছে। আত্মিক বাধায় বিহারীর প্রেমকে সে দাম্পত্যের পরিপূর্ণতায় গৌরবান্বিত করে তুলতে পারেনি। কিন্তু দামিনীর বৈধব্য, প্রেম ও দাম্পত্য কোনটির প্রতিবন্ধক হয়নি। ভালোবাসার অমলীন পুষ্পগুলি শচীশের পদপ্রান্তে উৎসর্গ করে দিয়েও সে শ্রীবিলাসকে অনায়াসে, সংকোচহীন মানসিকতায় স্বামী বলে গ্রহণ করেছে। চতুরঙ্গ উপন্যাস শচীশ- দামিনীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের উত্তপ্ত কাহিনী। ভোগাকাঙ্ক্ষার দুঃসহ জ্বালা, প্রেমের বিচিত্রমুখী অভিঘাত, দার্শনিকতার আলোছায়া একত্রিত হয়ে উপন্যাসখানিকে জীবন ধর্মী করে তুলেছে। ননিবালা, নবীনের স্ত্রী পরাজিত কিন্তু আত্মত্যাগে ভাস্বর। আর দামিনীর প্রেম অস্তিত্ব-নির্ভর তবু প্রত্যাখ্যানের বেদনায় রঞ্জিত।

ভাস্বর-ব্যক্তিত্ব পুরুষ শচীশের আকর্ষণে জীবন রসিক দামিনী প্রথম থেকে ধরা পড়েছে। পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে প্রগলভ রূপ নিয়ে আত্ম প্রকাশ করেছে গুহার অন্ধকারে। কিন্তু বিশ্বলীলার নিগূঢ় রহস্যটি খুঁজে পাওয়ার অলৌকিক বেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত শচীশ নারী-বিলাস মোহ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। নবীনের স্ত্রীর আত্মহননের মধ্যে কামনার কলুষ বীভৎসতার এক নিদারুণ রূপ সে দেখেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনাটির শচীশ-দামিনী উভয়কেই সম্বিতে ফিরিয়ে দিয়েছে। আর্তকণ্ঠে দামিনীকে শচীশ তাই বলেছে— 'দামিনী তুমি আমাকে দয়া কর— তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।' এই আত্মিক আঘাতে দামিনীর অন্তরের লোভ-রাক্ষসীটির মৃত্যু ঘটেছে। উপলব্ধির ভাবান্তরের সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষারও রূপান্তর- এর পর দামিনী শচীশকে দেখেছে সাধকের জ্যোতির্ময় স্বরূপে। দামিনী যতদিন মোহগ্রস্থ ছিল ততদিন অসুন্দরের আত্মীয়। কিন্তু বেদনার তীব্র দহনে তার জীবনে মোহতীত সত্তার ঘটেছে মুক্ত প্রকাশ। শচীশের প্রতি তার কলঙ্কিত প্রেম রূপান্তরিত হয়েছে পূজায়। আজ তাই শচীশ দামিনীর প্রাণের ঠাকুর, আরাধ্য দেবতা। দাম্পত্যের প্রাত্যহিক মালিন্য দিয়ে শচীশকে বাঁধার ক্ষুদ্রতা তার আর নেই।

আত্মিক মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ দামিনী পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে স্বামী রূপে গ্রহণ করেছে শ্রীবিলাসকে। শ্রীবিলাসের ঘরণী দামিনীর নবজন্ম। শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী আজ শরতের স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক। শ্রীবিলাসকে তাই সে বলেছে— ''ঘরের গৃহিণীকে একেবারে গোড়া হইতে বানাইয়া লইতে হইবে, সেও তোমারই হাতে সৃষ্টি হোক—'। দামিনী-শ্রীবিলাসের দাম্পত্য জীবন স্বল্পায়ু। একদিক শচীশ অন্যদিকে শ্রীবিলাস। বাস্তব কারণেই স্বামী শ্রীবিলাসের প্রতি সে সুবিচার করতে পারেনি। গভীর আক্ষেপে দামিনী

শ্রীবিলাসকে বলেছে— 'সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের এক বৃন্তে দুটি ফুল - চিরাচরিত বিশ্বাসের সুস্পষ্ট ব্যত্যয় চতুরঙ্গে। প্রেমাস্পদের কাছে অকুণ্ঠ আত্মনিবেদন সত্ত্বেও দ্বিতীয় পুরুষকে অবলম্বন করে দাম্পত্য পূর্ণতা পেতে পারে—– এখানে এ সত্যটি প্রতিষ্ঠ। চোখের বালি আর শেষের কবিতার মধবর্তী চতুরঙ্গ উভয়ের প্রান্ত বিন্দুকে স্পর্শ করেছে। চোখের বালির যেখানে শেষ চতুরঙ্গের সেখানে আরম্ভ। আবার চতুরঙ্গই শেষের কবিতার ভূমিকা। চোখের বালির বিনোদিনীর বেদনা যেমন দামিনীর মধ্যে মুক্তি পেয়েছে তেমনি লাবণ্য-শোভনলালের বিবাহের সংকেত দামিনীর পরিণতিতে অর্থবহ।

শচীশ চরিত্রের প্রথম বর্ণনাটিই বিস্ময়ের সঞ্চার করে — তার জীবনের সত্য জিজ্ঞাসা শুধু মনে হয় দেহেও ফুটে উঠেছে — তার বর্ণনাটি সাধারণ বর্ণনামাত্র নয়, চরিত্রদ্যোতক "শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক - তার চোখ জ্বলিতেছে; তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা; তার গায়ের রং যেন রং নহে, তাহা আভা। শচীশকে যখন দেখিলাম অমনি যেন তার অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইলাম।"

শচীশের কাছে এখন আইডিয়াই বড় হয়ে উঠেছে — এই আইডিয়ার বিহ্বলতায় শচীশের মত্ততা কতদূর পৌঁছেছিল তার একটি দৃষ্টান্ত — "বুঝিলাম, শচীশ এমন একটি জগতে আছে আমি যেখানে একেবারেই নাই। মিলনমাত্র যে আমাকে শচীশ বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল সে আমি শ্রীবিলাস নয়, সে আমি 'সর্বভূত'— সে আমি একটি আইডিয়া।" পজিটিভিস্ট জ্যাঠামশায় জনকল্যাণ ও মানবহীতের বাস্তব কর্মনিষ্ঠার ভেতর দিয়ে তার আইডিয়াকে সার্থক করতে চেয়েছেন, লীলানন্দ স্বামী উচ্ছ্বসিত রসের সমুদ্রে উজান বেয়ে আইডিয়াকে ধরতে চেয়েছেন। সুতুরাং শচীশের আইডিয়া নিয়ে মত্ততাকে অপ্রাসঙ্গিক ও আকর্ষিক বলা যায় না। আইডিয়া সাধক শচীশ দামিনীর নারীত্বের বেদনাকে উপলব্ধি করতে পারেনি। জ্যাঠামশায় ও লীলনন্দ স্বামী— এঁরা দুইজন শচীশের জীবনের দুই বিপরীত প্রান্ত। এই দুই প্রান্তের সাধনাতে শচীশ সার্থক হতে পারেনি। দুইয়েরই অপূর্ণতা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে ঃ "সে বলিল, একদিন বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, সেখানে জীবনের সব ভার সয় না। আর একদিন রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তলা বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধিও আমার নিজের, রস যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না। একটা আশ্রয় না পাইলাম আমি শহরে ফিরিতে সাহস পাই না।" জ্যাঠামশায়ের নাস্তিকতা ও যুক্তিবাদ লীলানন্দ স্বামীর প্রেম ভক্তিময় উচ্ছ্বসিত রস সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়েও শচীশের অশান্ত সত্য জিজ্ঞাসা পরিতৃপ্ত হয়নি। দামিনী আবির্ভাব তার দ্বন্দ্বকে জটিলতর করে তুলেছে মাত্র। শচীশের পরবর্তী উপলব্দী তার একটি কথা থেকে জানা যায় ঃ "শচীশ বলিয়া চলিল, তিনি রূপ ভালো বাসেন তাই কেবলি রূপের দিকে নামিয়া আসিতেছেন। আমরা তো শুধু রূপ লইয়া বাঁচি না, আমাদের তাই অরূপের দিকে ছুটিতে হয়। তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমরা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে। একথাটা বুঝি না বলিয়াই আমাদের দুঃখ।" উপন্যাসের মধ্যে এটিই শচীশের চরম উপলব্ধি।

দামিনী

প্রথমনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্র সরণী'-তে বলেছেন, "বলাকার শিখর হইতে ফাল্গুনী ও পলাতকার ধারা নামিয়া আসিয়াছে — একটিতে যৌবনের নূতন আদর্শ আর একটিতে নারী জীবনের নূতন আদর্শ। 'পলাতকা' কাব্যের নারী নায়িকার দল মাতৃত্ব-প্রেয়সীত্ব, পত্নীত্বের ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়া এক সময়ে বিশুদ্ধ নারীত্বে আসিয়া উপনীত হয় — তখন বুঝিতে পারে 'আমি নারী, আমি মহীয়সী'।

নারী সত্তার পূর্ণ জাগরণের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — 'হে বিধাতা, আমারে রেখোনা বাক্যহীনা / রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।'[৪]

'চতুরঙ্গ'-এ শ্রীবিলাস দামিনীকে বর্ণনা করেছেন এইভাবে —"দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জপুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক করিয়া উঠিতেছে।" শচীশ তাঁর ডায়রিতে লিখেছে — "ননিবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি — অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে; পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন রসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মত লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে; সে কিছুই ফেলিতে চায় না, সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ, সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি পয়সা খাজনা দিতে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।" — এই দুটি বর্ণনার মধ্য দিয়ে দামিনীর প্রবল ব্যক্তিত্বময়ী সত্ত্বা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

বিনোদিনী যে বিধবা, ললিতা যে কুমারী, তাদের সমস্ত প্রণয়বাসনার মধ্য দিয়েও উপন্যাসে সে কথা কোথাও বিস্মৃত হওয়া যায় না। কিন্তু দামিনীর পরিচয় শুধু নারী হিসাবে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া দামিনীর বিবাহিত জীবনের বিবৃতিকেও দামিনীর বিদ্রোহী সত্ত্বার আভাস পাই। উপন্যাসে শিবতোষের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের মধুর রূপ কোথাও ফুটে না ওঠায় এদিক থেকে বিনোদিনী এবং দামিনীর মধ্যে একই বেদনার জ্বালা, কিন্তু তা সত্তেও পার্থক্য রয়েছে যথেষ্ট। অর্থাৎ দামিনীর মনে পূর্বের বিবাহিত জীবনের কোন সংস্কার দন্দ্বের সৃষ্টি করে নি।

যে দামিনী শিবতোষের জীবৎকালে যে দামিনী ভক্তের সেবায় অন্ন অখাদ্য রূপে প্রস্তুত করেছে, সেই দামিনীর ভক্তদের প্রতি দামিনীর সেবা এখন অতি মাধুর্যমন্ডিত রূপে দেখা দিল। শ্রীবিলাস দামিনীর এই রূপ বর্ণনা করেছে — "আত্মোৎসর্গের ফুলটি উপরের দিকে শিশির ভরা মুখটি তুলিয়া ধরিল।"

লীলানন্দস্বামীকে আশ্রয় করে শচীশ যে রসের জগতের জোয়ারে পাগল হয়ে আছে, সেই সুতীব্র অনুভূতিই দামিনীর সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছে। শচীশের ঘরে লীলানন্দস্বামীর ধ্যানমূর্তি তাই পড়ে আছে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে।

শচীশের ঘরের চৌকাঠে মাথা ঠুকে ব্যাকুল আর্তনাদের ফেটে পড়া প্রতিধ্বনিতে দামিনীর হৃদয়চাঞ্চল্যের রূপই ধরা পরে। এরপর দামিনী আবার আত্মনিবেদিতা হয়েছে যখন লীলানন্দ স্বামী, শচীশ এবং শ্রীবিলাসের সঙ্গে ভ্রমণে গেছে। সূর্যাস্তে সময় গোধূলির আবছা আলো-অন্ধকারে লীলানন্দ স্বামীর গানের সুরে মিলনের ইঙ্গিত দামিনীকে আবেশবিহ্বল করে দিয়েছে। কিন্তু যে মানুষকে ঘিরে দামিনীর এই বিহ্বলতা তাকে সে সংসারের মানুষ রূপে দেখতে চায় বলেই রসের সাগরে ডুবে থাকা শচীশকে সে নিয়ে আসতে চায় বাস্তবে তীরে। প্রেমের বিপুল উন্মাদনায় আচ্ছন্ন দামিনী তার তীব্র কামনা নিয়ে শচীশের কাছে গিয়েছিল নিজেকে সমর্পণ করতে। কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্ন শচীশ যে আদিম জন্তু তাকে গ্রাস করার আশঙ্কায় কন্টকিত হয়ে উঠেছিল, দামিনীর নিঃশব্দ অভিসার, তার সেই স্বপ্নময়তার মধ্যে সেই আদিম জন্তুর কী বিভৎস ক্ষুধার পুঞ্জরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাকে সে অর্ধানিদ্রামগ্ন অবস্থায় প্রাণ বেগে পদাঘাত করে বিতাড়িত করেছে। নিঃশব্দ ক্রন্দন নিয়ে দামিনী ফিরে এলো গুহা থেকে। শ্রীবিলাস যে দামিনীর মধ্যে 'স্থির সৌদামিনী' প্রত্যক্ষ করেছিল এখন আবার তার দাহ প্রবল হয়ে উঠল। কীর্তন আসরে যোগ দিয়ে শচীশ যেদিন তার অশান্ত মনকে শান্ত করার কথা ভেবেছে, সেদিন দামিনী শচীশকে ভর্ৎসনা করে বলেছে — "তোমরা আমাকে শান্তি দিবে ? দিনরাত্রি মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলিয়া পাগল হইয়া আছ, তোমাদের শান্তি কোথায় ? পাগল হইয়া আছো তোমাদের শান্তি, কোথায় ? জোড়হাত করি তোমাদের রক্ষা করো আমাকে— আমি শান্তিতেই ছিলাম। আমি শান্তিতেই থাকিব। .... আমার আশা তোমরা ছাড়িয়া দিলে তবেই আমি বাঁচিব।" এখানে দামিনীর প্রেম-পিপাসিত

নারী মনের জমে থাকা অভিমানের ঢেউ জেগে উঠেছে। নারী হৃদয়ের রহস্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীবিলাস বলেছে — "যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। .... মেয়েরা স্বয়ংবরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জন করে যারা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ, যারা স্থূলে সূক্ষ্মে মিশাইয়া তৈরী.......।" এবার শুরু হল শচীশের আত্মযন্ত্রণার পালা। দামিনীকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টার মধ্যে শচীশের আত্মবঞ্চনা ছিল। স্থানান্তরিত করার প্রস্তাবে দামিনীর দৃপ্তভঙ্গি — "তোমাদের কোন ভক্ত বা এক মতলবে এক বন্দোবস্ত করিবেন, কোন ভক্ত বা আর এক মতলবে আর এক বন্দোবস্ত করিবেন — মাঝখানে আমি কি তোমাদের দশ-পঁচিশের ঘুঁটি? .... আমাকে তোমাদের ভালো লাগিবে বলিয়া নিজের ইচ্ছায় তোমাদের মধ্যে আমি আসি নাই, আমাকে তোমাদের ভালো লাগিতেছে না বলিয়া তোমাদের ইচ্ছায় আমি নড়িব না।" এইভাবে অন্তরের দাহ নিয়ে দামিনী শচীশের সাধনায় ভাঙন ধরাল, আবার শ্রীবিলাসের সান্নিধ্যও বর্জন করল না। শ্রীবিলাসের প্রতি দামিনীর পক্ষপাতিত্ব শচীশকে এক গভীর দ্বন্দ্বের জগতে নিয়ে গেছে। দামিনী স্পষ্ট ভাবে সকলকে জানিয়েছে — "আমি সন্ন্যাসী নই......।"

ধীরে ধীরে কল্যাণময়ী নারী স্মৃতি জেগে উঠেছে তার প্রেয়সী রূপকে অতিক্রম করে। রবীন্দ্রনাথ সেই দামিনীকে বর্ণনা করেছেন — "দামিনীর যে অসহ্য দীপ্তি ছিল তার আলোটুকু রহিল, তাপ রহিল না। পূজায় অর্চনায় সেবায় মাধুর্যের ফুল ফুটিয়া উঠিল।" শচীশের জগতে দামিনীই একমাত্র সত্য হলেও শচীশ রূপময় জগতের উর্দ্ধে আর দামিনী হল 'জীবনরসের রসিক'। আবার দুজনেরই পূর্ণ আত্মোপলব্ধি হয়নি। নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যায় দামিনীর অন্তর্দাহ আবার বিদুৎশিখার মতো স্ফুরিত হয়ে উঠল। সে ব্যাকুলভাবে শচীশকে প্রশ্ন করল — "আমাকে বুঝাইয়া দাও তোমরা ব্যাকুলভাবে দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কি প্রয়োজন ? তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে ? .... রস যে কী সে তো আজ দেখিলে ? .... আগুন দিয়া আগুন নেভানো যায় না। .... ওই যে মেয়েটা মরিল রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। .... তুমি আমাকে এমন কিছু মন্ত্র দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিস — যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি।" 'চতুরঙ্গ' – এর সমকালীন রচনা বোষ্টমী (১৩২১) ছোটগল্পেও সমগ্র কাহিনির শেষে এই সত্যসন্ধানের ব্যাকুলতা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। বোষ্টমী বলছে — "পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসিয়াছিল, আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, আরেকটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি, আর ফাঁকি নয়।" যে ভালোবাসাকে বোষ্টমী 'নারায়ণ' বলেছে তাকেই শচীশের মধ্যে দিয়ে দামিনীও অন্তরে অনুভব করেছে।

প্রকৃতির পটভূমিতে দামিনীর মনের অসীম শূন্যতাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। যেদিন শচীশ ওপারে বালুর চরে চলে গেল এবং সমস্ত সূর্যাস্ত পর্যন্ত ফিরল না, অভুক্ত দামিনী শচীশের সন্ধানে ওপারে গেল। রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন — "চারিদিকে ধু ধু করিতেছে, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। রৌদ্র যেমন নিষ্ঠুর, বালির ঢেউগুলোও তেমনি। তারা যেন শূন্যতার পাহারাওয়ালা, গুঁড়ি মারিয়া সব বসিয়া আছে। ...... দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়াছে।" এ যেন দামিনীর অন্তরের চেহারা।

গুরুর নির্দেশ সে প্রশান্ত অনুদ্বিগ্ন চিত্তে অগ্রাহ্য করে, গুরুর ধর্মীয় উচ্ছ্বাসকে ব্যঙ্গ করে। কত জ্ঞানী গুন ব্যক্তি গুরুর কাছে মাথা নত করে, কিন্তু এই তরুণী তাকে সরাসরি অগ্রাহ্য করে। লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে নানা মানসিক জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের পর শচীশের কাছেও দামিনী 'সত্য' হয়ে ওঠে। এই সময়, 'দামিনী গানগুলিকে সাজায় না, গানগুলিই দামিনীকে সাজাইয়া তোলে।' 'এ মন করে দামিনী যখন স্থির সৌদামিনী হইয়া উঠিয়াছে শচীশ তাহার শোভা দেখিতে লাগিল। কিন্তু আমি বলিতেছি শচীশ কেবল শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।' আর দামিনীকে দেখলনা বলেই তার চোখে সুন্দরও বীভৎস হয়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ রাণীচন্দের সঙ্গে আলাপচারিতে তাঁকে জানিয়েছিলেন, 'Instinct-এর সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা বা ইচ্ছে সত্যিকারের পুরুষদেরই আছে। মেয়েরা এ পারে না। ওই জায়গায় মেয়েরা পিছিয়ে পড়ে আছে। শুধু তাই নয়, সমাজকেও পিছিয়ে রাখছে।" এই 'অপরাধে'র শাস্তি হিসেবেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ শচীশকে দিয়ে দামিনীর বুকে লাথি মারান সেই আশ্চর্য গুহাদৃশ্যটিতে 'Such a vivid metaphorical and at same time realistic representation of the elemental passion has got hardly any parallal in the

letterature of any country in the world."[৫] এবং এতখানি বিপ্লবাত্মক কর্মকান্ডের পরও দামিনী সম্পূর্ণ দায়টুকু নিজেই বহন করতে চায়। নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলে, 'সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল, তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে, বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভাল হইয়াছে' — এই বলে সে 'নিজের বুকে কিল মারিতে থাকে'। অথচ শচীশ তো শুধুই চৈতন্যের আধার ছিল না, দামিনী গুহান্ধকারে প্রবেশের আগেই তার মনে হয়েছিল, 'সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মত — তার ভিজা নিঃশ্বাস যেন আমার গায়ে লাগিতেছে। ...... মনে হইল সেই আদিম জন্তুটা আমাকে তার লালাসিক্ত কবলের মধ্যে পুরিয়াছে, আমার কোনদিকে আর বাহির হইবার পথ নাই।' এই 'আদিম জন্তু'-র বসতি কি শচীশেরই অবচেতনে নয় ? দামিনী শ্রীবিলাসকে বিবাহ করেছে, তাদের অসাধারণ বিবাহের পরও দামিনী গৃহিনী হয়না; সে শেষপর্যন্ত দামিনীই থেকে যায়। দামিনীর মৃত্যুর পর শ্রীবিলাসের উক্তি ঃ 'আমি তো গৃহী হইবার সময় পাইলাম না, আর সন্ন্যাসী হওয়া আমার ধাতে নাই, সেই আমার রক্ষা। তাই আমি যাকে কাছে পাইলাম সে গৃহিনী হইল না, সে মায়া হইল না, সে সত্য রহিল, সে শেষ পর্যন্ত দামিনী। কার সাধ্য তাকে ছায়া বলে ?'

দামিনী পরিপূর্ণভাবে মর্ত্যের সংসারের মানুষ শ্রীবিলাসের নীরব প্রেমকে লক্ষ করেনি, সে-তো শচীশকে জয় করকার দুর্বার বাসনাতেই। বারবার আঘাত পেয়ে তবেই সে অনুভব করেছিল যে কামনা দিয়ে প্রেমাস্পদকে হয়তো জয় করা যায়, তবে তাতে প্রেমের গৌরব থাকে না। তাই তার প্রেমের উত্তরণ ঘটেছে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে। 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের বহুপূর্বে লেখা 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যেও রবীন্দ্রনাথ প্রেমের এই মহানরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন —

শত ঋতু-আবর্তনে
শতদল উঠিতেছে ফুটি,
সুতীক্ষ্ম বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?

....

ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী—
চেয়ো না তাহারে।
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।[৬]

'মানসী' কাব্যের অন্তর্গত 'সুরদাসের প্রার্থনা'-র মত দামিনীর অন্তরেও সেই একই মন্ত্র অনুরণিত হয়ে উঠেছে।

"হৃদয়-আকাশে থাক্-না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনামলিন আঁখিকলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি—
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।।"

এই দামিনী শ্রীবিলাসের মৌন ভালবাসা অনুভব করতে পারল এবং শ্রীবিলাসকে বিবাহ করল। এখানে দামিনীর প্রেম গভীর উপলব্ধির পথ পেরিয়ে পূর্ণতা পেলেও তার জীবন পিপাসা অপরিতৃপ্তই রয়ে গেছে। তাই মৃত্যুকালে "যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে যেন আবার তোমাকে পাই।" অরূপকে অন্তরে বহন করে রূপের পাত্রে দামিনী অবগাহন করেছিল। সেইটাই ছিল তার কাছে পরম সত্যের রূপ।

দু'জনেই প্রাণশক্তিতে ভরপুর, দু'জনেই জীবন-উপভোগে আগ্রহী, সনাতন হিন্দুসমাজের বিধবা হলেও দুজনেরই রয়েছে বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবনযাত্রার প্রতি বিমুখতা। বিনোদিনীর এই বিমুখতা সুচিন্তিত আর দামিনীর বিমুখতার মূলে তার সহজাত প্রবৃত্তি।

শ্রীবিলাস দামিনীর সঙ্গে তার বিবাহ প্রস্তাবের গোড়া থেকেই 'সুখের প্রত্যাশা' ছেড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যেন শ্রীবিলাসের মধ্য দিয়ে সমাজকে শোনাচ্ছেন বিবাহের সেই আশ্চর্য ভাষ্য — বিবাহিত স্ত্রী শুধু ঘরের গৃহিনী মাত্র নয়। শ্রীবিলাস নিজেও কিন্তু অসাধারণ প্রাগ্রসরতার পরিচয় দিয়েছে। "অধিকারবোধ থেকে মুক্ত

বলেই শ্রীবিলাস দামিনীর বিবাহ প্রাতিষ্ঠানিকতা থেকে মুক্ত, সত্যের উপর তার প্রতিষ্ঠা। বিবাহ আছে অথচ বিবাহের বন্ধন নেই — শ্রীবিলাস-দামিনীর দ্বৈতজীবন তারই আনন্দময় ছবি, দিনগুলি তাই হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া" চলে যায়, তাদের দু'জনের কাজ 'দুইয়ে যেন গঙ্গা – যমুনার স্রোত'-এর মতো মিলতে পারে।

শিবতোষের প্রতি দামিনীর জমানো বিতৃষ্ণা বিদ্রোহের রূপ নিল গুরু লীলানন্দ স্বামীর বিরুদ্ধে। দামিনীর এই বিদ্রোহের সার সত্ত্বাটি যেন এই রবীন্দ্র-বাণীর সূতিকাগারে জন্মেছে —

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দ ময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

তবে তা রক্তমাংসের একটা বিশেষ মূর্তি ধরেছে দামিনীতে। সংস্পর্শের সূচনা থেকে দামিনী সম্পর্কে শ্রীবিলাসের মন উদ্‌গ্রীব ও কল্পনা-প্রবণ হয়ে উঠল। "এক একবার ভিতরের মহল হইতে একটি মেয়ের গলার উচ্চহাসি আসিয়া পৌঁছিত।....... হঠাৎ মনে হইত অনাবৃষ্টির মধ্যে যেন ঝরঝর করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। .... সেইখানেই রসের স্বর্গ।"

শ্রীবিলাসকে জয় করতে হয় না। সে সীমার মধ্যেই। কিন্তু তপস্বী একজনই— সে শচীশ। তপস্বীর তপোভঙ্গ করার মধ্যেই মর্ত্যের উর্বশীদের আত্মার তৃপ্তি। গুহার অন্ধকারে দামিনী কি শুধুই আসঙ্গ লিপ্সায় গিয়েছিল ? নিশ্চয়ই তা নয়, সন্ন্যাসীর ধ্যান ভাঙার জন্যে।

প্রেম, বন্ধুত্ব ভালোবাসা, সাহচর্য, পূজা, আসঙ্গলিপ্সা — এই শব্দগুলিতে নরনারীর চিত্তসংযোগের সব বর্ণ গন্ধ রূপ ধরা যায় না।

চিত্রকল্প

চতুরঙ্গের ভাষারীতি কাব্যময়তা তথা ব্যঞ্জনাশক্তিকে আশ্রয় করেছে, আশ্রয় করেছে গূঢ় সংকেতবহ উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপ সমৃদ্ধ প্রতীকী চিত্রকল্পময়তাকে। জীবনের অন্তঃবাস্তবতা বা 'ইনার রিয়ালিটির' রহস্যময় অন্বেষণ-চেতনা যখন কথা শিল্পের আধারে সমর্পিত হয়, তখন শিল্প স্রষ্টাকে এক ধরণের কাব্যময়তার আবহকে আশ্রয় করতেই হয়। আর সেই কাব্যময়তা কেবল গভীর ভাব বা অনুভবকে অবলম্বন করে গড়ে উঠতে তো পারে না, তার জন্য চাই উপযুক্ত ভাষা, যে ভাষায় নিহিত থাকে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ও অন্যবিধ বাক্প্রতিমা। বস্তুত এক্ষেত্রে এইসব অলঙ্কার বা চিত্রকল্প ভাষার গতিকে ব্যাহত করে না, বরং এ ধরণের কথা সাহিত্যের ভাব পরিমন্ডলকে কে চিরন্তনতার চেতনায় ব্যঞ্জিত ক'রে তুলতে সহায়তাই করে। এই সত্যের সমর্থন মিলবে মার্সেল প্রুস্ত এর সংহত উক্তিতে - 'Metaphor alone an give a sort of eternity to style'।[৭] ভাষার এই অন্তহীন ব্যঞ্জনাশক্তির পরিচয় চতুরঙ্গের শিল্পদেহের অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে আছে তবে বিশেষভাবে তার সন্ধান মিলবে উপন্যাসটির শেষ দিকে — যেখানে নায়ক শচীশের ব্যক্তিসত্তা আপন অন্তর্জীবনের গভীর রহস্যের উন্মোচণে ব্যাকুল। এসব ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ চিত্র আঁকতে গিয়ে লেখক যেসব উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক আশ্রয়ী চিত্রকল্পের প্রয়োগ করেছেন, তাদের অন্তর্নিহিত সাংকেতিক ব্যঞ্জনাশক্তির সাহায্যে পাত্রপাত্রীর মনের অবচেতন স্তরের নানা রহস্যময় দিক আভাসিত হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

*ক) সেই গুহার অন্ধকারটা যেন একটা কালো জন্তুর মতো। সে যেন আদিমকালের প্রথম সৃষ্টির প্রথম জন্তু।[৮] *খ) স্পষ্ট দেখিতেছি, শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর দিক পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল।[৯]

*গ) যেন একটা মড়ার মাথার প্রকান্ড ঔষ্ঠহীন হাসি, যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা মস্ত একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে[১০]

*ঘ) সমস্ত আকাশটা অন্ধ ছেলের মতো ভয়ে হিম হইয়া উঠিতেছে। বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না।[১১]

বলাবাহুল্য, পূর্বোক্ত উপমা-উৎপ্রেক্ষা যুক্ত চিত্রকল্পধর্মী ভাষার ব্যঞ্জনাশক্তির সাহায্যে লেখক পাত্রপাত্রীর মনের যে রুদ্ধ কামনা, অস্থির চিত্তবিক্ষেপ কিংবা হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণা-আর্তির ইঙ্গিত দিতে সমর্থ হয়েছেন, তা থেকেই এই বিশেষ ভাষারীতির সার্থকতার নিশ্চিত সাম্য মেলে।

এই খন্ডে শচীশের পরপর সেই প্রকৃতির যে কয়েকটি পরিদৃশ্য চিত্রিত হয়েছে, তার মধ্যে সেই চরিত্রের স্পষ্ট ইঙ্গিত আমরা পাই।

প্রথম চিত্রটি নির্জন নদীর বালুচরে কোন এক ঈশ্বরবর্জিত স্থানে। তার সেবা এবং সাহচর্যলাভ করবার আশায় দামিনী যতই তার জননীসত্তায় এই উন্মার্গগামী মানবশিশুকে সেবাযত্নে রাখতে আগ্রহী, সে ততই সুযোগমাত্রই পলাতক হয়েছে। নদীর এই বিস্তৃত চরে জনপ্রাণীহীন, সীমা হীন বালুতরঙ্গের সর্বত্র একটা শূন্যতার পরিবেশ "যেন একটা মড়ার মাথার প্রকান্ড ওষ্ঠহীন হাসি; যেন দয়াহীন তপ্ত আকাশের কাছে বিপুল একটা শুষ্ক জিহ্বা একটা তৃষ্ণার দরখাস্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।"

অভুক্ত নারী তার খাবার নিয়ে সেই দুর্গম স্থানে বহু কষ্টে উপস্থিত ঃ

দামিনীকে দেখিয়া শচীশ বলিয়া উঠিল, এখানে কেন ?

দামিনী বলিল, খাবার আনিয়াছি।

শচীশ বলিল, খাইব না।

দামিনী বলিল, অনেক বেলা হইয়া গেছে।

শচীশ কেবল বলিল, না।

দামিনী বলিল, আমি না হয় একটু বসি,

তুমি আর-একটু পরে —

শচীশ বলিয়া উঠিল, আহা কেন আমাকে তুমি —

হঠাৎ দামিনীর মুখ দেখিয়া সে থামিয়া গেল। দামিনী আর কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া

চলিয়া গেল। চারিদিকে শূন্য বালি রাত্রিবেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝকঝক করিতে লাগল।[১২]

এ কি সাধক শচীশের প্রতিচিত্র, না মাত্রাতিরিক্ত আদরে মাতৃলালিত, খেয়ালখুশি চালিত, উচ্ছৃঙ্খল এক মমত্বহীন যুবকের ঘৃণ্য স্বভাবচিত্র ? সাধকের প্রেরণা যদি তাকে গৃহছাড়া করে থাকে, তার মতো একটি স্বাধীন ব্যক্তিত্ব কেন সেই উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করে অন্যত্র নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে সাধনামার্গে নিজের জীবন কাটালেন না ? কেন দামিনীর সাহচর্যকেন্দ্রিক এই উদ্ভট জীবনযাত্রা ? এই কি মোক্ষকামী সাধকের রূপরেখা?

আর একটি চিত্ররূপ —

সেদিন কষ্টকর গুমোটের পর রাত্রে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। মুষলধারায় সেই বৃষ্টির মধ্যে সেই গভীর অন্ধকার রাত্রে "নদীর ঢেউয়ের ছলচ্ছল আর আকাশের জলের ঝরঝর" শব্দের মধ্যে শোনা গেল "বাঁশবনের মধ্যে যেন একটা বিধবা প্রেতিনীর কান্না, দূরে নদীর পাড় ভাঙার হুড়মুড় শব্দ, চারিদিকে যেন একটা জন্তুর হু হু চিৎকারধ্বনি। এমনি সময়ে বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোকে দামিনী দেখল, শচীশ নদীরধারে দাঁড়িয়ে। প্রাণপণ শক্তিতে দামিনী সেখানে পৌঁছে শচীশের পা ছুঁয়ে বলে, আমাকে লাথি মারিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিতে চাও তো ফেলিয়া দাও, কিন্তু তুমি ঘরে চলো"।

শচীশ বাড়ি এসেছে, তারপর দামিনীকে !

যাকে আমি খুঁজিতেছি, তাকে আমার বড় দরকার — আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী তুমি আমাকে দয়া করো — তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।

দামিনী একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর বলিল, তাই আমি যাইব।[১৩]

অতঃপর খন্ডাকারে শেষ দৃশ্যটি।

রক্তঝরা অন্তর নিয়ে দামিনী শচীশকে ত্যাগ করে শ্রীবিলাসকে অনুরোধ করেছে, তাকে কলকাতায় পৌঁছে দিতে। দামিনী আশ্রয়হীনা, এই অবস্থায় শ্রীবিলাস প্রস্তাব দেয় তার সঙ্গে বিবাহের। অনেক ভেবে দামিনী স্বীকৃত এবং তারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। এ বিবাহে কন্যা দান করে দামিনীর গুরু শচীশ এবং বৌভাতেও সে যোগ দেয়। শচীশ কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় গেল, কাহিনিতে তার আর ইঙ্গিতমাত্র নেই। তার গতিবিধি ছায়াবৃত্ত করে রাখলেই কি তাকে মোক্ষসন্ধানী সাধকরূপে প্রতিপন্ন করা যায় !

দামিনী-শ্রীবিলাসের সম্মিলিত চেষ্টায় কোলাহলমুখর কলকাতা মহানগরীর এক প্রান্তে তারা একটি নতুন জীবন কাটিয়েছে, টানা একটি বছরের মধুযামিনী। এই একটি বছরের সুরভি-ভরা দাম্পত্য-জীবনের শেষে দামিনী কঠিন রোগে আক্রান্ত হল। সেই আদিম গুহায় আদিম অন্ধকারে সুন্দরের লাথি খেয়ে যে অসুন্দরটা সারারাত যন্ত্রণায় গুমরে গুমরে কেঁদেছিল, তারই ফলশ্রুতি এই বুকে ব্যথা। সেই আঘাতটা ব্যাধির রূপ নিয়ে আজ পূর্ণ আকারে দেখা দিয়েছে, দুরারোগ্য ব্যাধি।

বৎসরান্তে সেদিন পূর্ণিমার রাত্রি। দামিনী শ্রীবিলাসের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল, "সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।"

মনে হয়, 'চতুরঙ্গ'-এর কাহিনী যেন দামিনী-কেন্দ্রিক। শচীশের মোক্ষলাভের বিষয়, কোথায় তার কীভাবে অবস্থান, তার কোন উল্লেখ প্লটে নেই।

ভাষার বন্ধন

রবীন্দ্র-উপন্যাস-সাহিত্য 'চতুরঙ্গ'-এ ফর্ম ও কন্টেন্টের মেলবন্ধন যেমন বিস্ময়কর তেমনি উপন্যাসটির ভাষারীতির স্বকীয়তাও উল্লেখযোগ্য, উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে দেখি, 'গোরা'-য় পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ বিবৃতি অংশে সাধুভাষা অব্যাহত রাখলেও সংলাপের ভাষাকে চলিতে রূপান্তরিত করেছেন। আর 'ঘরে-বাইরে'-তে সমগ্র উপন্যাসই চলিত ভাষায় রচিত। আর চতুরঙ্গে 'বিবৃতি' ও 'সংলাপ' উভয় অংশেই সাধুভাব প্রযুক্ত হয়েছে। যদিও চতুরঙ্গে বাইরের সাধুভাষা রূপের অন্তরালে চলিতরীতির প্রাণধর্ম স্পন্দিত হয়েছে। সমাপিকা ক্রিয়াপদের প্রয়োগ সীমিত করার প্রবণতা (শচীশের একি চেহারা !, "চোখ দুটো কেমনতরো, চুল উস্কো-খুস্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।'[১৪]), চলিত সর্বনাম পদের অজস্র ব্যবহার (তা, তাকে, তার যাতে ইত্যাদি) কিম্বা সাধু ভাষার সঙ্গে যথেষ্ট ইডিয়ম-ধর্মী কথ্য শব্দের বা চলিত ক্রিয়ার প্রয়োগ 'ফস্ করিয়া', 'পা টেপানো' 'পেটমোটা পুরুত পান্ডা', 'ঝুড়ি ঝুড়ি বোঝা', 'বেরো', 'গেছে')-এর সাহায্যে উপন্যাসের ভাষাকে বাস্তব জীবনের কাছাকাছি আনতে চেয়েছেন লেখক। বাইরের সাধুরীতির আড়ালে এর আসল 'প্যাটার্ন' চলিত রীতিরই। রবীন্দ্র-ভাষায় 'কথিত ভাষার রসটুকু' ও পুঁথির ভাষার সম্ভ্রমটুকু রক্ষা' করার জন্য নয়। উপন্যাসের নিজস্ব আন্তর প্রয়োজনের টানেই এর মাধ্যম হিসেবে বিবৃতি ও সংলাপ উভয় অংশেই এই আপাত' সাধুভাষাকে গ্রহণ করেছেন লেখক।

সবুজপত্রের পাঠে 'শচীশ' অংশের ৪-সংখ্যক পরিচ্ছেদে "আজ মনে হইল শচীশ নেশা করিয়াছে" -— এই অংশের পরে ছিল—

"সকাল বেলাকার শুকতারার মত তার যে দুটি চোখ হইতে জাগরণের আলো ঠিকরাইয়া পড়িত সেই চোখে আজ স্বপ্নের গোলাপী আভা তার উপরে ছলছল বাষ্পের প্রভা।" অপ্রয়োজনীয় আবেগযুক্ত কাব্যময় ভাষা বর্জন করে বক্তব্যকে সংহত করার জন্যই, গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বর্জিত হয়েছে। ভাষাকে সংক্ষিপ্ত-সংহত রূপে প্রকাশ প্রবণতার পিছনে যাকে এক দৃঢ় মনন-চেতনা, বুদ্ধি-উজ্জ্বল মানসিকতা। চতুরঙ্গের ভাষায় এই সংহত বুদ্ধি দীপ্তির প্রকাশ সুস্পষ্ট। 'সবুজপত্র'-পাঠের অংশে যে অপ্রয়োজনীয় কাব্য-প্রবণতাকে লেখক পরে প্রথম সংস্করণে বর্জন করতে চেয়েছেন, তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে চতুরঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাক্‌রীতিতে কাব্যধর্মের বিরোধী। আসলে এই উপন্যাসের ভাষায় নিহিত যে কাব্যধর্ম, তা একান্ত নিগূঢ়, তা ব্যঞ্জনাশক্তিতে অপরূপ। এই কাব্যধর্মী ব্যঞ্জনাগুণ উপন্যাসটির বিষয়-বিন্যাসের সঙ্গে একাত্ম, উপন্যাসের ভাবভূমি থেকেই এই কাব্য ব্যঞ্জনার সৌরভ উৎসারিত। আসলে, আধুনিক কালের জীবন বিষয়ক বক্তব্য প্রকাশের উপযোগী শিল্পরীতি ও ভাষাভঙ্গি খুঁজতে গিয়ে একালের তাবৎ লোকরাই প্রচলিত পুরনো পথ বর্জন করতে চেয়েছেন। সেই নতুন ভাষারীতির নিহিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে প্রধান একটি হল গূঢ় কাব্য ধর্মিতা;
"Such writers seek a radical transformation of conventional forms of communication through which to express peotically an inner crisis of sensibility"[১৫] চৈতন্যের গভীরতম সঙ্কটকে Communicate করার উপযুক্ত এক মাধ্যম হল 'to express poetically'। বস্তুত এই কাব্যময় প্রকাশরীতির প্রকৃত তাৎপর্য হল উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর গভীরতম ভাবকে সঙ্গীত ও চিত্রকল্পধর্মী ও সূক্ষ্মব্যঞ্জনাময় শব্দযুক্ত ভাষায় বিবৃত করা। আধুনিক উপন্যাসের ভাষারীতির এই ব্যঞ্জনাধর্ম সম্পর্কে ভার্জিনিয়া উলফ্-এর প্রাসঙ্গিক উক্তি প্রণিধানযোগ্য,
"Power of suggestion is one of the most mysterious properties of words".[১৬] ঘরে বাইরেতে কথ্যভাষা ব্যবহারের পূর্বে তিনি 'যুরোপ প্রবাসীর পত্র' 'ছিন্নপত্র', 'শান্তিনিকেতন' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি চলিত ভাষায় রচনা করেছেন। আরো স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমকালে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে যে 'প্রাণবন্ত জীবন্ত ভাষায় চলিত বাংলায় স্বামীজী বঙ্গসাহিত্যের কেবল নবরূপ দিয়েছেন", এ তথ্য কবি নিজেই অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনকে জানিয়ে বিবেকানন্দের ঐ গ্রন্থটি পড়তে পরামর্শ দিয়েছিলেন[১৭]

উল্লেখপঞ্জী

১। 'Tagore as a Novelist', Century, Vol. p.97.

২। ১০ই বৈশাখ ১৩৩২, ১৯২৫ ইং।

৩। উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪। মহুয়া, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫। Heroines of Tagore - B.B. Majumdar 1968, P.241; শচীশের ডাইরি থেকে পাওয়া এই অংশটির প্রেরণা-উৎস.... নিবেদিতারই ডাইরি— যা ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় ব্রহ্মবাদির পত্রিকায়, ১৯০৬—১৯১০-এর মধ্যে ঃ নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ—জ্যোতির্ময় ঘোষ, ১৯৯৫ পৃঃ ৯৪।

৬। নিষ্ফল কামনা।

৭। Leon Edel -এর 'The Psychological Novel 1900-1950, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৯০।

৮। শচীশ অংশ, ১০ম পরিচ্ছেদ।

৯। শ্রীবিলাস-অংশ, ২য় পরিচ্ছেদ।

১০। ঐ – ঐ।

১১। ঐ – ৪র্থ পররিচ্ছেদ।

১২। শ্রীবিলাস, ২/৩৯৫।

১৩। ঐ, ৪/৩৯৯।

১৪। দামিনী অংশ ৪-সংখ্যক পরিচ্ছেদ

১৫। anguage of Fiction, David lodge-1966, P-244 ;

১৬। Craftsmanship : Collected Essays-Virginia woolf, vol. II. 1961. P-248;

১৭। স্বামী পূর্ণাত্মনন্দ, স্মৃতির আলোয় স্বামীজী, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃঃ ২০২।

ঘরে-বাইরে

পূর্বাভাস

১৩ই মে ১৯৩১ তারিখে শ্রীমতী হেমন্তবালা দেবীকে লিখিত পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ "......... সাহিত্যে বিচারবুদ্ধিতে তুমি যে প্রশস্ত আদর্শ পেয়েছ তা আমি মনে করিনে। না পাবার প্রধান কারণ বাংলা সাহিত্যেকে তুমি বাংলা সাহিত্যের বাহির থেকে দেখতে পাওনি। য়ুরোপীয় সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বসাহিত্যের যে প্রকাশ আছে ঘটনাক্রমে তার পরিচয় তোমার কাছে নেই। অথচ আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে ভিতের উপর তার বাসা ফাঁদছে সে ভিৎটা য়ুরোপীয়।"[১] ঘরে-বাইরের মধ্যে আমরা পাশ্চাত্য চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাসের কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পাই। দৃষ্টির অন্তমুর্খিতা এবং অন্তররহস্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে বিমলা, সন্দীপ ও নিখিলেশের বক্তব্য বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মগ্নচৈতন্যের গভীর থেকে তুলে আনা অনুভূতি ও সংবেদনা ব্যথা ও অভিজ্ঞতা এবং জীবন-জিজ্ঞাসার সহস্র আর্তি অন্তরচারণার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হয়েছে। আত্মমগ্নতা, অন্তর্বিশ্লেষণ ও আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটনে কুণ্ঠাহীনতা এ উপন্যাসের আকর্ষণ। "প্রসঙ্গ 'ঘরে-বাইরে" প্রবন্ধে[২] স্নেহময় সিংহরায় বলেছেন — "রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের সঙ্গে মিশেছিল তাঁর মনন শীলতা নন্দনতত্ত্ব – চেতনা ও বৈদগ্ধ্য। এই গুণাবলী তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে সঞ্চারিত হয়েছে। তাই বিমলা সন্দীপ নিখিলেশ— কেউই একেবারে সাধারণ নয় এবং এ জন্যেই তারা বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রসমূহ থেকে স্বতন্ত্র। সমালোচক Thompon রবীন্দ্র নাটক সম্বন্ধে, সাধারণভাবে এগুলি 'Vehicle for ideas' বলে মন্তব্য করেছেন। চরিত্রের আত্মমগ্নতা থেকে তুলে আনা বক্তব্য, চেতনা প্রবাহের গভীরতা থেকে বর্হিজগতে টেনে আনা স্বীকারোক্তি এবং অন্তরচারিতার রহস্য-উন্মোচনে রবীন্দ্র-দর্শনের নিজস্বতা ও তার সৃজনশীলতার ক্রিয়া অবশ্যই তাঁর উপন্যাসেও গুরুত্ব অর্জন করেছে।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণরীতিতে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে ক্রমভঙ্গ, যা লেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী এসেছে – শিল্পগত কোনো স্খলন নয়, একটা বিশেষ শিল্পভঙ্গি। চতুরঙ্গের মতোই ভাষারীতিতে অলঙ্করণের প্রাচুর্য, বক্র বুদ্ধিদীপ্ত বৈদগ্ধ্য।

আঙ্গিকের দিকে ঘরে-বাইরে-তে তিনটি চরিত্রের জবানিতে গল্প বলা হয়েছে। বঙ্কিম বাংলায় এই রীতির প্রবর্তন করেন রজনী' উপন্যাসে। তিনিও বিলেতী লভেল থেকে ধার করেই যে এই রীতিটি নিয়ে এসেছিলেন – সে কথা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন। এই রীতির বাইরের অভিনবত্বের চেয়ে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ হল ভেতরের দিক থেকে জটিলতা – সৃষ্টির সম্ভাবনায়, ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন জনে বলছে। একই ঘটনা যদি তিনজন তিনভাবে বলে তো তাদের ব্যক্তিত্বের পৃথক রং লেগে তার তিনটে স্বতন্ত্র রূপ দাঁড়াবে।

গুরুতর আহত হয়ে নিখিলেশ পালকিতে ডাক্তার-সহ প্রত্যাবর্তন করেছে, দেওয়ানজির প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার তার জীবন-মরণ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেননি, শিল্পরূপেও তার বিশেষ ইঙ্গিত কিছু পাওয়া যায় না। এই থেকে শ্রীকুমার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, "বোধহয় নিখিলেশের চরমদন্ড ঔপন্যাসিক বিধান করেন নাই।"[৩] অন্যান্য রবীন্দ্র সমালোচকরাও প্রায় সকলেই প্রকারন্তরে এই মতামতের পুনরাবৃত্তি করেছেন। কিন্তু প্রভাতকুমার বিমলা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, "অপযশের পশরা মাথায় করিয়া অবশেষে তাহাকে নিরাভরণ বিধবারূপে নিষ্ঠুর জগতে একাকী দাঁড়াইতে হইল। নিঃসন্তান জীবনের একমাত্র সম্বল থাকিল আদর্শ নিষ্ঠু স্বামীর স্মৃতি।"[৪]

আমাদের মনে হয়, প্রভাতকুমারের মতই অভ্রান্ত। শিল্পরূপে প্রত্যক্ষ তথ্য না পাওয়া গেলেও প্রথম পরিচ্ছেদেই বিমলার আত্মকথায় পাই। "যেটা নিঃশ্বাসের মতো সহজ ছিল, সেটাকে কাব্যকলার মতো করে

গড়ে তোলার উপদেশ আসছে। এখানের ভাবুক পুরুষেরা সধবার পাতিব্রত্যে এবং বিষধর ব্রহ্মচর্যে যে কি অপূর্ব কবিত্ব আছে, সেকথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বলছেন।"

এখানের ক্রিয়াপদ ব্যবহার দেখে মনে হয়, উপন্যাসের কাহিনিটি নিখিলেশের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত। তখন বিমলার জীবনে অনন্ত অন্ধকার নেমে এসেছে।

যতীন্দ্রমোহন সিংহের মন্তব্যটি স্মরণ করা যাক, 'কবি অবশ্যই স্কুলমাস্টারী করিতে বসেন নাই, এবং তাঁহার নিকট আমরা কোন উচ্চশিক্ষার আশা করি না। কিন্তু এই পূতিগন্ধময় কাব্যরচনা করিয়া সমাজের নৈতিক বায়ু কলুষিত করিবার তাঁহার কোন অধিকার আছে কিনা ইহাই সুধীগণের বিবেচ্য।'

বিরুদ্ধতা এত প্রবল ছিল যে কবিতা লিখেও ঘরে-বাইরেকে আক্রমণ করা হয়। প্রবাসীতে 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধে রবীন্দ্র বেশ একটু মজা করেই তা উল্লেখ করেছেন, "এক জায়গায় দেখিলাম ঘরে-বাইরে সম্বন্ধে ক্ষোভ চোদ্দ অক্ষরের লাইনে লাইনে রক্তবর্ণ হইয়া ফুটিয়াছে। ইহাতে পদ্যসাহিত্যের বিপদ চিন্তা করিয়া উদ্‌বিগ্ন হইলাম।' অদ্ভুত নালিশ শোনা যায় যে সীতা প্রতি রবীন্দ্রনাথ অসম্মান প্রকাশ করেছেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথ রঙ্গভরা স্বরটি অক্ষুন্ন রেখে উত্তর দিয়েছেন, "আমি কৈফিয়ত-স্বরূপ বাল্মীকির দোহাই মানিব, তিনি কেন রাবণকে দিয়া সীতার অপমান ঘটাইলেন। তিনি তো অনায়াসেই রাবণকে দিয়া বলাইতে পারিতেন যে, মা লক্ষ্মী, আমি বিশ হাতে তোমার পায়ের ধুলা লইয়া দশ ললাটে তিলক কাটিতে আসিয়াছি।" পৌরাণিক, ধর্মীয় প্রসঙ্গে আমাদের দেশের সহিষ্ণুতা বারবারই কীভাবে লুপ্ত হয় সে বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে অনাবশ্যক দীর্ঘতা এসে পড়বে। মোটকথা ঘরে-বাইরে রক্ষণশীল বঙ্গীয় পাঠক সমাজ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেনি।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে কার্জনের শাসনকালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আনেন। সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ১লা আগস্ট ১৯০৫ বয়কট আন্দোলনের প্রস্তাব আনেন। ৭ আগস্ট টাউন হলে বিশাল জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত হল। ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ বঙ্গবিভাগ হবার দিন দেশবাসী উপবাস পালন, রাখীবন্ধনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানালেন। ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গেল নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধে। অন্যদিকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদ, ধর্মীয় ভাবাবেগ জড়িয়ে গেল আন্দোলনে। হিন্দুধর্ম হিন্দুজাতীয়তা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা হয়ে দাঁড়াল। এবং ১৯০৬ সালে ঢাকাতে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হল। ব্রিটিশের চাল সফল হবার পথে চলল, বিভেদের যে বীজ তারা বুনেছিল তা বিষবৃক্ষ হয়ে উঠবে পরে। বিদেশি দ্রব্য বর্জনের জুলুম, পিকেটিং, সাধারণ ব্যাপারীর ক্ষতি এবং সন্ত্রাসবাদকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিন সমর্থন করেন নি। দেশ ও মায়ের সমীকরণ করে ভবানীপূজা, কালীপূজার সঙ্গে দেশপূজাকে এককার করে ফেলার আদর্শকে তিনি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। ১৮৪৩ সালে ডিসেম্বর মাসে দেবন্দ্রেনাথ পৌত্তলিক হিন্দুদর্ম ত্যাগ করে ব্রহ্ম-প্রতিপাদক ঔপনিষদিক একেশ্বরবাদ-ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। মহর্ষি 'আত্মজীবনী'-তে লিখেছেন, "পরে আমার অনুরোধ জগদ্ধাত্রী পূজাটা উঠাইয়া দিতে আমার ভ্রাতারা সম্মত হইলেন। সেই অবধি জগদ্ধাত্রী পূজা আমাদের বাড়ি হইতে চিরদিনের জন্য রহিত হইল। দুর্গাপূজা চলিতে লাগিল। আমি সেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের সময় হইতে দুর্গোৎসবে বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে যে আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজো তার শেষ হইল না। এখনো আশ্বিন মাস আসিলেই আমি কোথাও না কোথাও চলিয়া যাই।"[৫] নিষ্ঠাচারী ব্রাহ্ম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সমান নৈষ্টিক ব্রাহ্ম, মূর্তিপূজার বিরোধী। আমাদের মনে হয় পিতৃদত্ত সেই জীবন দৃষ্টি তাঁর রচনায় নানাভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যেমন এখানে। ধূর্ত, প্রবঞ্চক সন্দীপ বিমলাকে দেবী দুর্গা-জগদ্ধাত্রীরূপে বন্দনা করে যখন তার পতন সম্পূর্ণ করেছে, এবং স্বার্থ-সিদ্ধির আনন্দে বলেছে — এই তো হিপনটিজম। এই শক্তিই পৃথিবী জয় করবার শক্তি। কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সম্মোহন। কে বলে সত্যমেব জয়তে। জয় হবে মোহের। বাঙালি সেকথা বুঝেছিল, তাই

বাঙালি এনেছিল দশভূজার পূজা, বাঙালি গড়েছিল সিংহবাহিনীর মূর্তি। সেই বাঙালি আজ মূর্তি গড়বে; জয় করবে বিশ্ব কেবল সম্মোহনে। বন্দেমাতরং।

ঘরে বাইরের ঘটনাকাল ১৯০৫–১৯০৭ আর রচনাকাল ১৯১৪–১৬। এই দুই কালের মধ্যে যোগাযোগ আছে। লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি, সমাজনীতি, জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ছায়া ফেলে গেছে। সে দিক দিয়ে এই উপন্যাশের অন্তরর্বয়ন যথেষ্ট জটিল। একদিকে আছে বিমলা–নিখিলেশের জীবনে ঘর ও বাহিরের যোগসূত্র, বাইরের পটে ঘরকে স্থাপন, অন্যদিকে আছে আরেক ঘর ও বাহির, বিশ্বের পটে ভারত।

বিমলার চতুর্থ আত্মকথাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করতে চাই। দুটি ভিন্ন আদর্শ, দুই পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিমলার মনে হয়েছে— "দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল !... আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখতে পেয়েছি আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারই মতো একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েছে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলেনা, সে চলেছে সামনের অন্ধকারে; একটা দ্বীপ জ্বেলে নেবারও সবুর সয়নি। ... এ আজ অভিসারিকা। এ আমাদের বৈষ্ণব-পদাবলীর দেশ। এ ঘর ছেড়েছে, কাজ ভুলেছে। এর আছে কেবল অন্তহীন আবেগ,... আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। আমি ঘরও হারিয়েছি, পথও হারিয়েছে। উপায় এবং লক্ষ্য দুই-ই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ আর চলা।"

চরিত্র

বিমলা

বিমলার চরিত্র বিশ্লেষণের পূর্বে একটি বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সন্দীপ ও নিখিলেশ সমকালীন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের আত্মকথা লিপিবদ্ধ করেছে। কিন্তু বিমলা সমস্ত কিছু ঘটে যাওয়ার পর তার অতীত স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে আত্মকাহিনি বলেছে যে উত্তাল তরঙ্গপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তার জীবন ছুটে চলেছিল, সেই জীবন যখন নিস্তরঙ্গ হয়েছে, তখন সে ধীরভাবে আত্মসমীক্ষার সুযোগ পেয়েছে। তাই তার সমগ্র কাহিনিতে আবেগ অপেক্ষা একটি স্থির ব্যক্তিগত অনুভূতি পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।

মায়ের ভক্তি-বিনম্র স্নিগ্ধ মূর্তি বিমলার বাল্য-কৈশোর জীবনের মধ্যে মধু সিঞ্চিত করেছে। সাবেক নিয়মে বাঁধা শ্বশুর পরিবারের মধ্যে স্বামী নিখিলেশ একালের মানুষ, তার বিদ্যাবত্তা ও মানসিকতাও একালের আলো-হাওয়ায় পুষ্ট। যে অভিজাত পরিবারের ছোট ছেলে নিখিলেশ, সেখানে মদের ফেনা ও নটীর নূপুর নিক্কণের ছন্দেই পুরুষদের ভোগসঙ্কুল জীবন আবর্তিত হত। নিখিলেশ তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বিমলার মন স্বামীকে পুজো করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত, কিন্তু নিখিলেশের কোন প্রশ্রয় ছিল না সেখানে, বিমলাই তার মত জানিয়েছে ঃ "আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন, স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।"

প্রতিনায়ক সন্দীপের দৃষ্টিতে তার "লম্বা ছিপছিপে গড়ন, যাকে আমাদের রূপরসজ্ঞরা নিন্দে ক'রে বলে ঢ্যাঙা।" "ওর রঙ শ্যামলা, কিন্তু সে যে ইস্পাতের তলোয়ারের মতো শ্যামলা, কী তেজ, আর কী ধার।" স্বামী নিখিলেশও মন্তব্য করেছে, "বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেই জন্যে এই ন-বছরের (বিবাহিত জীবনে) এক মুহূর্তের জন্য সে আমার কাছে পুরনো হয়নি।"

বিমলা সন্দীপের মধ্যে দেশমাতৃকার বীর সন্তানকে দেখতে পেল। বীরপূজা আর স্বদেশীর ছদ্মবেশে প্রেম প্রবেশ করল। বিমলা চরিত্রে দোটানা মানসিকতা, সংযত হবার চেষ্টা আবার হৃদয়াবেগ, স্বদেশী উত্তেজনা, স্তবস্তুতি, দেবী-পদের লোভে বিবেকের বাঁধভাঙা প্রভৃতি যত্ন করেই আঁকা হয়েছে।

কাহিনির ১৬ নং অংশে বিমলা যে ভাষায় বিগলিত চিত্তে, প্রবঞ্চক জেনেও, তার হাতে গয়নার বাক্স তুলে দিয়েছে তা যেন ভাবনা-নিরপেক্ষ আত্মনিবেদনের প্রতীক।

"...... ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নায়িকা বিমলার পরিচয় তো কেবল বধূ রূপেই নয়, আসলে সে কঠিন আত্মজিজ্ঞাসায় আর্ত দীর্ণ এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি, যার 'moral awareness' -এর মূল সামাজিক স্তর পেরিয়ে সত্তার আরো গভীরে নিহিত।"[৬]

নিখিলেশের অপরিমিত ভালবাসায় ও শ্বশুরবাড়ীর অকুণ্ঠ প্রশ্রয়ে একটি বোধই তারমধ্যে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল যে বিমলা জন্মাবধিই সৌভাগ্যের অধিকারিণী। আত্মস্মৃতি রোমন্থনকালে বিমলা বলেছে, "এই সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান করব কোন ফাঁকে। আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল। প্রেম তো স্বভাববৈরাগী; সে যে পথের ধারে ধূলার পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সে তো বৈঠক-খানার চিনের টবে আপনার ঐশ্বর্য মেলতে পারে না"। বিমলার হৃদয়তন্ত্রীতে যে ভক্তির সুর বেজে উঠত, তাকে নিখিলেশ সহাস্য দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছে, কিন্তু তার অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারেনি, বিমলা তার নিজের ও নিখিলেশের প্রেমকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে বলেছে "প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাওনি সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলেই ভাল করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালো বেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাইনি তা দিয়ে ভালোবেসেছ—

আমার ভালোবাসায় তোমার চোখের পাতা পড়েনি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি–আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ — যেন সে তোমার সৌভাগ্য। এতে আমার মনে গর্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারই ঐশ্বর্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। তখন রাণীর সিংহাসনে বসে মানের দাবি করি, সে দাবি কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ, ভক্তির মধ্যে সেই গর্বকে ভাসিতে দিয়ে তবে তার রক্ষা। শংকর তো ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্য তপস্যা না করতেন?” অনেক অভিজ্ঞতার আগুনে দগ্ধ বিমলার এই দীর্ঘ সমীক্ষার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মনস্তত্ত্বের এক গভীর ইঙ্গিত দিয়েছেন। বিমলা চাইবার আগেই অপরিমিত প্রণয়ের অধিকারিণী হয়েছে, তার প্রেমে সাধনা ছাড়াই সিদ্ধি এসেছে। কিন্তু যেখানে সাধনা নেই, সেখানে প্রেমের স্বরূপ অন্তরে বিকশিত হয়ে ওঠে না। প্রেমের মোহই সেখানে বড় হয়ে দাঁড়ায়। বিমলার বাইরের জগৎকে নিখিলেশ তার ভালোবাসা দিয়ে পূর্ণ করে রেখেছিল, কিন্তু তার অবচেতন মনে সেই প্রেম পূর্ণতা অর্জন করেনি। নিখিলেশের নিজের চিন্তার মধ্যেই সেই অপূর্ণতা ছিল। তার যুক্তিতে নারীপুরুষের সমান প্রেমের সম্বন্ধ, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে সে একাই দান করেছে অপরিমিতভাবে এবং দানের আনন্দে এমন বিহ্বল ছিল যে প্রতিদান নেওয়ার কথা তার চিন্তাতেও ছিল না। সেই ছিদ্র পথ দিয়েই বিমলার মধ্যে পূর্ণতার পরিবর্তে মোহের সঞ্চার হয়েছে এবং সেই সূত্র ধরেই বিমলা ও নিখিলেশের মানস বিপর্যয়ের সঙ্কেত ফুটে উঠেছে। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[৭] বলেছেন— “বিমলার ট্র্যাজেডী এক দোষে গুণে মেশা, গৃহজীবনে স্বচ্ছন্দগতি, সাধারণ মেয়েকে অসাধারণত্বের উচ্চমঞ্চে আরোহণ করাইবার যে দারুণ অসঙ্গতি তাহারই মর্মান্তিক দাহজ্বালা।” বিমলার সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সূত্রও এইখানেই নিহিত।

স্বদেশীযুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিমলার মনোবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার একটি মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার সঙ্কেত দিলেন। অর্থাৎ সচেতন মানুষ নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু সেই মানুষ যে আবার, আরেকদিকে অনেকটাই অবচেতন–নিয়ন্ত্রিত, এখানে তারই সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। তাই বহির্জগতের মানুষ সাধারণ দৃষ্টিতে তার নিজের মনের অপার রহস্যের সন্ধান সব সময়ে পায় না। বিমলাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। যে প্রেম তার প্রচন্ড দাহিকা শক্তি নিয়ে জীবনকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় প্রেমের সেই উত্তাপ নিখিলেশের মধ্যে ছিল না। সেইখান থেকেই বিমলার অভাববোধ উৎসারিত হয়েছে। সে তথ্য নিখিলেশের কাছেও গোপন ছিল না; তাই সে বলেছে, ‘ধৈর্যের পরে বিমলের ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন কি অন্যায়কারীকে দেখতে ভালবাসে।...... উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালবাসা।” ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসের শ্রীবিলাস নারীহৃদয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে এই কথাই বলেছে, “এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরমালা গাঁথে যে লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে......।” নিখিলেশের স্বতোৎসারিত অথচ সংযত প্রেমে বিমলা পৌরুষের সন্ধান পায়নি। তার হৃদয়ের এই প্রচ্ছন্ন অতৃপ্তিকে সে সতীত্বের অভিমানের অন্তরালে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। একদিকে তার আকাঙ্খিত প্রেমবুভুক্ষা, আরেকদিকে কল্যাণময় শুভচেতনা এই দ্বিমুখী দ্বন্দ্বের ঘাত–পতিঘাতে বিমলার চরিত্র ক্রমবিকশিত হয়ে পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে।

সন্দীপকে দেখে তার স্বরূপ নির্ধারণে বিমলা ভুল করেনি ! “চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া – চোখে আর ঠোঁটে কী একটা আছে যেটা খাঁটি নয়।....... ভাবখানা তো তপস্বীর মতো নয়, গরিবের মতোও নয়, দিব্যি বাবুর মতো। ভিতরে আরামের লোভ আছে........।” সন্দীপের উদ্দীপ্ত বাক্যস্রোত বিমলার সমগ্র অন্তরাত্মাকে এমনভাবে অভিভূত করল যে বিমলা “একটা অপূর্ব আনন্দ এবং অহংকারের দীপ্তি নিয়ে”

বাড়ী ফিরে এল। এবার তার অবচেতনে যে অপূর্ণতা ছিল, ধীরে ধীরে তো প্রকট হয়ে উঠল। বিমলা বলেছে, "এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের একটি ছোটো নদী—তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা — কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে গেল — আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগল; আমি আপনার রক্তের ভিতরকার সেই ধ্বনির ঠিক অর্থটা তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। সে আমি কোথায় গেল ? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন করে ফেনিয়ে এল ? সন্দীপবাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মত জ্বলে উঠল। রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর-ঘন্টার মতো আকাশ ফাটিয়ে বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিলে।" সন্দীপের উত্তপ্ত আকর্ষণ বিমলাকে সমস্ত নিয়ম বন্ধনের অতীত এক অনাস্বাদিত পুলকের সন্ধান দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে তার কামনার শিখা উদ্দীপ্ত হয়ে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের অনিশ্চয়তা দূর করেছে। বিমলা তার অন্তরে প্রবল বেগে প্রলয়ের পদধ্বনি শুনেছে। কিন্তু নিজের অশান্ত হৃদয়কে সন্দীপের আকর্ষণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে অক্ষম হয়েছে। সন্দীপ বিমলা সম্বন্ধে মনে মনে বুঝেছে "তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ মানুষ, স্বভাবের রসে দিব্যি টস্‌টস্ করছ; যেমনি স্বভাবের ডাক শুনেছ অমনি তোমার সমস্ত রক্তমাংস সাড়া দিতে শুরু করেছে—এতদিন এরা তোমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছে সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধরে রাখতে পারবে কেন ? তুমি যে জীবনের আগুনের তেজে শিরায় শিরায় জ্বলছ আমি কি জানি নে ? তোমাকে সাধুকথায় ভিজে গামছা ছড়িয়ে ঠান্ডা রাখবে আর কতদিন ?"

দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, এই উল্লাসে বিমলা অভিভূত ছিল। হৃদয়ের বুভুক্ষা যে কখন সেই পথ ধরে সন্দীপকে আশ্রয় করে আকাশস্পর্শী হয়ে উঠেছে সে উপলব্ধি বিমলার মধ্যে প্রথমদিকে তত স্পষ্ট ছিল না। দুর্দমনীয় কামনাবহ্নি বিমলার মধ্যেও জ্বলে উঠল। "মনে হতে লাগল বড়ো মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া। তাতে কত লজ্জা, কত ভয়, কিন্তু বড়ো তীব্র মধুর সে।" নিজেকে এইরকম স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করার পরই আরম্ভ হল বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব। সন্দীপের প্রতি তার এই আকর্ষণকে সে দুঃস্বপ্ন বলে মনে করার চেষ্টা করেছে। তাই তার উক্তি — "এ যে ভয়ানক অসংলগ্ন, এর যে আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নেই, এ যে মায়া-জাদুকরের মত কালো কলঙ্ককে ইন্দ্রধনুর রঙে রঙীন করে তুলেছে।" দেশের কথা পরিহার করে যখন সন্দীপ আধুনিককালের নারীপুরুষের মিলনতত্ত্ব, ইংরাজী ও সেইসঙ্গে বৈষ্ণব কবিতার আলোচনা বিমলার সঙ্গে আরম্ভ করল, তখন বিমলা এক অনাস্বাদিত সুরের সঙ্কেত তার মনের মধ্যে অনুভব করল। তার মনে হল, "এই সুরের স্বাদ আমার ঘরে আমি এতদিন পাইনি; আমার মনে হতে লাগল, এইটেই পৌরুষের সুর, প্রবল সুর।" একবার সে নিখিলেশের দেওয়া পরগাছার দিকে তাকিয়ে থাকে আবার কুলুঙ্গির মধ্যে রাখা নিখিলেশের ছবির দিকে। তাকাতে লজ্জা বোধ করে আবার নিস্তব্ধ রাত্রে অপলক দৃষ্টিতে সন্দীপের ছবি দেখে। নারী যে নিজের ইচ্ছায় আপন পথ চলবে এই কথাটাই যেন সন্দীপ তার অস্থিমজ্জায় সঞ্চারিত করে দিয়েছে। তাই বিমলা বলেছে — "আমার আপনার সঙ্গে যখন আপনার বিরোধ বাধে, যখন লজ্জা আমাকে ধিক্‌কার দিতে থাকে, তখন সন্দীপের কথা আমার মনে আসে। তখন বুঝতে পারি আমার এ লজ্জা কেবল লোকলজ্জা......। তাকে আমি কিসের গ্রাহ্য করি। 'আমি চাই' এই কথাটাকেই নিঃসঙ্কোচে অবাধে অন্তরে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বলতে পারাই হচ্ছে আপনার পূর্ণ প্রকাশ, না বলতে পারাই হচ্ছে ব্যর্থতা। কিসের ওই পরগাছা, কিসের ওই কুলুঙ্গি – আমার এই উদ্দীপ্ত আমিকে ব্যঙ্গ করে অপমান করে এমন সাধ্য ওদের কী আছে"। নিখিলেশের সঙ্গে সে তার প্রেমের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতে চেয়েছে। পরগাছা বাইরে ফেলে, ছবিকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে এনে "প্রলয় শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ" করতে গিয়ে, তার

যন্ত্রণাবিদ্ধ হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে— "হাত উঠেছিল, কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল — মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কী হবে, আমার কী হবে ! — আমার কপালে কী আছে।"

একদিকে উদায়প্রাণ স্বামীর প্রসন্ন নির্মল ভালবাসা আর একদিকে লুব্ধ প্রেমিকের নির্লজ্জ আকর্ষণ, এই দুইয়ের টানা পোড়েনে বিমলার অন্তর তীব্রভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। নিপুণ শিকারীর মত সন্দীপ তাকে প্রত্যক্ষ করেছে — "দেখছি বিমলা জালে পড়া হরিণীর মতো ছট্‌ফট্‌ করছে, তার বড়ো বড়ো দুই চোখে কত ভয় কত করুণা, জোর করে বাঁধন ছিড়তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত।" বিমলাকে যে প্রেম নিখিলেশ দিয়েছে, সেই প্রেমে আছে "বোবা গভীরতা;" "কলধ্বনিত বেগ" নেই। তাই তার মন অতৃপ্ত।

বিলাতী পণ্যদ্রব্য নিয়ে নিখিলেশের কাছে বিমলার আবেদন ব্যর্থ হয়েছে। ব্যাকুল আবেগে বিমলা সন্দীপকে বলেছে, "রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জানিনে, কিন্তু আমি আমার হৃৎপিন্ডের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায়। সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী তার প্রচন্ড শক্তি ! যতক্ষণ না সে আমাকে সম্পূর্ণ মেরে ফেলবে ততক্ষণ আমি তো আর বাঁচি নে, আমি তো আর পারি নে, আমার বুক ফেটে গেল।" তীব্র দ্বন্দ্বে জর্জরিত বিমলার অসহনীয় দুঃখকে সকৌতুকে উপভোগ করেছে সন্দীপ, আর হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছে নিখিলেশ। একদিকে নিখিলেশের উদাস দৃষ্টি, আর একদিকে কিশোর অমূল্যর প্রতি বিমলার অপরিসীম মমতা তাকে সন্দীপের মোহ থেকে মুক্ত করার পথ উন্মুক্ত করেছে। নিখিলেশ তাকে মুক্তি দিয়েছে — এই অনুভূতিই তার সমগ্র জগৎকে এক অসীম শূন্যতায় পর্যবসিত করেছে। নিজের হৃৎপদ্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত সন্দীপের যে বিশ্বরূপের বন্দনা করেছে বিমলা, সেই সন্দীপের অর্থলোলুপতা ও বিমলাকে কেন্দ্র করে অমূল্যর প্রতি ঈর্ষা অতি নিষ্ঠুরভাবে বিমলাকে সন্দীপের বাস্তবরূপ সম্বন্ধে অবহিত করিয়েছে। অমূল্যকে আশ্রয় করে প্রেয়সী বিমলার মধ্যে কল্যাণময়ী মাতৃমূর্তির উদ্বোধন ঘটেছে।

আত্মদ্বন্দ্বে জর্জরিতা বিমলা নিখিলেশের হৃদয়বৃন্ত থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তাই তখন সে তার ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ণ করার চেষ্টা করেছে সন্দীপের স্তরের মধ্যে দিয়ে। বিমলা বলেছে, "আমার অতলস্পর্শ গ্লানির গহ্বর থেকে জগতে সেই একটিমাত্র পূজার বেদী জেগে আছে; সেখান থেকে যেখানেই পা বাড়াই সেখানেই শূন্য।...... আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এত দরকার।" কিন্তু বিমলার প্রতি অমূল্যের গভীর শ্রদ্ধাকে যেদিন সন্দীপ ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখল, সেদিনের সেই নগ্ন আত্মপ্রকাশ বিমলার মোহকে ছিন্ন করে শুভচেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী হয়েছে। তা সত্ত্বেও সন্দীপের নীচতা যখন সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়েছে, তখনও বিমলার দ্বন্দ্ব অপসারিত হয়নি। সন্দীপ দেশের পরিবর্তে প্রিয়ার বন্দনা করে বিমলার মনকে আলোড়িত করেছে। এখানে রবীন্দ্রনাথ বিমলার উক্তির মধ্য দিয়ে মানব মনস্তত্ত্বের রহস্য ব্যক্ত করেছেন। বিমলা বলেছে — "আমরা জানিনে, আমরা শেষ কথাটাকে জানিনে, এইটেই স্বীকার করা ভালো, আপনাকেও জানিনে। মানুষ বড়ো আশ্চর্য; তাকে নিয়ে কী প্রচন্ড রহস্যই তৈরী হচ্ছে তা সেই রুদ্র দেবতাই জানেন ! মাঝের থেকে দগ্ধ হয়ে গেলুম। প্রলয় ! প্রলয়ের দেবতাই শিব তিনিই আনন্দময় ! তিনি বন্ধন মোচন করবেন।" বিমলার প্রতি অমূল্যের অনাবিল ভালোবাসা বিমলার মোহজাল ছিন্ন করেছে। বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের বেদনায় ভারাক্রান্ত, বিমলা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছে— "আর একদিন তুমি আমার ভোরবেলাকার রাঙা আকাশের ধারে দাঁড়িয়ে যে বাঁশি বাজিয়েছিলে সেই বাঁশিটি বাজাও সব সমস্যা সহজ হয়ে যাক; তোমার সেই বাঁশির সুরটি ছাড়া ভাঙাকে কেউ জুড়তে পারে না, অপবিত্রকে কেউ শুভ্র করতে পারে না। সেই বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন করে সৃষ্টি করো।" এই পথ ধরেই সে নিখিলেশের সঙ্গে দাম্পত্য প্রেমে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। এইখানেই বিমলাচরিত্রের পরিণতি। এই সময় এক আকস্মিক ঘটনার ফলে ঘরের গন্ডির মধ্যে বিমলার আনুগত্য পরায়ণতা নষ্ট হয়ে গেল। বন্যার মত স্বদেশী

আন্দোলনের ঢেউ এসে সব বিচক্ষণতা ও ভয় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। দেশের অনেক গৃহবধূর মত বিমলার মনেও দেশপ্রেমের আগুন জ্বলে উঠল। সে আন্দোলনের সামিল হয়ে গৃহকোণের গন্ডী ডিঙিয়ে তীব্র আবেগের বশীভূত হয়ে ন-বছরের সুখস্বর্গ প্রাচীন অভিজাত জমিদার বাড়ির গন্ডী পেরিয়ে বাইরে চলে এল। সে তার ডায়েরিতে লিখল ঃ "সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবিরে লাল হয়ে উঠেছিল, এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে এনেছিল জীবনের ধর্মকর্মের আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা সে সীমাটুকুর মধ্যে গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগেছিল সেদিনও তার বেড়া ভাঙেনি বটে, কিন্তু সেই বেড়ার ওপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না, কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল।"[৮] বিমলা নিখিলেশের আগ্রহে ঘরের বাইরে পা রেখেছিল। কিন্তু চিরদিনের বন্দী পাখি বাইরের প্রথম আলোয় বিভ্রান্ত তো হতেই পারে।

সন্দীপ এখন বুঝতে পারে, বিমলার রক্তমাংসে বাস্তবতার নামে যে উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, নৈতিকতার বুলিতে সেখানে আর সহজ শান্তভাবে আনয়ন অসম্ভব। সে এখন বিমলাকে যৌনমনস্তত্ত্বমূলক নানা বই সরবরাহ করে। ড. বিমানবিহারী মজুমদারের ভাষায় – "Sandip's plan of reducing Bimala was well laid. He wanted to create through the landing of his selected book to her, a conviction in her mind that to acknowledge and respect passion as the supreme reality was the sure criterion of modernity"[৯] নারীদের প্রগতিশীলা করে তোলার নাম করে কিছু আধুনিক শিক্ষিত পুরুষ যে তাদের নিজেদেরই অসংযত প্রবৃত্তিই চরিতার্থ করতে চাইছিল – রবীন্দ্রনাথ সন্দীপকে তাদেরই প্রতিনিধিস্বরূপ করে এঁকেছেন।

বিনোদিনী বা দামিনী কারোরই তাদের স্বামীদের জন্য হৃদয়ের গভীরে কোনও কোমল অনুভূতি পোষণের কারণ ছিল না। বিনোদিনী, দামিনী, চারুলতা –এই তিন নায়িকাদের কেউই ডায়েরি লিখত না বা দীর্ঘ আত্মসমীক্ষায়ও মগ্ন হত না। ইতিপূর্বে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাসে উচ্চবিত্ত অভিজাত পরিবারের কোনও মহিলা বিমলার মত এরকম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদর্শ স্বামীর প্রতি আনুগত্য এবং বিবেক ও মানবতা বর্জিত, অতি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বন্ধুর প্রতি তীব্র আকর্ষণের মধ্যে প্রবল মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের বিবরণ ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেনি। সন্দীপের জ্বালাময়ী বাগ্মিতা ও পৌরুষের কাছে স্বামী নিখিলেশের শাশ্বত সত্যের প্রতি নিষ্ঠা অত্যন্ত নীরস ও বিস্বাদ বলে মনে হয়। সন্দীপ যেমন তার অন্তরে দেশপ্রেমের উদ্বোধন ঘটিয়েছে, তেমনই তার অন্তরের সুপ্ত প্রেমের উৎসের দ্বারও উন্মোচন করেছে। আবার এই বিমলাই যখন সন্দীপের কৃত্রিম দেশপ্রেম, স্থূলতা ও লালসার কথা উপলব্ধি করতে পারে তখন সে তার চরিত্রের সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তি ও প্রচন্ড আত্মসংযমের বলে নিজেকে মুক্ত করে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। একদিকে রক্তের মধ্যে লালিত চিরন্তন সতীত্বের সংস্কার অন্যদিকে তীব্র মোহ – এই দ্বিমুখী মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বিমলা। "যে মানুষকে ভালো করে জানিনে, যে মানুষকে নিশ্চয় করে পাব না, সে মানুষের ক্ষমতা প্রবল, সে মানুষের যৌবন সহস্র শিখায় জ্বলছে, তার ক্ষুব্ধ কামনার রহস্য — সে কী প্রচন্ড, কী বিপুলা এতো কখনোও কল্পনাও করতে পারিনে।"[১০] বুদ্ধদেব বসুর মত আমাদেরও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় যদি সন্দীপ পরিপূর্ণ ভিলেন চরিত্র না হত যদি সে সত্যিই মহান দেশপ্রেমিক নেতা হত তাহলে বিমলা কি করত ? তাহলেও কি শেষ পর্যন্ত নিখিলেশের "শাশ্বত সত্যের ভিত্তি অটুট থাকত?" প্রকৃত প্রস্তাবে সন্দীপকে ভিলেন না বানিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপায় ছিল না, স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষেও, ঘটনার গতি যেভাবে মোড় নিয়েছিল তাতে, বিমলাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হত না হয়ত।

বিশ শতকের আধুনিক ঔপন্যাসিকের চোখে উপন্যাস নিছক গল্প বলার উপলক্ষমাত্র নয়, তা আসলে ওই উপন্যাসধৃত নর-নারীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ বিবর্তনের ইতিবৃত্ত, আইকর ইভান্স যাকে বলেছেন exploration of the individual personality[১১]

নিখিলেশ

আদর্শবোধ, গভীর দার্শনিক চেতনা নিখিলেশকে আত্মসমীক্ষার পথে চালিত করেছে। নিজের অন্তরকে সে প্রত্যক্ষ করেছে আর সেই আলোকেই অন্যের অন্তরলোকও তার কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নিখিলেশের অনন্ত পিয়াসী মন তার ঘরের সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাকে সন্ধান করেছে। বিমলাকে তাই সে গৃহসীমার বাইরে নিয়ে এসে বিশ্বজগতের মাঝখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। বিমলাকে নিখিলেশ বলেছে — "তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকন্নাটুকু করে যাওয়ার জন্য তুমিও হওনি, আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।" নিজের আদর্শকে সে তার দাম্পত্য জীবনে প্রতিফলিত করতে চেয়েছে; স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিখিলেশ সমান প্রেমের সম্পর্ক দাবী করেছে। কিন্তু এইখানেই সে আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারেনি। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের সমানাধিকার সম্বন্ধে যেখানে সে সোচ্চার, সেখানে সে নিজে একাই অকৃপণভাবে তার প্রেমকে দান করেছে, প্রতিদান এসেছে কিনা সেকথা ভেবে দেখার অবকাশ হয়নি। বিমলা শুধু গ্রহণই করে গেছে; সে-ও প্রতিদানের কোন সুযোগ পায়নি। এইখানেই নিখিলেশ ও বিমলার দাম্পত্যজীবনের অসম্পূর্ণতা এবং এই সূত্র ধরেই উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সূত্রপাত।

প্রেমের যে মানসী মূর্তি নিখিলেশের অন্তরে দীপ্যমান ছিল, তাকেই সে বিমলার সঙ্গে একাত্ম করে অনুভব করতে চেয়েছিল। কিন্তু সন্দীপের সংস্পর্শে বিমলার আবেগ-বিহ্বল রূপকে যখন সে প্রত্যক্ষ করল, তখনই নিখিলেশের হৃদয় তীব্র বেদনার ভারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। হৃদয় মথিত করে নিখিলেশ বলেছে — "আমি চিরদিন ঐশ্বর্যের ফাঁকির মধ্যে এতবড়ো কাঙাল হয়ে বসেছিলুম সেকথা এতকাল ভুলিয়ে রেখে আজ হঠাৎ দিনের পর দিনে, মুহূর্তের পর মুহূর্তে, কথার পর কথায়, দৃষ্টির পর দৃষ্টিতে সেই আমার প্রতারিত জীবনের দুর্ভাগ্য এমন তিল তিল করে প্রকাশ করবার দিন এল কেন ?" এখান থেকেই নিখিলেশের মর্মবেদনা উৎসারিত হয়েছে। 'সত্যের সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ' সে সহ্য করতে চেয়েছে। কিন্তু বিমলাকে কেন্দ্র করে যেদিন এই রূঢ় সত্য আত্মপ্রকাশ করেছে, সেইদিন নিখিলেশের প্রেমিকহৃদয় মৌনবেদনায় স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তার জীবনের তন্ত্রীতে যে বেদনা অনুরণিত হয়ে উঠেছে, সেই বেদনার মধ্য দিয়েও তার জীবন-বিশ্বাসের সুগভীর প্রত্যয় ফুটে উঠেছে। তাই সে বলে — "আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝড়ো রাস্তা; ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলার জীবন বাসা বেঁধে ছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনা সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায় ?" মনের কতকগুলি আইডিয়াল দিয়ে নিখিলেশ বিমলাকে সাজিয়েছিল। কিন্তু এইবার সে তার কল্পনার রঙ মুছে কঠোর সত্যের মুখোমুখি হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

নিখিলেশ বিমলাকে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকারের বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার সংকল্প নিয়েছে। বেদনাকে নিঃশব্দে বহন করে সে তার আদর্শ ও বিশ্বাসের দৃঢ়তায় আবার প্রতিষ্ঠিত হতে প্রয়াসী হয়েছে। সে বলেছে — "ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তুলেছি। এখন তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়; তাকে অবজ্ঞা করার দিন এসেছে।" তারপর সে বলেছে, "বাস্তবকে যত একান্ত ক'রে দেখি ততই সে আমাদের পেয়ে বসে, আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনই মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে। বিমলা আজ আমার জীবনে সেই বাস্তবকেই এত বেশি তীব্র করে তুলেছে যে, সত্য আমার পক্ষে আজ আচ্ছন্ন হবার জো হয়েছে।" এই সত্য অন্বেষণের ব্যাকুলতাই নিখিলেশকে দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ করেছে। আর তার মধ্য দিয়েই নিখিলেশও নিজের আদর্শের

অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেছে। সে বুঝেছে বিমলা নিজের প্রাণের তাগিদে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেনি বলে তার অন্তররুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা কামনার রূপ নিয়ে জ্বলে উঠেছে। নিখিলেশের জীবনে বিমলা ফিরে এসেছে, তখন নিখিলেশ নিজেকে প্রশ্ন করেছে, "আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না ? তা হলে একবার সহজের রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোনো আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইব না; কেবল আবার ভালবাসার বাঁশী বাজিয়ে বলব তুমি আমাকে ভালোবাসো, সেই ভালোবাসার আলোতে তুমি যা তারই পূর্ণ বিকাশ হোক, আমার ফরমাশ একেবারে চাপা পড়ুক।"

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[১২] বলেছেনঃ "নিখিলেশের প্রকৃত মনন ঐশ্বর্য ব্যক্ত হইয়াছে ঘাত প্রতিঘাতের অগ্নিগর্ভ ভাষণের সূচিমুখে নয়, নিবিড় আত্ম-সমীক্ষার, হৃদয় বিশ্লেষণে ব্যাপ্তি ও অন্তর্ভেদিতায়, আর প্রকৃতি চেতনার সহিত ব্যক্তিমানসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব সম্পর্কের অনুভবে।"

নিজের দাম্পত্যজীবনের বেদনাকেও সে আদর্শের আলোকেই পরিমার্জিত করে তুলতে চায়। ভাদ্রমাসের বন্যায় চারদিক যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন নিখিলেশ এক অব্যক্ত বেদনার সুরে মুখর হয় – 'ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।' তার মন স্মৃতিমন্থর অতীত দিনে পরিভ্রমণ করেছে। নিখিলেশের কবিমন প্রথম মিলনের স্বপ্ন ঘিরে এক চিরন্তন বাণী রচনা করেছে – কৈলাসে মানস সরোবরের পদ্মবনে হরপার্বতীর মিলনের ব্যঞ্জনায় সেই মিলনের চিত্র অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে ঃ "আমি বিমলাকে বলতুম, গানকে বারে বারে আপন ধুয়োয় ফিরে আসতে হয়, — জীবনে মিলন-সংগীতে ধুয়োই হচ্ছে এইখানে এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে; এই ছলছল করা জলের উপরে যেখানে 'বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ', যেখানে শ্যামল পৃথিবী মাথায় ছায়ার ঘোমটা টেনে নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় কূলে কূলে কান পেতে সারা রাত আড়ি পাতছে, সেইখানেই স্ত্রীপুরুষের প্রথম চার চক্ষের মিলন হয়েছিল, দেয়ালের মধ্যে নয়, তাই এখানে আমরা একবার করে সেই আদিযুগের প্রথম মিলনের ধুয়োর মধ্যে ফিরে আসি, যে মিলন হচ্ছে হরপার্বতীর মিলন, কৈলাসে মানস সরোবরের পদ্মবনে।"

নিখিলেশের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অনুধাবন করতে গেলে দেখা যায় যে নিখিলেশের ট্র্যাজেডি চিরকালের idialist দের ট্যাজিডি। সে হৃদয়বান পুরুষ। বিমলাকে সে ভালোবাসে, জনসাধারণ দরিদ্র প্রজাকেও ভালোবাসে। এটা তার চরিত্রের একটি দিক। আর একটা দিক হচ্ছে idea জগৎবাসী। সেখানে হৃদয় অপেক্ষা মনঃধর্মই প্রধান। সে বিচার করে বিশ্লেষণ করে নিজের idea-র অনুগত করে সব কিছুকে দেখতে চায়। idea-ই তার কাছে সবচেয়ে বড়। এরফলে সেখানে সে নিঃসঙ্গ আবেগহীন নিস্পৃহ। তার প্রেমকেও সে মনঃকল্পিত আদর্শ দিয়ে যাচাই করতে গিয়েছে। প্রেমের রাগরক্ত অনুভূতি অপেক্ষা প্রেমের সম্পর্কে তার ধারণাটাই সে বাস্তব বলে ভেবেছে। কিন্তু বাস্তব যে অন্যরকম, বিমলাকে দেখেও সে বুঝতে চায়নি। Idealist - রা চিরকালই বাস্তবকে অস্বীকার করে তাদের মনের আদর্শটাকেই real বলে ভাবে। সেইজন্য হয় তাদের ট্র্যাজেডি। Idea-র মোহ ভাঙতে চায় না, চায় না বলে বাস্তব-অভিজ্ঞতার থেকে বারবার আঘাত পায়।

এই উপন্যাসটির সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'র অন্তর্গত 'ঘর ও বাহির' অংশটি স্মরণ করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুকালের কথা বলতে গিয়ে এই অংশে বলেছেন— 'ছেলে বেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে, তখন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই; এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র সাহিত্যসাধনায় সেই জীবনরহস্যের নিত্যনূতন রূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। তাঁর একটি নিজস্ব ভাবের জগৎ ছিল, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের নিখিলেশও সেই জগতেরই বাসিন্দা। সেইখানে অবস্থান করেই সে জীবনরহস্যের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু সর্বোপরি নিখিলেশ, বাস্তব জগতের মানুষ-এ সত্য রবীন্দ্রনাথ বিস্মৃত হননি। তাই তাঁর নিজের চিন্তা, ধ্যানধারণা

নিখিলেশের চরিত্রে প্রতিফলিত হলেও তার idea-র সঙ্গে মনের এক বিপুল দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তাকে কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি নিয়ে এসেছেন। সেইখানেই ঔপন্যাসিক চরিত্ররূপে নিখিলেশের চরিত্রসৃষ্টির সার্থকতা।

নিখিলেশের (৬) 'আত্মকথা' তার মৌল করুণরসে অভিষিক্ত। জীবনযুদ্ধে পরাজিত সৈনিকের এই আশাবাদ যে, তার বিমল আবার তার কাছে ফিরে আসবে, এ জীবনদর্শন বড় বেদনাদায়ক। পরমুহূর্তে তার নিজের মোহভঙ্গ হয়, সে ভেবে দেখে, ভুল তারই। যে বিমলাকে সে এতদিন দেবীর মত পুজো করে এসেছিল, সে বাস্তব বিমলা নয়, ‘‘এতদিন আমি আমারই মনের কতকগুলি দামী আইডিয়াল দিয়ে বিমলাকে সাজিয়েছিলাম, 'সে প্রতিচিত্র ভুল'। বিমলার সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিলতে পারে সে হচ্ছে সন্দীপ। শূন্যবিহারী দার্শনিকের মতো তারা ভরা আকাশের দিকে গভীর রাত্রির অন্ধকারে সে তাকিয়ে থাকে, নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সেই আত্মবীক্ষার সময় দুটি ব্যক্তি অপ্রত্যাশিতভাবে এসে আমাকে বললেন; নিখিল শুতে যাও, রাত একটা হয়ে গেছে।’’

নিখিলেশের ৯নং আত্মকথায় এমন আসন্ন বিপদের প্রেক্ষিতে সব তথ্য অবগত হয়েও সে এক দুর্বল পৌরুষহীন স্বামীর মত কোন কতর্ব্য না করে কাব্যগন্ধী ভাষায় বিগত জীবনের মধুময় দিগুলির স্মৃতি চারণায় সর্বহারার বেদনা ভোলবার চেষ্টা করে চলেছে। তারপরে পাশের দিগন্তজোড়া মাঠের বর্ষার সৌন্দর্যে তার কবিমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে।

চারদিকে ভরাভাদরের জল টলটলে মাঠ, জলের ওপর কচি ধানগাছের কাঁচা সবুজ লাবণ্য। গত ন'বছর এই সময় তারা উভয়ে জমিদারির শ্যামল দহর বিলে বোটে কাটিয়েছে, তখন তার বিমল ছিল প্রাণের রসে ভরা। আজ তার বিমল সে চির পরিচিত মধুচন্দ্রিকার কথা ভুলে প্রবঞ্চক সন্দীপের অভিসারিকা। এই চরম দুঃখজনক পরিস্থিতিতে নিখিলেশ সঙ্কটের প্রতিবিধান না করে মধ্যযুগের রোদনশীল নায়কের মত কবি বিদ্যাপতির দুটি পরিচিত চরণ বিলাপের সুরে গুণগুণ করে গেয়ে চলেছে, 'এ ভরা ভাদর, মাহ ভাদর / শূন্য মন্দির মোর।'

নিখিলেশের ১৩নং আত্মকথাতে অনেকটা সেই পুরোনো ব্যক্তির পরিচিত নিষ্ক্রিয় পথে একঘেয়ে রূপকালঙ্কারে শোভিত ভাষায় একই বিষয়ের অনুবর্তন।

প্রকৃতির রূপ-ভাষ্য (পরিবেশ)

উপন্যাসটির কাহিনি ও চরিত্র পরিকল্পনার সামগ্রিক শিল্পরীতিই এর পরিবেশ-বিন্যাসের নিয়ামক। অর্থাৎ তিনজনের 'আত্মকথা'-র উদ্দেশ্য যেহেতু মুখ্যত ব্যক্তির গূঢ় অন্তর্লোকের উন্মোচন, তাই এখানে ঘটনার নিছক প্রত্যক্ষ বিবরণ দেওয়া থেকে ঔপন্যাসিক বিরত থেকেছেন। উপন্যাসের একেবারে উপসংহারে বিমলার স্মৃতিবাহিত পরিবেশ চিত্রটি নায়িকার তৎকালীন মানসিকতার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। নিখিলেশ যখন ভয়ংকর দাঙ্গার খবর পেয়েই তা থামাকে নিরস্ত্র অবস্থায় ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল, তখন বিমলার মনের দারুণ উদ্বেগ অনিশ্চয়তা ও অসহায় ব্যাকুলতার যোগ্য 'ইমেজ'-ধর্মী প্রেক্ষাপট হিসাবে ফুটে উঠেছিল উৎকণ্ঠা জাগানো ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকার চিত্ররূপ ঃ

"সামনেকার রাস্তা, গ্রাম, আরও দূরেকার শস্যশূন্য মাঠ এবং তারও শেষ প্রান্তে গাছের রেখা ঝাপসা হয়ে এল। রাজবাড়ির বড়ো দিঘিটা অন্ধের চোখের মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের ফটকের উপরকার নবত খানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন একটা দেখতে পাচ্ছে।

রাত্রিবেলাকার শব্দ যে কতরকমের ছদ্মবেশ ধরে তার ঠিকানা নেই। কাছে কোথায় একটা ডাল নড়ে, মনে হয় দূরে যেন কে ছুটে পালাচ্ছে। হঠাৎ বাতাসে একটা দরজা পড়ল, মনে হল সেটা যেন সমস্ত আকাশের বুক ধড়াস করে ওঠার শব্দ।"

ভাষার বন্ধন

স্বতঃস্ফূর্ত অকৃত্রিমতা, সহজ অন্তরঙ্গ সংবেদন 'আত্মকথা'গুলির বৈশিষ্ট। যদিও বিমলার আত্মকথার দু'একটি স্থলে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব লক্ষ্য করা যায়।

ক) আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে,— প্রদীপের পোড়া তেলই নিচের দিকে পড়তে পারে। (৯)

খ) এমন-মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো ! (৯)

সম্ভবত চলিত ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাস বলেই ঘরে-বাইরের ভাষারীতিতে নানাধরনের অতিরেক প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই প্রথম প্রয়াসের একটি প্রবণতা হল, ভাষার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্পর্কে লেখকের অতিসচেতনতা ও তার ফলে ভাষায় কিছুটা মনন-সঞ্জাত খরদীপ্তি ও তজ্জনিত এক ধরনের কৃত্রিমতা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই পর্বের কেবল উপন্যাসেই নয়, ছোটগল্পে, নাটকে, অন্যান্য গদ্য-রচনায় এমনকি কবিতায় ভাষারীতি এই মনন প্রবণতা দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত এবং সর্বত্রই ভাষা সম্পর্কে লেখকের এই 'অতিসচেতনতা' তাঁর সঙ্গে পাঠকের 'কমিউনিকেশন'-কে অবাধ ও অব্যাহত হতে দেয় নি।

নতুনরীতি ভাষা প্রয়োগের প্রথম প্রয়াসের উচ্ছ্বাসে এই উপন্যাসে কোথাও কোথাও দেখা দিয়েছে আরেক ধরনের আতিশয্য—সেটি হল ভাষার ফেনায়িত ভাব অর্থাৎ বাগবাহুল্য এবং আবেগধর্মী কাব্যিক অতিরেক। দৃষ্টান্ত ঃ

"হায় রে -
ভরা বাদর, মহে ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যেই তৈরি ওর যে দরজা বন্ধ। আমার যে দেবতা ছিল যে মন্দিরের বাইরে বসে ছিল, এতকাল তো বুঝতে পারি নি। মনে করেছিলুম অর্ঘ্য সে নিয়েছে, বরও সে দিয়েছে — কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর।".......

"আমি বিমলকে বলতুম, গানকে বারে বারে আপন ধুয়োয় ফিরে আসতে হয়; জীবনে মিলনসংগীতের ধুয়োই হচ্ছে এইখানে, এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে, এই ছল্ ছল্ করা জলের উপরে যেখানে বায়ু বহে পুরবৈয়াঁ, যেখানে শ্যামল পৃথিবী মাথায় ছায়ার ঘোমটা টেনে নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় কূলে কূলে জাল পেতে সারারাত আড়ি পাতছে - সেইখানের স্ত্রী-পুরুষের প্রথম চার চক্ষের মিলন হয়েছিল, দেয়ালের মধ্যে নয় — তাই এখানে আমরা একবার করে সেই আদিযুগের প্রথম মিলনে ধুয়োর মধ্যে ফিরে আসি যে মিলন হচ্ছে হরপার্বতীর মিলন, কৈলাসে মানস সরোবরের পদ্মবনে।"[১৩]

এই উপন্যাসে ভাষায় কৃত্রিমতা সঞ্চারের অন্যতম কারণ অলংকারের আধিক্য। একাধারে কবিত্ব ও মনন প্রবণতার মিশ্রণে ভাষায় এই উপমা-উৎপ্রেক্ষা-এপিগ্রাম জাতীয় অলঙ্কার প্রাচুর্য প্রকট হয়েছে - যা উপন্যাসে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার ব্যক্তিত্ব ও মানসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ ধরনের অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত পূর্বে উদ্ধৃত বিমলা ও নিখিলেশের উক্তিতেই শুধু নয়, সারা উপন্যাসে অজস্র জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে'তে অলঙ্কার প্রয়োগের তুলনামূলক আলোচনা করে বুদ্ধদেব বসু 'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "চতুরঙ্গের কঠোর সরলতা থেকে হঠাৎ ঐশ্বর্যের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে দিশেহারা হতে হয়।"

বস্তুত 'ঘরে-বাইরে' ভাষারীতিতেত এই ঐশ্বর্যের ঘূর্ণির ফলে প্রধান তিনটি চরিত্রের প্রত্যেকের প্রকাশভঙ্গিতেই ফেনায়িত বাগ্‌বাহুল্য, কাব্যিক বিলাস প্রসাধনী অলংকারের অতিরেক ও মনন-পরিশীলিত

সচেতনতার দরুণ সব মিলিয়ে যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল প্রধান পাত্রপাত্রীদের ভাষারীতিতে বৈচিত্রের অভাব। অর্থাৎ এ ভাষা অনেক স্থলেই চরিত্রগুলির নিজস্ব নয়, তা স্বয়ং লেখক রবীন্দ্রনাথের। এ ভাষার ক্রিয়াপদ চলিত বটে, কিন্তু কথ্যরীতির ইডিয়ম ও সহজ ছন্দঃস্পন্দ থেকে এ ভাষা অনেক দূরবর্তী। অপেক্ষাকৃত অপ্রধান চরিত্রগুলির সংলাপে কথ্যরীতির সজীবতা যথেষ্ট ফুটে ওঠার ফলে এদের বাস্তবতা সম্পর্কে পাঠকচিত্তে কোন সংশয় থাকে না মেজোরাণী, দাসদাসী ও অমূল্যের সংলাপ এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সংক্ষিপ্ত-সংহত ভাষণের দিকেও লেখকের যথেষ্ট মনোযোগ। 'ঘরে-বাইবের' পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায়[১৪] নিখিলেশের চিঠি-লেখা-সংক্রান্ত বাগবিস্তার বর্জন করে তার পরিবর্তে নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত সংহত অংশটি লেখক পরে মুদ্রিত রচনায় গ্রহণ করেছেন ঃ

"চিঠি লিখতেন, তার কথা অল্প, তার ভাষা সাদা, তাঁর হাতের সেই গোটা গোটা গোল গোল অক্ষরগুলি যেন স্নিগ্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত।" (৯)

এই সংহতি-সাধন-প্রয়াস শুধু নয়, অলংকৃত বাগবৈদগ্ধ্য ও কাব্যময়তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে, 'ঘরে-বাইরে'র ভাষারীতি মোটের উপর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সমালোচনা ঃ 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি 'অতিরেক' যুক্ত ভাষারীতির স্তূপীকৃত দৃষ্টান্ত স্থলমাত্র নয়। এর ভাষা উপন্যাসটির বিষয়বস্তু তথা জীবন-সংক্রান্ত বক্তব্য, এক কথায়, 'কন্টেট'-কে ধারণ ও প্রকাশ করার নিশ্চিত সামর্থ রাখে। এই ভাষায় কবি-ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের গভীর সৃজনশীলতার নিদর্শন স্পষ্ট, ব্যঞ্জনাশক্তিও উপেক্ষণীয় নয়। উপমা ইত্যাদি অলংকারের সাহায্যে ভাষার দূরসঞ্চারী ইঙ্গিতময়তা আভাসিত হয়েছে, যা চরিত্রের অন্তর্লোককে আলোকিত করে তোলে কয়েকটিমাত্র শব্দের ব্যঞ্জনা-উদ্ভাসে। এই সব ক্ষেত্রে ভাষায় অলংকারকে আলাদা করে চোখে পড়ে না, অলংকার এখানে পাঠকের সহজ বোধের সামনে বাধার প্রাচীর গড়ে তোলে না। বরং উপমা-উৎপ্রেক্ষা-সহজ অনিবার্য চিত্রকল্প রচনা করে চরিত্রের গূঢ় অন্তর্জীবন তার বেদনা উৎকণ্ঠা ও প্রত্যাশাকে অপরিহার্যভাবে প্রকাশের ভাষা দান করে। উপন্যাসটির উপসংহারে বিমলার আত্মকথার একেবারে শেষ অংশটি লক্ষ্য করলে আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ সম্ভবত প্রমাণিত হবে। সমগ্র অংশটিই উদ্ধারযোগ্য। এখানে কয়েকটি মাত্র পংক্তি উদ্ধার করছি ঃ

"আমি এই রাস্তার ধারের জানালা ছেড়ে এক পা কোথাও নড়তে পারলুম না। সামনেকার রাস্তা, গ্রাম, আরও দূরেকার শস্যশূন্য মাঠ এবং তারও শেষ প্রান্তে গাছের রেখা ঝাপসা হয়ে এলো। রাজবাড়ির বড় দিঘিটা অন্ধের চোখের মত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকে ফটকের উপরকার নবত খানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন একটা দেখতে পাচ্ছে।

"রাত্রিবেলাকার শব্দ যে কত রকমের ছদ্মবেশ ধরে তার ঠিকানা নেই। কাছে কোথাও একটা ডাল নড়ে, মনে হয় যেন কে ছুটে পালাচ্ছে। হঠাৎ বাতাসে একটা দরজা পড়ল, মনে হল সেটা যেন সমস্ত আকাশের বুক ধড়াস করে ওঠার শব্দ।"

উপন্যাসের একেবারে পরিণতি পর্বে পৌঁছে লেখক যেন সব 'অতিরেক' থেকে মুক্ত হয়ে 'ফর্ম' ও 'কন্টেন্টে'র সুষ্ঠু সমন্বয়সাধক এক সার্থক ভাষারীতি অর্জন করেছেন।

প্লট নির্মিতি

উপন্যাসটিকে আমি আঠারোটি অংশে বিভক্ত ধরে নিচ্ছি, পাত্র-পাত্রীদের আত্মকথনের যে বিন্যাস গল্পে আছে সেই হিসেবে। সেগুলিকে সংখ্যায় নির্দেশ করছি। পাশে প্রতি অংশের পৃষ্ঠা সংখ্যার উল্লেখ করছি আয়তন বোঝার জন্য।

১) বিমলা ২০ পৃঃ	১০) বিমলা ৬.৫ পৃঃ
২) নিখিলেশ ৫ পৃঃ	১১) নিখিলেশ ৮.৫ পৃঃ
৩) সন্দীপ ২.৫ পৃঃ	১২) সন্দীপ ১২ পৃঃ
৪) বিমলা ২.৫ পৃঃ	১৩) নিখিলেশ ৬ পৃঃ
৫) সন্দীপ ১০.৫ পৃঃ	১৪) বিমলা ১৬.৫ পৃঃ
৬) নিখিলেশ ৩ পৃঃ	১৫) নিখিলেশ ৬ পৃঃ
৭) বিমলা ৮.৫ পৃঃ	১৬) বিমলা ১৩.৫ পৃঃ
৮) সন্দীপ ৫ পৃঃ	১৭) নিখিলেশ ৮.৫ পৃঃ
৯) নিখিলেশ ৫.৫ পৃঃ	১৮) বিমলা ৩ পৃঃ [১৫]

দেখা যাচ্ছে বিমলার আত্মকথা আছে ৭বার ৭০.৫ পৃষ্ঠা জুড়ে। নিখিলেশেরও ৭ বার, তবে পৃষ্ঠা ৪২.৫। সন্দীপের আত্মকথা ৪ বারে ৩০ পৃষ্ঠা।

বিমলাকে দিয়ে দ্রুত নিখিলেশের জমিদারি, পরিবার-সংস্থান রাজনৈতিক-সামাজিক মতামত পাঠককে জানিয়ে দেওয়া। এরপর সন্দীপের আগমন থেকে বর্তমান কাহিনির সূত্রপাত। সন্দীপের ব্যক্তিত্বের তীব্রতায় আর স্বদেশী আন্দোলনের মিশ্র উত্তেজনায় বিমলার মন টলে উঠল। সন্দীপ তা বুঝে নিজ স্বার্থে ব্যবহারে প্রবৃত্ত হল। দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিখিলের দেশপ্রেমের পার্থক্য, সন্দীপের সঙ্গে তার তর্ক। বিমলার আত্ম-অবলোকন সন্দীপের দিকে তার চিত্তের আকর্ষণের ক্রমটি ধরিয়ে দেয়। চন্দ্রনাথবাবুকে ঔপন্যাসিক এই অংশে বিমলার দৃষ্টির ফ্রেমে প্রথম হাজির করলেন। কাহিনির সঙ্কট মুহূর্তগুলিতে সে হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভূত হয় এবং ইঙ্গিতে কল্যাণের পথটির প্রতি তর্জনী তোলে। বিমলার মন যে বিচলিত তা নিখিলেশ অনুভব করেছে গভীর বেদনার সঙ্গে। নিখিলের বিমলা-ব্যাখ্যান তার অন্তরলোকে পৌঁছতে পাঠককে সাহায্য করবে। বিমলার চোখ দিয়ে মেজ জা-এর যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে তা উপযুক্ত ফ্রেমে আঁটা। নিখিল-বিমলার জোড়া ফটো-স্ট্যান্ড থেকে বিমলার ফটো ছিঁড়ে নেবার ঘটনা যেন বিমলার প্রতি সংরাগ-তপ্ত প্রেম নিবেদন- কচিৎ তাতে দেশানুরাগের হাল্কা রঙের প্রলেপ। ৫.২-এ ভাষার উপমাদিতে কিছু নতুনত্ব আনার চেষ্টা। নিখিলের বিষয়ে সন্দীপের ভাবনার মধ্যে (৫.৩) দুর্বল চিত্তের প্রতি করুণার ভাব আছে। ৫.৪-এ কথক সন্দীপকে সরিয়ে লেখক স্বয়ং চন্দ্রনাথকে দেখিয়েছেন। রীতিঘটিত এই অসঙ্গতি উপন্যাসে বারবার এসেছে। স্ত্রীর মন যে সন্দীপের দিকে বিশেষ ঝুঁকেছে, সে অনুভব করতে পারছে। তবে স্বভাব তাত্ত্বিক নিখিল অনন্তকালের প্রেয়সীকে নিয়ে কিছুটা কথার মালা সাজাল। প্রগলভ আবেগে সে তার প্রেমই প্রকাশ করে, তার স্বদেশীব্রত আর এই তপ্ত হৃদয়াবেগ যে অচ্ছেদ্য তার ব্যাখ্যা করতে করতে বিমলার চিত্তোত্তাপকে আলোড়িত করে। বিমলার হৃদয়-তরঙ্গের উল্লাসে মিশিয়ে শোনানো হল সন্দীপের নারী-স্বভাব বিষয়ে একটি তত্ত্ব-সৃজন প্রলয়ের ভয়ঙ্করী শক্তি আছে নারীতে। তার আত্মবিশ্লেষণ, আবেগ, সংযমের চেষ্টা এবং রক্ততরঙ্গিত অনুভব কাহিনির এই অংশে যে দ্বন্দ্ব-দীর্ণ রূপটি তুলে ধরেছে তার সাফল্য স্বীকার্য। বস্তুত জীবনে প্রাপ্তি এবং বাস্তবাতীত অপ্রাপ্তি; ফলহীন কর্মের সাধনা—তাতেই মনুষ্যত্বের মুক্তি; দেশের উপরে বড় আত্মা — এই হল সন্দীপের আদর্শ।

সে যে তার ভেতরের কোমল ভাগ ঢেকে রুদ্রের সাধনা করে, জোর করে অসঙ্গতির দুর্বলতাকে মুছে ফেলে — —এরকম আত্মকথন সন্দীপ-চরিত্রকে একটু জটিল করে তোলার উদ্দেশ্যে (৮.৩) বিমলের সঙ্গে গৃহবলিভুক প্রেমের পুরনো দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থনে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কবিত্ব। নিখিল বড় দার্শনিক জিজ্ঞাসায় এবং বৃহৎ সাংসারিক কর্তব্যে সাড়া দিয়ে বিরহ-বেদনা-উত্তরণের চেষ্টা করছে। বিমলার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার পরে সে তার ব্যক্তিগত বিরহ-বেদনার মধ্যে যে চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিকতা তার থেকে যেন মুক্তির পথ পাচ্ছে সমাজের বৃহত্তর কর্মের মধ্যে। বিমলাকে হিপ্নোটাইজ করার ব্যাপারে, তাকে স্পর্শ করায়, তাকে সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষাহীন করে ফেলেও দৈহিক দিক থেকে আর না এগোবার ক্ষেত্রে তার আভ্যন্তর দ্বিধার স্বীকৃতিতে, নিখিলের তর্কের ভিতরে সারবস্তু আছে তা ক্ষণিকের জন্য অনুভব করার মধ্যে সন্দীপের দ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব রেখে দিয়েছেন লেখক। নিখিলেশ (১৩.১) বিমলাকে সব বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে চায়। স্বামী আর সন্দীপের মধ্যে তার চিত্তের দ্বন্দ্ব ধর্মীয় পারিবারিক সংস্কার আর প্রবৃত্তির সংগ্রাম তাকে কাতর করছে এটা বুঝতে পারে নিখিল। নিজের বিচ্ছেদ-বেদনাকে সে নিজের মধ্যে সংবরণ করে নিল। টাকা পেয়ে সন্দীপের (১৪.৩) স্তবের অলংকৃত ভাষার মোহ বিমলার চিত্তকে উদ্বেল করে তুলল। নেশা কাটতে কাটতেও কাটে না — বিমলার মনের এই অবস্থা বেশ ভালো ফুটেছে। অমূল্যের অবস্থান একটি বাৎসল্যের পটভূমি দাবি করে। আর এই সুযোগে ন'-বছরের বিবাহিতা সন্তানহীন জীবন ও মনের উপরেও কিঞ্চিৎ আলোকপাত ঘটে। বিমলের অনুতাপ-অশ্রুতে নিখিলের প্রেমে সত্যবোধে ওদের দাম্পত্য মিলন ঘটল।

প্রথম ন'টি অংশ ঘটনা বিরল। দশম অংশ থেকে কাহিনি ঘটনাবহুল ও দ্রুতগতি হয়ে উঠেছে। ১০তম থেকে ১৮তম অংশ পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলন কেন্দ্রিক বেশ উত্তেজক ঘটনার সমাবেশ। ঘরে-বাইরেতে আঠারোর মধ্যে বারোটি অংশে বিতর্ক ও মতভেদ আছে। উপন্যাসটিকে তাই নভেল অফ ডিসকোর্স বলে পরিচয় দেওয়া যায়। তবে (১) বিতর্কগুলি প্রায়ই ভাবের সঙ্গে ভাবের আকাশচারী যুদ্ধ। ছবির পর ছবি, উপামা-আবেগে-আপ্লুত উক্তির বিলাস। (২) কথার মোহে দিশা হারাতে হয়, এক ধরণের সম্মোহিনী জাল বিস্তৃত হয়। উপন্যাসের শুরু রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় সূচনা দিয়ে। এই নভেলে রবীন্দ্রনাথ কঠোরভাবে বঙ্কিমের দেশমাতৃকার ধারণা 'বন্দেমাতরম'-এর তত্ত্বকে আক্রমণ করেছেন। সে অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু পূর্বসূরীর ধ্যানকে তিনি নিজের সুবিধামতো কালো রঙে, আগে এঁকে নিয়েছেন, যাতে তাঁর আঘাতের সুবিধা হয়। তাছাড়া লেখা হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের জন্য আন্দোলনের উপরেই একরকম সব দায় আরোপ করেছেন, গভীরে তলিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চক্রান্তকে দেখতে পাননি। বিশ্বব্যাপী মানবধর্মের শাশ্বত আদর্শকে ধ্রুব সত্য মনে করায় মহিমা আছে, কিন্তু রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি, দেশ-জাতি-ধর্ম-ঐতিহ্য এগুলি বাস্তব; এবং প্রতিক্ষণ মানব-সত্যের সঙ্গে এর বিরোধ চলছেই -এও একটা কাল্পনিক বোধ। নিখিল ও সন্দীপের আত্মকথা বর্তমানকে আশ্রয় করে। যদি স্মৃতির মধ্য দিয়ে পুরনো প্রসঙ্গ কিছু আসে তো আসুক। কিন্তু বিমলার আত্মকথায় বর্তমানকে মাঝে মাঝেই ভবিষ্যতের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে, কচিৎ অতীত থেকে কিছু স্মৃতি ভেসে এসেছে। ঘরে-বাইরে বইয়ের আতয়তনের অনুপাতে লোকসংখ্যা কম। মুখ্য নরনারী তিনজনঃ বিমলা, নিখিলেশ, সন্দীপ। সহযোগী পাত্রপাত্রীও তিন— চন্দ্রনাথ, মেজরাণী, অমূল্য। একান্ত গৌণ হলেও পঞ্চুর কথা মনে থাকে। বিশেষ করে সাধুতা সম্পর্কিত ধারণা, কৃতজ্ঞতার মানদন্ড। নিখিল ও চন্দ্রনাথের ভাষ্যের কটাক্ষে ব্যঙ্গবিদ্ধ হরিশ কুন্ডু সামনে না এলেও এক পীড়ক জমিদারের টাইপ, স্বদেশী হুজুগের সুবিধা নিয়ে যে স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছে। কাসেম সর্দার বা নায়ের হরিচরণ দারোগা কিম্বা মিরজান মাঝি স্বল্পস্থায়ী একরঙা, জীবন্ত। স্বদেশী ভলান্টিয়ারের দল স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিহীন শুধুই উত্তেজিত জনতা; নেতার হুকুম তামিল করার, বিরোধীদের আক্রমণ করার জোটবদ্ধ একটি রাজনৈতিক হুজুগ।

উল্লেখপঞ্জী

১। চিঠিপত্র, নবম খন্ড পৃঃ ২৮।

২। পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৪০৫।

৩। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা ২য় খন্ড, ১ম সং পৃঃ ৩৭৫।

৪। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৪৭।

৫। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মজীবনী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৪র্থ সং কলিকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ১৪৬-৪৭।

৬। রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণ শিল্প ঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী।

৭। 'রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা' ২য় খন্ড, ১ম সংস্করণ পৃঃ ৫৮৩।

৮। বিমলার আত্মকথন।

৯। Heroines of Tagore, B.B. Majumdar, P.249.

১০। বিমলার আত্মকথা।

১১। রবীন্দ্র-উপন্যাসের নির্মাণশিল্প – গোপিকানাথ রাচৌধুরী।

১২। 'রবীন্দ্রসৃষ্টি সমীক্ষা' ২য় খন্ড, ১ম সংস্করণ, পৃ-৬০৬।

১৩। নিখিল-৯।

১৪। দ্র. বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি।

১৫। পৃষ্ঠা সংখ্যা রবীন্দ্র রচনাবলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত শতবার্ষিকী সংস্করণ অনুযায়ী।

যোগাযোগ

পূর্বাভাস

'যোগাযোগ' উপন্যাস লিখতে শুরু করেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৯২৭ সালে, 'ঘরে-বাইরে' বই করে ছেপে বের করার এগারো বছর পরে। এক বছর সাত মাস ধরে বই হয়ে 'যোগাযোগ' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। প্রভাতকুমার জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ 'যোগাযোগ' "১৩৩৪ সালের মধ্যে শেষ করিয়া (বিচিত্রা) সম্পাদকের হাতে দিয়েছেন, তারপর হাত দেন 'শেষের কবিতা'-য়।" 'যোগাযোগ' বিচিত্রায় "১৩৩৪ সালের আশ্বিন হইতে ১৩৩৫ সালের চৈত্র মাস পর্যন্ত প্রকাশিত হয়।" কিন্তু 'শেষের কবিতা' ধারাবাহিক প্রবাসীতে পত্রস্থ হয়ে "শেষ হয় ২৮ জুন ১৯২৮/১৪ আষাঢ় ১৩৩৫।"

মধ্যযুগের অন্তকালে গত শতাব্দীর শেষদিকে অবক্ষয় প্রাপ্ত জমিদার বংশের উত্তর পুরুষের কাহিনি 'যোগাযোগ'-এ বিধৃত। বংশপরম্পরার ঐশ্বর্য ও গৌরবকে সমাধিস্থ করে শূন্য ভিক্ষাপাত্র উত্তর-প্রজন্মের হাতে দিয়ে তাঁরা যখন লোকান্তরিত হয়েছেন, তখন এদের মধ্যে কেউ হয়েছেন নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান, দৃষ্টবাদ-নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি-সাধক, আবার কেউবা বংশের আদি পুরুষের কর্মক্ষমতার ঐতিহ্যবাহী উদ্যোগী পুরুষ এবং শূন্য ভিক্ষার পাত্র হাতে নিয়েই নিজের প্রচেষ্টায় তাঁরা হয়েছেন নতুন ঐশ্বর্যশালী বংশের স্রষ্টা। 'যোগাযোগ'-এর কাহিনির একদিকে একদা নুরপুরের আগ্রাসী জমিদার চাটুজ্যে বংশের সন্তান সংস্কৃতিবান, আদর্শবান, দারিদ্র্যক্লিষ্ট-ভ্রাতাভগ্নী, বিপ্রদাস ও কুমুদিনী ;অপরদিকে এই চাটুজ্যে বংশের অত্যাচারে বাস্তুচ্যুত এবং সর্বস্বান্ত হয়ে বর্তমানে রজবপুরের অধিবাসী ঘোষাল বংশের বিশাল ব্যবসায়ী রাজাবাহাদুর মধুসূদন। লেখক বলেছেন, 'ঘা-খাওয়া বংশ, ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো বড় ভয়ংকর।' একদিকে বর্তমান জমিদার বিপ্রদাস অন্যদিকে মধুসূদন। তাদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে লেখক দুই-তন্ত্রের রুচি, অহমিকা, জীবনবোধের দ্বন্দ্বের ছবি এঁকেছেন।

মধুসূদন প্রতিবার মানসিক বাধা ও আঘাতের সময়ে, স্ত্রীর সঙ্গে সংঘাতের প্রতিটি ঘটনায় কুমুর পেছনে দেখতে পেয়েছে ব্যক্তিগতভাবে বিপ্রদাসকে এবং শ্রেণীগতভাবে নুরপুরের জমিদারতন্ত্রের ছায়া। ব্যক্তি মদুসূদনের আক্রমণ প্রায়ই মধুসুদন নামক পুঁজিবাদীর শ্রেণীসংগ্রামে পরিণত হয়েছে। বিপর্যস্ত জমিদারী মেজাজের মিথ্যা দম্ভ ও নিঃসম্বল বনেদিয়ানার চাল ভেবে ক্রোধে মদুসুদন আঘাত করেছে কুমুকে — আসলে মেরেছে বিপ্রদাসকে, জয় করতে চেয়েছে জমিদার তন্ত্রকে। মহাজন হয়ে বিপ্রদাসকে ঋণে বেঁধে, তার বোনকে বিয়ে করে সে চাটুজ্জে জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছে।

জমিদার মুকুন্দলাল : "দীর্ঘ তাঁর গৌরবর্ণ দেহ, বাবরি কাটা চুল, বড়ো বড়ো টানা চোখে অপ্রতিহত প্রভুত্বের দৃষ্টি। ......সুকুমার শরীরে শ্রমের চিহ্ন নেই।"

জমিদার বিপ্রদাস : "আহা কি সুপুরুষ। এমন কখনও চোখেও দেখি নি। ওই যে গান শুনেছিলেম কীর্তনে —

গোরার রূপে লাগল রসের বান
ভাসিয়ে নিয়ে যায় নদীয়ার পুরনারীর প্রাণ

আমার তাই মনে পড়ল।"

'যোগাযোগ' অনেকটাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। সবটা নয়। গল্পের মধ্যের অংশ, যেটি এই রচনার দীর্ঘতম, সেখানেই নায়িকার একক দৃষ্টিকোণকে আশ্রয় করা হয়েছে। যদিও কুমুদিনী সব-কিছু বলে গিয়েছে — এভাবে নয়, কুমুর মধ্য দিয়ে তাকে নিজেকে এবং মধুসুদনকে দেখতে হয়েছে। অবশ্য মধুসূদন যা কিছু করেছে বা ভেবেছে তার সব কিছু কুমুর জানা-সে অর্থে নয়। কুমুর উপরে সব আলো ফেলার জন্য, মধুসুদন সেই আলোক-বৃত্তের বাইরে

গিয়ে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারেনি। এই বিশেষ কলা কৌশলকে আমি সাপেক্ষ-নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণের মিশ্র পদ্ধতি বলে উল্লেখ করছি।

লেখকের সমকালে জন গলসওয়াদির The Forsyte Saga শ্রেণীর তিন পুরুষব্যাপী একটি আখ্যান রচনার পরিকল্পনা তাঁর ছিল।

কুমুদিনী-মধুসূদনের বিবাহ পর্ব (১০-১৯)। এই অংশটির দুটি ভাগ, প্রথম ঘটকালি অংশ (১০-১৪), দ্বিতীয় বিবাহ অধ্যায় (১৫-১৯)।

কুমুদিনীর মেজো জা, নাম নিস্তারিণী, স্বামী নবীন, সাত বছরের পুত্র মোতিলালের প্রসাদে সে মোতির মা নামে পরিচিত। তার ছেলের ডাক নাম হাবলু, কুমু তাকে গোপাল বলে, খুব ভাব হয়ে গেলো এদের সঙ্গে। মরুময় রাজপ্রাসাদে এরাই তার মরুদ্যান, এখানের রৌদ্রদগ্ধ পরিবেশে তারা যেন তার শীতল আশ্রয়।

কুমু সন্তানসম্ভবা : হঠাৎ এমন একটা দৈব-ঘটনাযুক্ত পথে আখ্যানের স্বভাবিক গতির পরিবর্তন সাধনকে পশ্চিমী সমালোচনা সাহিত্যে বলা হয় deus ex machina .

নাট্যরূপ

উপন্যাসটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হবার পর ১৯৩৬ সালে ডিসেম্বর মাসে সেকালের প্রখ্যাত নট সম্রাট শিশিরকুমার ভাদুড়ির অনুরোধে কবি নিজে এর একটি নাট্যরূপ রচনা করেন ,সে রচনায় শিশিরকুমারের অনুরোধ অনুসারে কিছু পরিবর্তনও ঘটে ।বিশ্বভারতী প্রকাশিত গ্রন্থে দেখা যায় ,শেষ অধ্যায়ে উপন্যাস ও নাট্যরূপে বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে ।ঐশ্বর্যের দম্ভ ত্যাগ করে মধুসূদন ভাবী সন্তানের পিতা হিসাবে তার সন্তানের জননীকে সসম্মানে নিতে এসেছে এবং কুমুদিনীও তখন সব অহঙ্কার ত্যাগ করে তার নিজের বাড়িতে স্বামীর সঙ্গে যেতে রাজি হয়েছে। এর কিছু অংশ :

কুমুদিনী । আজ আমি জেনেছি, আমি শুধু মেয়ে মানুষ নই, আমি মানুষ ।জোর করে আমাকে বাঁধবে কী করে ?.........

এরপরে কুমু শশুরবাড়িতে যেতে সম্মত হয়। আর মধুসূদন —

মদুসূদন । .....আমি মহারানীকেই খুঁজেছিলুম, পেয়েছি মহারানীকে। আজ আমি বুঝতে পেরেছি আমি জেলখানার দারোগা নই।

বিশ্বভারতী সংস্করণের নাট্যরূপের সম্পাদক জগদিন্দ্র ভৌমিক মন্তব্য করেছেন, 'কুমুর অনুপস্থিতকালে নিজগৃহে যে শূন্যতা মধুসূদনের চিত্তকে নিয়ত পীড়ন করিয়াছে, শ্যামার সুস্পষ্ট ছলনা যে শূন্যতাকে বর্ধিত করিয়াছে, নবীন ও মোতির মার রজবপুরে ফিরিয়া যাবার প্রস্তাবে (?) অভ্যস্ত জীবন যাত্রায় আকস্মিক বিপর্যয়ের যে সূচনা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, সর্বোপরি কুমুর মধ্যে তাঁহার বংশের উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব সূচিত হওয়ার সংবাদ তাহার অন্তরে যে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে মধুসূদনের চিত্তেও আকস্মিক পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নহে।''[১] যদিও আমরা মনে করি এই আকস্মিক এবং সার্বিক পরিবর্তন শিল্পরূপের পরিপন্থী।

কবি কাউন্ট কাইজারলিঙের অনুরোধে 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটির ইংরাজি অনুবাদ করে জার্মানীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।[২] এই প্রবন্ধের মধ্যে কবি বলেছেন :''কুমারকে আনতে গেলে কামনার উদ্দামবেগকে নিরস্ত করে দিয়ে নিবৃত্তিপূত সাধনাকে আশ্রয় করতে হবে। সিদ্ধির সেই কঠোর রূপই যথার্থ সুন্দর ;শিব রূপবান নন বলে যখন উমার কাছে তাঁর নিন্দা করা হয়েছিল, তখন উমা এই ভাবেই উত্তর করেছিল।'' কুমুও ব্যক্তি মদুসূদনের ভিতর থেকে একজন ইম্পার্সোন্যাল স্বামীকে আবিষ্কার করে তার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছিল : ''মদুসূদন ব্যক্তিটির দোষ থাকতে পারে কিন্তু স্বামী নামক ভাবপদার্থটি নির্বিকার নিরঞ্জন। সেই ব্যক্তিকতাহীন ধ্যানরূপের কাছে কুমুদিনী একমনা হয়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে।''

বিবাহ-পূরবর্তী জীবনে তার এই কাব্যময় অশরীরী কামনাকে কবি নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন :"যাকে রূপে দেখবে এমনি করে কতদিন থেকে তাকে সুরে দেখতে পারছিল। ......সেইজন্য ঘটক যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এল কুমু তখন তার ঠাকুরেরই হুকুম চাইলে — জিজ্ঞাসা করলে, 'এইবার তোমাকেই তো পাব ?' অপরাজিতার ফুল বললে ,'এই তো পেয়েইছ'।"— এই হল কুমুর জগৎ ।

প্রকৃতির রূপ-ভাষ্য (পরিবেশ)

মধুসূদনের অধিকারবোধের সঙ্গে কুমুর স্বাধীন সত্তার বিরোধের মধ্য দিয়ে কুমুর ব্যক্তিচেতনার উন্মোচন — উপন্যাসের এই মূল 'থীম'টি বিকাশ লাভ করেছে নানা পরিবেশকে আশ্রয় করে। এর মধ্যে প্রধানতম হল গৃহ ও পরিবার আশ্রিত পটভূমি। এছাড়া কলকাতার পরোক্ষ প্রেক্ষাপট এবং 'নিসর্গ' চিত্রও 'যোগাযোগ'-এর কাহিনী ও চরিত্র বিন্যাসের প্রয়োজনীয় পরিপ্রেক্ষিত রচনা হয়েছে।

উপন্যাসের মূল 'থীম'-এর বিকাশ সাধনের জন্য এসেছে একদিকে মদুসূদনের পারিবারিক পরিবেশ, অন্যদিকে বিপ্রদাসের গৃহ। মধুসূদনের পারিবারিক প্রেক্ষাপট ফুটেছে অনেকটা তার গৃহ-পরিবেশ বর্ণনায়। সেই পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে মধুসূদনের বাড়ির বহির্মহল, অন্দরমহল ও কুমুর শয়নকক্ষ। এই দুই মহল ও শয়নকক্ষের অনতিদীর্ঘ অথচ নিপুণ বর্ণনা আছে উপন্যাসের ২২ সংখ্যক পরিচ্ছেদে। এই পরিবেশ চিত্রের সবটাই মধুসূদনের ব্যক্তিত্বেরই বহিঃপ্রকাশ — তার ঐশ্বর্যের সাড়ম্বর ঘোষণা ও রুচির স্থূলতার নিশ্চিত নিদর্শন।

মধুসূদনের পারিবারিক পরিবেশের বিপ্রতীপ চিত্রপট যেন কুমুর কলকাতার পিতৃগৃহ। সেটি আদৌ মধুসূদনের বিপুলাকায় প্রাসাদ নয়, তা জনবহুল বা কোলাহলমুখর নয়। সেখানে বস্তুত পরিবারের লোক জন বলতে আছেন কেবল বিপ্রদাস আর দুই একটি দাসদাসী। আর আছে গভীর নিভৃতি ও অতীতের স্মৃতি জড়ানো এক নির্জন অবকাশ।

কলকাতার দুটি চিত্রপট অন্তঃপুরবাসিনী নায়িকা কুমুর চোখে ধরা পড়েছে মধুসূদনের বাড়ির উঁচু ছাদ থেকে — ঐ শহরের পথ থেকে নয়। দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

(ক) ''কলকাতায় শীতকালের কৃপণ রাত্রি, ধোঁয়ায় কুয়াশায় ঘোলা আকাশ অপ্রসন্ন। .....কুমুর মন তখন অসাড়, কোনো ভাবনা নেই, কোনো বেদনা নেই। একটা ঘন কুয়াশার মধ্যে সে যেন লুপ্ত হয়ে গেছে।''[৩]

(খ) ''উঁচু প্রাচীর-দেওয়া ছাদ ।এই ছাদ থেকে মাথার উপরকার আকাশ দেখতে পাওয়া যায়, দিগন্ত দেখা যায় না। পশ্চিম-আকাশে একটা লোহার কারখানার চিমনি। যে দুদিন কুমু এই ছাদে বসেছে ওই চিমনি থেকে উৎসারিত ধূমকুন্ডলটাই তার একমাত্র দেখবার জিনিস ছিল।''[৪] — বস্তুত নায়িকার মনের বিশেষ সময়ের অবস্থা বিশেষের প্রতীকী চিত্রকল্পরূপে এই সংহত পরিবেশ-বিন্যাস নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

কুমুর নিঃসঙ্গ অন্তরমুখী মানসদৃষ্টি উপন্যাসে প্রাধান্য পাওয়ায় একধরনের সূক্ষ্ম 'লিরিক্যাল' আবহ সঞ্চারিত হয়ে গেছে সমস্ত পটভূমিতে। সেই আবহের একটি উপকরণ হল নিসর্গ, অন্যটি সঙ্গীত। উপন্যাসটিতে যদিও নিসর্গপটের ব্যবহার যথেষ্ট সীমিত তবু ওরই মধ্যে নায়িকা কুমুর বিষণ্ন মনের নির্জনতাকে ফুটিয়ে তুলতে 'নস্ট্যালজিক' প্রবণতার মাধ্যমে নিসর্গ-চিত্রপটের একটি অনবদ্য প্রয়োগ চোখে পড়ে ৪৩ সংখ্যক পরিচ্ছেদে :

''কালুদাকে খাওয়ানো শেষ হতেই কুমু শোবার ঘরে চলে এল। আজ মনটা বাপের বাড়ির স্মৃতিতে ভরা। এতদিনে নুরনগরে খিড়কির বাগানে আমের বোল ধরেছে। কুসুমিত জামরুল গাছের তলায় পুকুরধারের চাতালে কত নিভৃত মধ্যাহ্নে কুমু হাতের উপর মাথা রেখে এলোচুল ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে কাটিয়েছে — মৌমাছির গুঞ্জনে মুখরিত , ছায়ায় আলোয় খচিত সেই দুপুরবেলা। বুকের মধ্যে একটা অকারণ ব্যথা লাগত, জানত না তার অর্থ কী। .....ওর প্রথম-যৌবনের ....না পাওয়া মনের মানুষের কত আভাস ছিল ওদের সেখানকার বাড়ির কত জায়গায় সেখানকার চিলেকোঠায়, যেখান থেকে দেখা যেত গ্রামের বাঁকা রাস্তার ধারে ফুলের-আগুন-লাগা সরষে খেত....। দোতলায় ওর শোবার ঘরে জানলায় সকালে ঘুম থেকে উঠেই দূরের রাঙা আকাশের দিকে সাদা পাল গুলো দেখতে পেত ,দিগন্তের গায়ে গায়ে চলছে ,যেন মনের নিরুদ্দেশ কামনার মতো।''

দাদা (বিপ্রদাস)-কে ছেড়ে কুমুর স্থায়িভাবে পতিগৃহে চলে যাওয়ার বিষাদ-ম্লান মানসিকতার প্রেক্ষিতরূপে দেখা দিয়ে বৈশাখের শেষের এক 'দীর্ঘ বিলম্বিত গোধূলি'-র আবছায়া অন্ধকার পট।[৫] অন্যদিকে, একবারে শেষ (৫৮ সংখ্যক) পরিচ্ছেদে দেখি, চলে যাওয়ার দিন ভোরে বিপ্রদাসের সঙ্গে বসে কুমু যখন এস্রাজে ভৈরোঁ রাগিনী বাজাতে শুরু করল "তখনো অল্প অল্প অন্ধকার, সমস্ত রাত্রির পরে বাতাস একটু ঠাণ্ডা হয়ে অশত্থপাতার মধ্যে ঝির ঝির করছে, ...দুজনে ভৈরোঁ রাগিনীতে আলাপ শুরু করলে, গম্ভীর শান্ত সকরুণ;সতী বিরহ যখন অচঞ্চল হয়ে এসেছে, মহাদেবের সেইদিনকার প্রভাতের ধ্যানের মতো।" — উপন্যাসের এই অন্তিম পর্যায়ে কুমুর বিদায় মুহূর্তে নিসর্গের অন্তর্ধান সুর আর সঙ্গীতের করুণ মূর্চ্ছনা মিলে যে প্রতীকী পরিচয় রচনা করেছে — তার সঙ্গে নায়িকার নিগূঢ় অন্তর্বেদনা মর্মস্পর্শী একাত্মতা লাভ করেছে।

সমগ্র উপন্যাসটিতে কুমুর ব্যক্তি-সত্তার গভীর উন্মোচনের পরিবেশরূপে বারেবারেই প্রযুক্ত হয়েছে কখনও নহবতের সানাইয়ের সুর কখনও বা কুমুর কণ্ঠোচ্চারিত ভজনগীতের গুঞ্জরণ কিংবা উপনিষদের মন্ত্রের মন্দ্রিত মূর্ছনা —। আর এইসব সুর-মূর্ছনাই ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে নায়িকার অধ্যাত্মপ্রবণ হৃদয়ে এক শান্ত স্তব্ধ মন্দিরের অপার্থিব পরিবেশ — যেখানে থেকে অন্তরের শক্তি আহরণ করে সে মুখোমুখি হয়েছে বাইরের কঠিন নির্মম পৃথিবীর।

ভাষার বন্ধন

'যোগাযোগ' উপন্যাসের ভাষাগত প্রথম বৈশিষ্ট্য এর গতিময়তা। 'যোগাযোগ'-এর আগে রবীন্দ্র-উপন্যাসে আর কোথাও ভাষার এত ক্ষিপ্রতা কখনও চোখে পড়ে নি ,যদিও এর পূর্বতন উপন্যাসে চলিত রীতি গৃহীত হয়েছে। এখানে এপিগ্রাম-উপমা-উৎপ্রেক্ষাদি অলঙ্কারের ব্যবহার সত্ত্বেও ভাষা ভারাক্রান্ত ও মন্থর নয়। যোগাযোগের আগেকার কোন উপন্যাসে প্রযুক্ত বাক্যের এ ধরণের হ্রস্বতা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ও বঙ্কিম-অনুসারী রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের উপন্যাস 'বউ ঠাকুরানীর হাট' কিংবা 'রাজর্ষি'তে অনেকস্থলে সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাস চোখে পড়ে। কিন্তু সে ভাষাবিন্যাস মুখ্যত ঘটনানির্ভর ও নাট্যকাহিনির অভিমুখী। 'যোগাযোগ'-এ রবীন্দ্রনাথের বাক্যের সংক্ষিপ্ত সংহতি ঘটনাকে গতিশীল করার চেয়ে চরিত্রের হৃদয়ানুভবকে ইঙ্গিতময় করে তোলার জন্য প্রযুক্ত। ভাষার মধ্যে যে গূঢ় প্রবণতা নিহিত, তার ফলে ভাষা কখনই বহিরঙ্গ ঘটনার সঙ্গে ঘনসন্নিবদ্ধ হয়ে থাকে না। কাহিনির নির্যাসটুকুর সঙ্গে পরিবেশ, পাত্র-পাত্রীর মনোজগৎ ইত্যাদি মিলিয়ে এক ধরনের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনধর্মী আবহ গড়ে তোলে ক্রমশ।

আর এর ফলেই দেখি, এই ভাষা (বিবৃতি ও সংলাপ দুই অংশেরই) একদিকে ঋজু, সংক্ষিপ্ত, বেগবান, অন্যদিকে গভীরসঞ্চারী ও ব্যক্তিসত্তার অতলস্পর্শী রহস্য প্রকাশের সামর্থ্যযুক্ত ;আর এই শেষোক্ত উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখলেই 'যোগাযোগ'-এ উপমা-উৎপ্রেক্ষাদি অলংকারের অর্থবহতা সহজেই বোঝা যাবে। সংহত বুদ্ধিদীপ্ত 'এপিগ্রাম' ও সূক্ষ্ম উপমার প্রয়োগ-কৌশল উপন্যাসটির ভাষায় কিছুটা পালিশ-করা মার্জিত, পরিশীলিত ভাব এনেছে সন্দেহ নেই। সেটা 'সবুজপত্র' উত্তরকালের সাধারণ প্রবণতা, কিন্তু তবু বলবো এখানে এই অলঙ্কার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উপন্যাসদ্বয়ের মত অতিরেক ধর্মী নয়। 'ঘরে বাইরে' ও 'শেষের কবিতা'-র মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'যোগাযোগ' — ঐ দুই প্রান্তীয় আলংকারিক অতিরেক প্রবণতার প্রেক্ষাপটে 'যোগাযোগ'-এর অপেক্ষাকৃত নিরলঙ্কার রচনারীতি কিছুটা বিস্ময়কর মনে হয় না কি? 'যোগাযোগ'-এ অলঙ্কার প্রয়োগ অবশ্যই আছে, কিন্তু তা সর্বদাই ঔপন্যাসিকের সংযমবোধ ও যথাযথ প্রয়োগ-নৈপুণ্যের জন্য লেখককে উপন্যাসটির ভাষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে লক্ষ্যভেদ করতে সাহায্য করে। অলংকার এই উপন্যাসে প্রায়শই কোন না কোন সার্থক চিত্রকল্পের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে চরিত্রের মর্মলোকের আভাস আনে। এই বক্তব্যের সমর্থনে দুটি অংশ উদ্ধৃত করতে পারি:

(ক) মধুসূদন সম্পর্কে :

"মুখের মধ্যে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সে হচ্ছে পাখির চঞ্চুর মতো মস্ত বড় বাঁকা নাক, ঠোঁটের সামনে পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে পাহারা দিচ্ছে।"

(খ) কুমুর উক্তি :

"সূর্য ওঠবার আগে যেমন আলো হয় আমার সমস্ত আকাশভরে ভালবাসা তেমনি করেই জেগেছিল। কেবলই মনে হয়েছে সূর্য উঠল বলে। সেই সূর্যোদয়ের কল্পনা মাথায় করেই আমি বেরিয়েছি।"

'যোগাযোগ'-এর গদ্যে কাব্যময়তা পরিস্ফুট। ফলত ভাষা ব্যঞ্জনাধর্মী ও নমনীয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু এরফলে গদ্যের প্রত্যাশিত দৃঢ় রূপটি বিনষ্ট হয়নি। উপন্যাসটির গদ্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — "তার মধ্যে কবির কলম শিল্প কাজ চালায়নি তা বলতে পারিনে। কেননা কবি যদি ত্রিসীমানায় থাকে তাকে চাপা দেওয়া অসম্ভব।"[৬] কাব্যব্যঞ্জনার লাবণ্যযুক্ত ভাষার মার্জিত দৃঢ় মূর্তি একালের বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের সংঘাতময় ও অন্তরদ্বন্দ্ব জটিল উপন্যাসের সার্থক বাহন হবার যোগ্যতা অনেক পরিমাণে অর্জন করেছে। 'যোগাযোগ'-এর ভাষায় ওই দুটি বিপরীত লক্ষণের সমন্বিত প্রকাশের মূলে অন্যতম কারণ — লেখকের দৃষ্টির নিরপেক্ষতা, তাঁর আত্ম-সংবৃত ভাব। উপন্যাসের কোথাও তিনি নিজেকে আরোপ করেন না — যদিও তিনিই গল্পের 'সর্বজ্ঞ কথক' এবং সে কাহিনিতে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ব্যঞ্জনা শক্তিরও প্রকাশ পরিস্ফুট।

আসলে কাব্যব্যঞ্জনা যুক্ত কিংবা অলংকার-দীপ্ত ভাষাভঙ্গি কোথাও উপন্যাসের মূল জীবন-বিষয়ক বক্তব্যকে অতিক্রম করে আত্মঘোষণা করে না।

প্লট নির্মিতি

'ঘরে বাইরে' রচনার প্রায় বারো বছর পর রবীন্দ্রনাথ আবার উপন্যাস লিখলেন। এই উপন্যাসের প্রথম নামকরণ হয়েছিল 'তিনপুরুষ'। এই নামে 'বিচিত্রা' মাসিকপত্রে আশ্বিন ও কার্তিক এই দুমাস বের হবার পর কবি পুরনো নাম বদল করে এর নতুন নামকরণ করেন 'যোগাযোগ'। 'বিচিত্রা' পত্রিকার অগ্রহায়ণ (১৩৩৪) সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথ এর কারণ দর্শান — "*** আখ্যান বস্তু, রচনারীতি, চরিত্রচিত্র, ভাষা, ছন্দ, ব্যঞ্জনা, নাট্যরস সবটা মিলিয়ে একটি সমগ্র বস্তু। একেই বলা চলে ব্যক্তিরূপ। বিষয়ের কাছ থেকে সংবাদ পাই, ব্যক্তির কাছে তার আত্মপ্রকাশ জনিত রস পাই। বিষয়কে বিশেষণের দ্বারা মনে বাঁধি, ব্যক্তিকে সম্বোধনের দ্বারা মনে রাখি।*** রসশাস্ত্রে মূর্তিটি মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটিও বিষয়ের চেয়ে বড়ো। এই জন্যে বিষয়টাকে শিরোধার্য করে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায় না।*** গল্প জিনিসটাও রূপ, ইংরাজীতে যাকে বলে 'ক্রিয়েশন'; আমি তাই বলি গল্পের এমন নাম দেওয়া উচিত নয় সেটা সংজ্ঞা, অর্থাৎ যেটাতে রূপের চেয়ে বস্তুটাই নির্দিষ্ট। 'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামে দোষ নেই। কেননা ও নামে গল্পের কোন ব্যাখ্যাই করা হয়নি। *** কর্তা বলেন, তিন পুরুষের তিন তোরণওয়ালা রাস্তা দিয়ে গল্পটা চলে আসবে এই আমার একটি মাত্র খেয়াল ছিল। এই চলাটা কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে নয়, নিছক ভ্রমণ করবার জন্যেই। সুতরাং এই নামটা ত্যাগ করলে আমার গল্পের কোন স্বত্বের দলিল কাঁচবে না।*** আর একটি নাম ঠাউরেছি। সেটা এতই নির্বিশেষ যে গল্প মাত্রেই নির্বিচারে খাটতে পারে ***।"

'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' গ্রন্থে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন — "তাহা হইলে 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরে' সম্বন্ধে কি বলা যাইবে? 'তিন পুরুষ' নামান্তরের হেতু প্রভাতবাবু নির্দেশ করিয়াছেন অন্যরূপ। তিনি বলেন, কবি শুনিয়াছিলেন, ঐ নামে অন্য একখানি উপন্যাস বাংলা ভাষায় ছিল, সেই জন্যই নাম বদলান প্রয়োজন হইয়াছিল।"[৭]

ঔপন্যাসিক যদিও বলেছেন, 'আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে', তবু অবিনাশ ঘোষালের বত্রিশতম জন্মদিনে যে গল্পের সূচনা, তা' শেষ পর্যন্ত 'ফ্ল্যাশ ব্যাক' রীতিতে বলা তার পূর্বপুরুষের গল্পেই শেষ হয়ে গেল, তার পিতামাতার গল্পই মুখ্য কাহিনী হয়ে রইল, অবিনাশ ঘোষালের গল্প অকথিত রয়ে গেল চিরদিনের জন্য। কুমুর জীবন বিন্যাসকে অনুসরণ করে উপন্যাসের ঘটনা ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে। আর এদিক থেকে 'যোগাযোগ' উপন্যাসের গল্পকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে : (ক) কুমুর বিবাহের প্রস্তুতি ও বিবাহ অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত ঘটনা, এবং (খ) বিবাহোত্তর পুর্বে কুমু-মধুসূদনের দাম্পত্য-পারিবারিক জীবনের কাহিনী।

উপন্যাসের একেবারে শেষে যে কুমুর সন্তানসম্ভাবনার ঘটনার উন্মোচন আছে — তাকে আপাত দৃষ্টিতে এক আকস্মিক চমকসৃষ্টিকারী ঘটনা মনে হলেও আসলে তা আদৌ নয়। 'গোরা'-র শেষে জন্মরহস্য উন্মোচনের ঘটনার সঙ্গে এটি তুলনীয়। উপন্যাসের সমগ্র কাহিনিবিন্যাস লক্ষ্য করলে এটি স্পষ্ট হবে। উপন্যাসের একবারে গোড়াতেই যে 'অবিনাশ ঘোষালের জন্মদিন'-এর কথা আছে, সেই অবিনাষের বাবা-মা যে মধুসূদন ও কুমু, তা ক্রমশ প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের স্রোত অবিনাশ থেকে শুরু হয়ে ক্রমেই মদুসূদন ও কুমুর বিবাহের কাহিনির দিকে গড়িয়ে গেছে। ফলে, উপন্যাসের গোড়াতেই 'সচেতন' পাঠকের জানা হয়ে গেছে একেবারে শেষের তথাকথিত আকস্মিক চমকপ্রদ ঘটনাটি। এছাড়া উপন্যাসের এক জায়গায় মদুসূদনের মনের ইচ্ছা ও কল্পনার এক সংক্ষিপ্ত উদ্ভাসনেও এর পূর্বাভাস চোখে পড়ে — 'কুমুদিনীকে নিজের জীবনের শক্ত বাঁধনে জড়াবার একটিমাত্র রাস্তা আছে,সে কেবল সন্তানের মায়ের রাস্তা। সেই কল্পনাতেই ওর সান্ত্বনা।"[৮] ঘটনার আকস্মিক বর্ণিলতাকে, এভাবে রবীন্দ্রনাথ স্তিমিত করে দিতে চেয়েছেন পূর্বাভাস বা পূর্বপ্রস্তুতির মাধ্যম।

উপযোগিতার ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য — কুমুর বাবা-মার কাহিনি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ'(১৩৭৩) গ্রন্থে বলেছেন — "তিন পুরুষের ইতিবৃত্ত রচনার প্রতিশ্রুতি লেখক যখন পালনই করতে পারলেন না, তখন ও-অংশটুকু না থাকলেও কোন ক্ষতি ছিল না মনে হয়।" কিন্তু আমরা এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত নই। তিনপুরুষের ইতিবৃত্ত রচিত না হলেও, কুমুর জীবন কথায় এই কাহিনি আদৌ তাৎপর্যহীন নয়। বিপ্রদাসের আর্থিক দুর্গতির পটভূমি বিন্যাসে এই কাহিনির উপযোগিতা যেমন রয়েছে, তেমনি কুমুর জীবনে বাবা-মার সম্পর্কের এক অন্তর-গূঢ় গভীর প্রভাব ছিল। বাবা, মায়ের উপর যে অন্যায় অবিচার করেছেন তা নিতান্তই বাইরের ঘটনা। এর নেপথ্যে ছিল মায়ের প্রতি বাবার প্রগাঢ় ভালোবাসা — নিজের দাম্পত্য জীবনে যা কুমু তীব্রভাবে, আকাঙ্ক্ষা করেও পায়নি। এদিক থেকে দাম্পত্য জীবনের প্রাক্-পর্বে এই contrast ধর্মী চিত্রটির তাৎপর্য সামান্য নয়। বাবা মাকে নিয়ে কুমুর এই মনোভাব শুধু চিন্তায় নয়, নানা উপলক্ষ্যে দাদা বিপ্রদাসের সঙ্গে কথাবার্তায় (৪৬,৫১,৫৭ পরিচ্ছেদ) পরিস্ফুট হয়েছে। "মাকে অনেক সময় বাবা কষ্ট দিয়েছেন জানি, কিন্তু সে ছিল দুরন্তপনা, তার আঘাত বাইরে, ভিতরে নয়। এখানে (কুমুর দাম্পত্য জীবনে) সমস্তটাই অন্তরে অন্তরে আমার যেন অপমান।"[৯] "বাবা কিন্তু মাকে খুব ভালোবাসতেন, সেকথা ভুলোনা দাদা। সেই ভালোবাসায় অনেক পাপের মার্জনা হয়।"[১০]

শ্যামাসুন্দরী আখ্যান। গোপীকানাথ রায়চৌধুরী 'রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প' গ্রন্থে বলেছেন : "বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে মনে হয়, এই বিশেষ আখ্যানটি সম্ভবত মূল কাহিনী অনেকখানি লেখা হয়ে যাবার পর পরিকল্পিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। কারণ যেভাবে পাণ্ডুলিপিতে মূল অংশ থেকে পৃথক জায়গায় ('তীর'চিহ্নের দ্বারা নির্দেশিত)এই আখ্যানের প্রথম দিকের অনেকখানি (২২,২৫,২৬,২৭,২৯ ইত্যাদি পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) সন্নিবেশিত হয়েছে তা থেকে এমন ধারণা হওয়াই সঙ্গত।" যদিও শ্যামাসুন্দরীর আখ্যান উপন্যাসে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয় নিশ্চয়। কুমুর মনের গূঢ়সঞ্চারী অনুভব ও ভাবনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসটিতে যে কিছুটা দূরস্পর্শী কাব্যময়তার আভাস এসেছে, শ্যামার কাহিনি যেখানে কিছুটা বাস্তবতার ঝাঁঝালো স্বাদ বয়ে এনেছে। কুমু-মধুসূদনের দাম্পত্য সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার একেবারে বিপরীত প্রান্তে এই আখ্যানটির অবস্থিতির ফলে শ্যামাসুন্দরী মধুসূদনের স্থূল জৈব সম্পর্কের এই কাহিনী জটিলতা মুক্ত ও সুস্পষ্ট। উপন্যাসে এ আখ্যানের ভূমিকা সীমিত কিন্তু সুনির্দিষ্ট। কুমুর দাম্পত্য জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতার দিনগুলিতে কুমু যখনই মধুসূদনের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রাপণীয় বলে মনে হয়েছে, তখনি মধুসূদনের শূন্যতা বোধের পটে শ্যামার সহজপ্রাপ্য ভূমিকা স্ফুটতর হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জী

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগাযোগ, নাটক, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ,১৯৯৫ সংকলন ও সম্পাদক, শ্রী জগদিন্দ্র ভৌমিক

২। রবীন্দ্রজীবনী ,তৃতীয় খন্ড ,প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৩। ২৫ পরিচ্ছেদ, যোগাযোগ

৪। ২৮ পরিচ্ছেদ, ঐ

৫। দ্র.৫৭ পরিচ্ছেদ, ঐ

৬। ১২ই এপ্রিল, ১৯৩৫-এ শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রাংশ। দ্র. চিঠিপত্র। ১১শ খন্ড। পৃ.১৫৫

৭। রবীন্দ্রজীবনী ২য় খন্ড , পৃ.৩৪৩

৮। ২৭ পরিচ্ছেদ, যোগাযোগ

৯। তদেব

১০। তদেব

শেষের কবিতা

পূর্বাভাস

সমালোচনা শাস্ত্রে উপন্যাসকে যে অর্থে 'আখ্যান কাব্য' বলা হয় শেষের কবিতা আসলে তাই। প্রভাতকুমার যথার্থই

বলেছেন, যোগাযোগ-এর পর শেষের কবিতা যেন মহাকাব্যের পর লিরিক লেখা। শেষের ১৩৩৫ সালের প্রবাসীর ভাদ্র-চৈত্র সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় শেষের কবিতা-র খসড়ায় নাম ছিল 'মিতা'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃক প্রকাশিত সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত বাংলা গ্রন্থ 'বাঙ্গালা ভাষা তত্ত্বের ভূমিকা' ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়, উপন্যাসের বর্ণিত কাহিনী এই সময়ের। নায়ক অমিতের ভ্রমণকালে এই বিখ্যাত গ্রন্থখানি তার প্রিয় সঙ্গী বলে কাহিনীতে কথিত।

আবু সয়ীদ আয়ুবের কথায় "জগতের মধ্যে যা সত্য, সুন্দর ও প্রাণস্ফূর্ত রবীন্দ্রকাব্যে তার প্রকাশ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অক্লান্ত ও অনবচ্ছিন্ন।"[১] তিনি নিজেও চিত্রার ভূমিকায় স্বীকার করেছেন "কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল ও ঔপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছে, এমন অপবাদ কেউ কেউ আমায় দিয়েছেন।" (ঐ)। শুধু এই ভূমিকাটিতেই নয়, তাঁর সব রকমের সাহিত্যকর্মে, নানা চিঠিপত্র ও তাঁর জীবন দৃষ্টিতে এই মতবাদ কবি নিজেও প্রচার করেছেন। বস্তুতঃ এই আদর্শই ছিল তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান। স্নেহভাজন রানী চন্দ যখন তার কাছে গ্রামের গল্প করতেন, তখন গুরুদেব সেই সব গ্রামের স্মৃতি তাকে লিখতে বলে তাকে উপদেশ দিতেন, "গ্রামে ভালোর দিকটা যেমন আছে খারাপ দিকও আছে। খারাপ দিকটা বাদ দিয়ে যা সুন্দর- সেইটুকুই শুধু ছবির মত ফুটিয়ে তুলবি।"[২]

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' প্রসঙ্গে প্রবোধ কুমার স্মৃতিচারণায় লিখেছেন — "রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁর অনন্য সাধারণ একটি উপন্যাস শেষের কবিতা। প্রমাণিত হয়েছে আধুনিকতায় তিনি তাঁর সত্তর বছর বয়সেও সর্বাগ্রগণ্য। শেষের কবিতাকে তার স্বভাব -সৌন্দর্যের জন্য একটি মহৎ কাব্যোপন্যাস বলা চলে। সেই সময়ে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ভারত প্রসিদ্ধ দার্শনিক আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় ছিলেন ব্যাঙ্গালোরে। তিনি রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ সেই সময় ১৯২৮-এ মাদ্রাজ ও কলম্বো হয়ে পন্ডিচেরীতে যান শ্রী অরবিন্দের আমন্ত্রণে। সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথের উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষের কবিতার সম্পূর্ণ পান্ডুলিপিটি তাঁকে পড়ে শোনান।[৩] বনস্পতির বৈঠকে (১ম পর্ব পৃঃ ৩৬৪) রবীন্দ্রনাথের প্রুফ রিডিং প্রসঙ্গে প্রবোধ কুমার লিখেছেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে লেখক হলেই প্রুফ রিডার হতে হয়। আমরা নগণ্য ব্যক্তি- রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বহুকাল অবধি ছাপাখানার সঙ্গে প্রুফ রিডিং-এর কাজ করতে হয়েছিল। একদা 'ভুল' শব্দটির বানান বিধি নিয়ে তাঁর সঙ্গে এক ছাপাখানার সংঘর্ষ বাধে। তৎকালে 'ভ' অক্ষরটির তলায় 'দীর্ঘ ঊ' লেখা হত। সুতরাং কবির বানান কেটে দিয়ে তাঁরা 'দীর্ঘ ঊ' বসিয়ে দেন এতে কবি ক্ষুব্ধ হয়ে ছাপাখানায় লিখে পাঠান, আমার ভুল, ভুলই থাক ! দুটোই হ্রস্ব উ !'

কবি লিখেছিলেন ঃ 'ঠিক এই সময়েই প্রবোধ সান্যালের কলরব আর নিশিপদ্ম বই দুটি আমার হাতে পড়ল। এরা সম্পূর্ণ অন্য জাতের। এরা নিছক আধুনিক।

রিয়ালিজম এবং আইডিয়ালিজমকে প্রাকৃতিকতা এবং ভাবিকতা নাম দেওয়া যেতে পারে। এই দুটোকে নিয়েই মানুষের কারবার। প্রকৃতিতেও সে স্বীকার করতে বাধ্য, তার আপন ভাবের সৃষ্টিও আপনি এসে মেশে। দুয়ে মিলেই তার রিয়ালিটি। কোন একটা সাহিত্যিক মতবাদ নিয়ে বলা চলবে না যে মহাভারতের শকুনিই সত্য আর অর্জুন তা নয় কিম্বা কর্ণের মধ্যে যে অংশে নীচতা সেই অংশে তা রিয়ল, যে অংশে মহত্ত্ব

সেই অংশটাই বানানো।[৪]

তিনি বলেছিলেন, 'কাব্যে যেমন তার জন্মের মূলে বেদনাবোধ, সেইখান থেকে তার উৎপত্তি। জীবন প্রস্ফুটিত হচ্ছে শুধু শুষ্ক ঘটনার নয়। তার প্রকাশের পিছনে লুকিয়ে থাকে আঘাত, আনন্দ, অপমান সংঘাত–দুঃখ বেদনা উল্লাস–সব নিয়েই জীবন। সে তার পাওনা পায় ঝড়ে তুফানে, ভূমিকম্পে, বিপর্যয়ে–সে জীবন থেকে অশ্রু ঝরে, রক্ত মোক্ষণ ঘটে। (ঐ) 'আঁকাবাকা' উপন্যাসে (১৩৪৫) প্রবোধ কুমার রবীন্দ্র প্রসঙ্গ এনেছেন। উপন্যাসের নায়ক কবি, কঙ্কর নায়িকা মীনাক্ষীকে বলছেন, 'রবি ঠাকুরের গল্পে আর উপন্যাসে যৌন দুর্নীতিটা পথের বাইরে পা দেয়নি, সবই অন্তঃপুরে সংঘটিত।

কিরকম ? অনেকটা প্যাথোলজির কোঠায় পড়ে। কেমন একটা রোমান্টিক মরবিডিটি। তাঁর উপন্যাসে চারিত্রিক অশুচিতা আত্মীয়জনের মধ্যেই যেন আবদ্ধ। অন্তঃপুরের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে অশুচি প্রণয় লালাসিক্ত জিহ্বায় যেন পরস্পরকে জন্তুর মতন লেহন করে — অথচ তাদের বাইরেটা আভিজাত্যের রাঙতায় মনোহর; শিক্ষা ও সংস্কৃতির চাকচিক্যে হৃদয়গ্রাহী। কঙ্কর বললে, ভাষা, ভঙ্গি আর কবিত্বের আবরণ ঘুচিয়ে নষ্ট নীড়ের বিচার করো। বিচার করো, চোখের বালি, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, মালঞ্চ, দুইবোন। কেউ দূরসম্পর্কীয়া ভগ্নী, কেউ শালী, কেউবা বন্ধুস্ত্রী অর্থাৎ বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের যেগুলি স্তম্ভ, – ঔপনাসিকের হাতে তাদেরই লাঞ্ছনা। বাইরে থেকে তারা আহরণ করে আনে না, ভিতরে ভিতরে ঘুণ ধরায়। মীনাক্ষী বললে ধনী লোকের কথা পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসে। তারা খ্যাতি ক্ষুন্ন হবার ভয়ে বাইরে লাম্পট্য করে না, অন্তঃপুরেই তাদের গতিবিধি। কঙ্কর বললে, রবি ঠাকুরের গল্পে অভিজাত সমাজ সকলের চেয়ে বেশি অপমানিত হয়েছে। তাদের নোংরামি, তাদের স্নবারি– মীনাক্ষী বললে, শেষের কবিতা–এর ব্যতিক্রম। কঙ্কর বললে, সেইজন্য বইখানা সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে অত মধুর হয়ে উঠেছে।'[৫]

উপন্যাসের বেশিটা ঘটেছে শিলং–এ। সেখানে পাহাড়ী নিসর্গের ঘন সবুজে অবিশ্রান্ত বর্ষণে অজস্র কবিতায় এবং প্রণয় গুঞ্জনে একাকার একটা অন্য পৃথিবী।

উপন্যাসের শুরু কোলকাতায়, সেখানে ইঙ্গ–বঙ্গ সমাজের হাল ফ্যাশানি চাল এবং নব্য কবিতার জমি দখলের দাপট। কাহিনীর শেষ কোলকাতায়। নিষ্প্রাণ এবং তত্ত্বময়। অতীত থেকে ভেসে আসা দুটি কবিতায় লেগে আছে শিলং–এর ঘ্রাণ।

৮০ পৃষ্ঠার এই ছোট উপন্যাসে সরাসরি (প্রত্যক্ষ) কবিতা স্থান পেয়েছে অনেকগুলি।

১) বলেছে অমিত / প্রথম চরণ – আনিলাম অপরিচেতের নাম। ৯০ লাইন, অধযায় ১

২) ঐ / পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি। ২৪ লাইন। অধ্যায়–২

৩) ঐ / ফর গড্‌স সেক্ হোল্ড ইওর টাং। ২ লাইন অধ্যায়–৬

৪) ঐ / অনুবাদ / দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর। ২ লাইন। অধ্যায় – ৬

৫) ঐ / রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে। ২৬ লাইন। অধ্যায় – ৬

৬) ঐ / হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা। ২ লাইন। অধ্যায় – ৭

৭) ঐ / ফর গড্‌স সেক.... (পুনরুক্তি)। ২/৭

৮) ঐ / ঝরণা, তোমার স্ফটিক জলের। ২০/৭।

৯) ঐ / পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা ১১ / ৮

১০) ঐ / ফর উই আর বাউন্ড হোয়ার মেরিনার.......। ২/১০

১১) ঐ / অনুবাদ / আমরা যাব যেখানে কোন। ৪/১০

১২) ঐ / ও হোয়াট ইস দিস। ৫/১০

১৩) ঐ / অনুবাদ / একি রহস্য একি আনন্দ রাশি। ৫/১০

১৪) ঐ / বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঙায়বি। ২/১০

১৫) ঐ / চলি যবে গেলা যমপুরে। ২/১১

১৬) ঐ / ব্লো জেন্টলি ওভার মাই গার্ডেন। ৪/১১

১৭) ঐ / অনুবাদ / চুমিয়া যেও তুমি। ৬/১১

১৮) লাবণ্য / মিতা ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং ২ / ১১

১৯) অমিত / ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে। ৪/১১

২০) লাবণ্য / তোমারে দিইনি সুখ মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি। ৬/১২

২১) অমিত / সুন্দরী তুমি শুকতারা। ২৮/১২

২২) ঐ / কত ধৈর্য ধরি। ৩১/১২

২৩) ঐ / তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে। ১৯/১৩

২৪) ঐ / টেন্ডার'স দি নাইট। ২/১৫

২৫) অমিত / তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন। ৮ / ১৭

২৬) লাবণ্য / কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও। ৭৬/১৭

এই ছোট আকারের উপন্যাসের ৩১৯ লাইন কবিতা আছে। অমিত ২৩ বার এবং লাবণ্য ৩বার আবৃত্তি করেছে। অমিত ১৩ বার নিজের লেখা কবিতা বলেছে, লাবণ্য ১বার। অমিত ৪বার ইংরেজী কবিতার অংশ বলেছে এবং তার সঙ্গে নিজের অনুবাদ যোগ করে দিয়েছে। আবৃত্তিতে এসেছে কিট্স্- ডানের কবিতার অংশ, বিদ্যাপতির দুটি চরণ, মধুসূদনের একটু, ঈষৎ পরিবর্তিত জয়দেব। দুই একটি কবিতাকে কৌতুক করে রবি ঠাকুরের কবিতা বলেও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কবিতাগুলি প্রেমের-বিরহের, সংসক্তির এবং কখনো প্রেমতত্ত্বের। বিশেষ করে শেষ কবিতা দুটি। শেষের কবিতা দুটি বাদ দিলে দেখা যায় লাবণ্য যে দুটি কবিতা বলেছে, সেগুলি অন্তর্মুখী-একটু বেশি গভীর, কিছু বেদনাসিক্ত (২০,২১)। এ দুটিকে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের লেখা। এমন কি জয়দেবের চরণে যে ভাব গাঢ় আত্মমগ্নতা আসা কঠিন তাও এসে গিয়েছিল 'ত্বমসি মম জীবনং' অংশে অবস্য ভূষণের উপমা টানায় তা মাটি হয়েছে। অমিত অথবা নিবারণ চক্রবর্ত্তীর কবিতা স্ফূর্তির, শক্তির উদ্যত ও বর্ণাঢ্য বেপরোয়া যৌবনের। একটু চটুল-তা গতির দ্রুততার জন্য, ঝর্ণাকে যেমন বহমান নদীর থেকে লঘু মনে হয়। তারুণ্যের চারধারে স্বভাবতঃ কিছু চাপল্য বিকীর্ণ হয়। এই কবিতাগুলি যেন ভাবে-ভাষায়-ছন্দে একটা আভ্যন্তর যুদ্ধ করে চলেছে। তার পরে শেষ কবিতায় অমিত ভাব ও ভাষা দুই-ই বদলে রবীন্দ্রবৃত্তে আত্মসমর্পণ করল। কবিতার নকল বিদ্রোহ শেষ হল।

'তব অন্তর্ধানপটে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রিয় প্রেম-বিরহতত্ত্ব। শুধু তাই নয়, আছে বিমর্ষতা, ক্লান্তি, শূন্যতা, ভেতরে কিছু স্থবিরতা। অন্য দিকে লাবণ্যের শেষ কবিতা বিরহ তত্ত্বের ভাষ্য হলেও উচ্ছল আনন্দ ও অন্তর্গূঢ় বেদনার বাণী যে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে দ্রুতলয় ছন্দে প্রকাশ করেছে, তার ধাঁচটা নিবারণ চক্রবর্ত্তীর কাছ থেকে নেওয়া। মোট কথা, অমিত (নিবারণ চক্রবর্ত্তী) -এর নায়ক। একজন আধুনিক কবি, কাব্যবোদ্ধা, কাব্য সমালোচক, ডান থেকে বিদ্যাপতি কীটস থেকে মধুসূদন পর্যন্ত তার বিচরণ। নায়িকা লাবণ্য প্রকাশ্যে রবীন্দ্র কবিতার ভক্ত এবং গোপনে একজন আধুনিক ভঙ্গির কবি, না হলে শেষের কবিতাটি লিখতে পারতো না। শুধু কবি বলেই নয়, লাবণ্য তার আত্মনিবেদনের শেষ কথা কবিতায় বলেছে— 'মিতা ত্বমসি মম জীবনং......'। আসন্ন মিলনের মুখে বেদনা-বিচ্ছেদের সুর এনেছে কবিতায় ভাষায় (২০, ২১নং)। চির বিচ্ছেদ ব্যক্ত করেছে একটি দীর্ঘ কবিতায় (কালের যাত্রার ধ্বনি)। অমিত বইয়ের শুরুতে আত্মপরিচয়

দিয়েছে দীপ্ত কণ্ঠ কবিতায়, লাবণ্যকে কেন্দ্র করে তার মনের কলাপী নৃত্য অজস্র কবিতায়, বিচ্ছেদের মুহূর্ত চিহ্নিত করেছে কবিতায়।

অমিত-লাবণ্যের প্রেমের সূচনা বিকাশ পরিণতি—ঘটনা সামান্যই। দেখা করেছে অনেকবার। কথা বলেছে প্রচুর। কিন্তু তাতে কথা ছিল সামন্যই। অমিত যখন কবিতা না বলেছে। তখনও ছবির পর ছবির এঁকেছে। প্রেমের-মিলনের-বিরহের চিত্রকল্প। সেগুলি কবিতাই। 'মানসী', 'দীপক', 'মিতালি' সবই তরুণ প্রেমের কল্পনা, রূপ পেয়েছে শব্দে, যতই তত্ত্ব শিরোমণি উঁকি মারুন ভেতর থেকে, তাই এরা কবিতাই, গদ্য ভাষা এদের কবিত্ব রুখতে পারছে না। আর কবিতার ব্যাখ্যা অমিতের, তাও বেড়ে উঠেছে আবশ্যকের হিসেব না করে। তারা বিশ্লেষণ ধর্মী সমালোচনা নয়, নিজের অন্তরভেদী উপলব্ধি গদ্যকে কবিতার সঙ্গী করে নিয়েছে। এতোসব কারণে বইটিকে 'কাব্যোপন্যাস' অভিধা দিতেই হয়।

অলঙ্করণ ঃ দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর চিত্রবিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো শিল্পীদ্বয়ের কাছে। শেষের কবিতা প্রবাসীতে ছাপা হওয়ার সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদের নাম প্রস্তাব করলে, রবীন্দ্রনাথ সম্মতি জানিয়ে তাঁকে লিখেছিলেন ঃ

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

ভালোই হয়েচে। আমার বিশ্বাস দেবীর হাতে ছবি আরো ভালো হবে। ওর তুলিতে রস আছে, শুধু রূপ নয়। আপনি নির্ভয়ে ওর 'পরে ভার অর্পণ করতে পারবেন।..

ইতি ৯ শ্রাবণ ১৩৩৫

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবাসীতে শেষের কবিতা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৫ ভাদ্র থেকে চৈত্র পর্যন্ত, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর আঁকা সাতটি ছবি সহ।

১) অমিট রায় — ভাদ্র ১৩৩৫, পৃঃ ৬৫১

২) হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা,... টেনিস ব্যাট... বোনেরা চলে গেল দার্জিলিং-এ — ভাদ্র ১৩৩৫, পৃঃ ৬৫৯

৩) দেখলে আরেকটা গাড়ি উপরে উঠে আসছে... পরস্পর আঘাত লাগল — ভাদ্র ১৩৩৫, পৃঃ ৬৬০

৪) লাবণ্য — আশ্বিন ১৩৩৫, পৃঃ ৭৯৭

৫) কোন একটা চমৎকার চিন্তা অবনীশের পড়াশুনার কাঁধে চেপে বসে — আশ্বিন ১৩৩৫, পৃঃ ৭৯৭

৬) যোগমায়া — কার্তিক ১৩৩৫, পৃঃ ২১

৭) পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝর্ণাধারা.... সেইখানে পাথরের উপর দুজনে বসল — কার্তিক ১৩৩৫, পৃঃ ২৩

তেল রং ছবির যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিতেই টেম্পারায় এই ছবিগুলি আঁকা হয়েছিল।[৬]

চরিত্র

অমিত

পাঁচ জনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। নির্জলা যৌবনের জোরেই একেবারে বেহিসেবি, উড়নচন্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে — সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে। অমিত সোনার দিগন্ত রেখা — ধরা দিয়েই আছে, তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। লিলি গাঙ্গুলীকে অমিত যখন বলে — "গঙ্গার ওপারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এপারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্ত কালের মধ্যে আর কোনোদিনই আর হবে না। তার যা সত্য ঐ বলার কায়দা টুকুর মধ্যেই। লিলি বোঝে তার বেশি দাবি করতে গেলে বুদ্‌বুদে উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করা হয়। কথার যাদুকর তাও থামে না — "ঐ ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি — বেটোফেনের চন্দ্রালোক গীতিকা"। পাগলা স্যাকরা গড়া এমন কত মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে অমিতের হিসেব নেই। অমিতের মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। অমিতের কথাতেই অমিত রূপ পায় — "ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতি ঠিক জায়গায় কষে আঁটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ে অধিকাংশ ব্যক্তি চরিত্রে যে রোমান্টিক প্রবণতা, তা কাব্য চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। উপন্যাসের চরিত্র হলেও এদের রূপায়ণের সার্থকতা এসেছে যতটা ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে, ততটা সর্বদা অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মাধ্যমে নয়। এই ব্যঞ্জনাধর্ম, আমরা জানি, কবি-স্বভাবের নির্যাস। শচীশ নিজের সম্পর্কে স্পষ্টতই বলেছে— 'আমি কবি'। আপন রহস্যময় সত্তার অন্তর্লোকের অন্বেষণে তার যে সুতীব্র ব্যাকুলতা, যে মহৎ আকাঙ্ক্ষা— তাতেই তার এই 'কবি' মনের যথার্থ পরিচয়। অমিত জন্ম রোমান্টিক কবি; নিবারণ চক্রবর্তীর ছদ্ম-পরিচয়ের নেপথ্য থেকে সে অবিরাম কবিতা সৃষ্টি করে চলেছে। আর সেই কবিতার মাধ্যমেই তার চরিত্রের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। কবিতাই তার প্রেমকে ভাষা দিয়েছে, প্রেমের উপলব্ধির নানা স্তর অতিক্রান্তির মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের যে ক্রম বিবর্তন, তা কতকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে তার ক্রমবিকাশিত কবিতায়। 'পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি' কবিতায় অমিতের চিত্তের রোমান্টিক বন্ধনমুক্তির চাঞ্চল্য ও উল্লাস, 'ঝরণা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা'-র অপেক্ষাকৃত গভীর প্রেমের উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তার সর্বশেষ কবিতা 'তব অন্তর্ধান পটে হেরি তব রূপ চিরন্তন'-এর বিচ্ছেদ-বিষণ্ন প্রগাঢ় প্রেম চেতনায় উত্তীর্ণ হয়েছে। অমিত-ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের আর কোন নায়ক হয়তো কবিতা লেখেনি। কিন্তু তাদের অনেকের মধ্যেই কবি প্রকৃতির স্ফুরণ ঘটেছে। চার অধ্যায়ের নায়ক অতীন বিপ্লবী ও প্রেমিক। এই দুই সত্তার সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে তার মনের প্রবল উদ্দামতা, তার দুঃসাহসী চিত্তবৃত্তি। কিন্তু উপন্যাসে দেখি, তার প্রেমিক মনের একটি বিশেষ ঝোঁক স্মৃতি রোমন্থনের প্রতি। এলার সঙ্গে প্রথম দেখার উষ্ণ মধুর স্মৃতি-চারণ-প্রবণতা তার মনের রোমান্টিক কবি স্বভাবের সংবেদন সৃষ্টি করে। দুঃসহ যন্ত্রণাময় বর্তমানের মধ্যে দাঁড়িয়েও অতীতের দিনগুলি থেকে যে স্মৃতির স্বর্ণ-মুহূর্ত সঞ্চয় করে রাখতে চায়, সে তো কবি-ই।

উপন্যাসটির প্রত্যেকটি চরিত্র সুস্পষ্ট রেখায় আঁকা, অপূর্ব সেই রেখার লীলা। কি প্রখর সুতীক্ষ্ণ সেই দৃষ্টি। ভিতরের ও বাইরের ভাব ও ভঙ্গি লেখনীর মুখে চিত্রকরের তুলির চাইতে সজীব হয়ে ফুটেছে। অমিতের মনের পরিচয় আমরা পাই তার প্রত্যেক কথায়, চলনে বলনে, প্রত্যেক বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে, তার বেশে-ভূষায়। অমিত রায়— বিকল্পে 'অমিট রায়ে' — বাংলা দেশের কোন বিশেষ শ্রেণীর আধুনিক শিক্ষিত

মার্জিত তারুণ্যের একটা টাইপ, সে টাইপের মধ্যে অস্পষ্টতা কোথাও নেই। "মেয়েদের প্রতি ব্যবহারে সে উদাসীন নয়, বিশেষভাবে কারো প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোথাও মধুর রসের অভাব ঘটেনা। এককথায় বলতে গেলে মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে।" লিলি গাঙ্গুলীর একটি কথার মধ্যে লাবণ্যর বিশ্লেষণের মধ্যে অমিতের যে পরিচয় আছে, সে পরিচয় বহু কথা বলেও জানাবার সুবিধা ছিল না। অমিতের আরেক দিকের পরিচয় লিলি গাঙ্গুলীর একটি কথায় আছে, "তারপরে সোনার মুহূর্তটি অন্য মনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কতো মুহূর্ত খসে পড়ে গেচে; ভুলে গেচো বলে তার হিসেব নেই।"

অমিত যখন কবিতা না লিখে কথা বলে, তখনও সে কবিতাই সৃষ্টি করে চলে— সে ভাষা ছন্দোবদ্ধ না-ই বা হলো। অমিত লেখায় আলাপে বোধে জীবনে ব্যক্তিত্বে কবি। তার মনে খাসি পাহাড়ের শ্যামল তরুলতা আর শ্যাওলা ধরা পাথরের রঙ এসব নিয়েই কবি প্রেমিক অমিত জ্বলতে লাগল। কবিতা তার প্রেমকে ভাষা দিয়েছে। প্রেমের উপলব্ধির নানা স্তর অতিক্রান্তির মধ্য তার চরিত্রের যে ক্রম বিবর্তন, তা কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে তার ক্রম প্রকাশিত কবিতায়।

'অমিত চরিত' অংশে রবীন্দ্র বর্ণনা ঃ "অমিত নেশাই হলো স্টাইলে। কেবল সাহিত্য বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ রয়েছে।......অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে।....... চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরী হয় না; মনটা এমন এক রকমের চকমকি যে, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে।.... অমিতের দুর্লব যুবকত্ব যৌবনের জোরেই একেবারে বেহিসেবী উড়নচন্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে, হাতে কিছুই আসে না।" এখানেই চরিত্রটি স্বতন্ত্র। অমিত অনেক কন্যার আকাঙ্ক্ষার পাত্র হয়েও অবিবাহিত; সকলের প্রতিই তার পক্ষপাত, "অথচ সবাই জানে, ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ মেয়েদের সম্পর্কে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না।" পরিচিত মহলে সে কল্পনার মানসীর খোঁজ পায়নি। শিলং পাহাড়ে অমিত তাকে দেখল, "ড্রইং রুমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্ম স্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার জন্য জায়গাটি পাওয়া যায়।" অমিতের বুদ্ধিদীপ্ত বাক্‌চাতুর্য্যের কিরণে লাবণ্য অভিভূত। অমিত কল্পনার মানসীমূর্তি প্রত্যক্ষ করল। অমিত সম্পর্কে রবীন্দ্র বক্তব্য ঃ "অমিতের নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে ক্ষমা নেই; বিচার আছে ধৈর্য নেই; ও অনেক জেনেছে শিখেছে কিন্তু শান্তি পায়নি— লাবণ্যের মুখে এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয় যা ওর বিবেচনা শক্তির গভীরতায় অচঞ্চল।" অমিতের সূক্ষ্ম সুদূরপিয়াসী মন লাবণ্যের চরিত্রের মহিমামন্ডিত মাধুর্যকে অনুধাবন করতে পেরেছিল। তাই তার প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিতে লাবণ্যের সময় লাগেনি। সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে নিজের অন্তরলোকের সন্ধানে অমিত নিজেও বিস্মিত। তাই লাবণ্যকে বলেছে "আজ সমস্তই নতুন করে জানছি, নিজেকেও।" প্রেমের স্পর্শে তার হৃদয়ের উন্মাদনাকে সে ব্যক্ত করেছে নিবারণ চক্রবর্তীর ছদ্ম আবরণে। যে জগতের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না, সেই পরিচয় আজ তার বন্দী হৃদয়কে মুক্তির সন্ধান দিয়েছে। অচেনাকে বরণ করার ব্যাকুল আগ্রহ ফুটেছে তার উক্তির প্রতি ছত্রে —

"হে অচেনা
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না,
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি দিক,

তোমার চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিক তাহে জীবন অঞ্জলি।।”

লাবণ্য অনুভব করেছিল যে অমিত তার মনোরাজ্যে যে মাসন সুন্দরীর কল্পনা করেছে, তাকেই আরোপ করেছে লাবণ্যের উপর। তাই সে বলেছে, “আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছে অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলি আমাকে গড়ে তুলেছেন।” লাবণ্যের সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম মুহূর্তে যে উপলব্ধিতে অমিত তীব্র বেগে আন্দোলিত সে প্রেমে উদ্দামতার দিকটাই প্রবল ছিল। ভালোবাসার এই নতুন অনুভূতিতে সে দীপ্ত কণ্ঠে বলেছে— “রে অচেনা, মোড় মুষ্টি ছাড়াবি কী করে / যতক্ষণ চিনি নাই তোরে ?....... না চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাবো, একেই বলে মুক্তি তত্ত্ব।” অমিতের কাব্য ছন্দে যে জীবন পিপাশা ব্যক্ত তার উন্মাদনা সে লাবণ্যের অন্তরে সঞ্চারিত করতে চেয়েছে। বিশ্বাস, মানব চরিত্র স্থির নয়, জীবনের এক অভিজ্ঞতার আঘাতে তার বহুমুখী বৈচিত্র অভিব্যক্ত। লাবণ্য তার বাস্তব বুদ্ধিতে বুঝেছে, “ জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। যারা জগতে উৎসব স্বভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে। কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যই।” তাই নিজের মনের দিকে দৃষ্টিপাত করে অমিত বলেছে, “যেখানে খুব করে মিল সেইখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি আমাদের সকলের চেয়ে বড় যে পাওয়া সে মিলন নয়, মুক্তি।” যে প্রেম একদিন উদ্ধত, বাধা বন্ধনহীন ছিল, সেই প্রেম অমিতের হৃদয়ে পূর্ণতার আনন্দে বিনম্র। তাই লাবণ্যের উদ্দেশ্যে তার শেষ কথা —

“তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তণ।
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার অন্তিম আগমন।
লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি;
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি নিয়েছ আপনি।
....
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজা মূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।”

অমিতের প্রেম অমিতেরই মতো, অমিতের কবিতার মতো। উজ্জ্বল প্রাণবন্ত। প্রচন্ড গতিশীল — ভাবে বা ছন্দে অথবা উভয়ত। রোমান্টিক অতৃপ্তি, বিষণ্নতা, বিচ্ছেদ মুক্তির কথা মাঝে মাঝে এসেছে —

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে,
ছিন্ন হবে ডোর—
তোরে মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।
অথবা
দূরে যেতে হবে
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয়গান।

তবে বেশিরভাগ আনন্দের জয়গান, ক্বচিৎ সংরাগ – তপ্তও।

অমিত ভবিষ্যৎ দাম্পত্য জীবন নিয়ে যে সব কল্পচিত্র এঁকেছে — ডায়মন্ড হার্বারের বাগান, মানসী – দীপক – মিতালী, কিংম্বা কলকাতার সস্তা বাসাবাড়ি, অথবা অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় পাহাড়ী পাকদন্ডী বেয়ে

শুধু চলা। এতে অমিতের রোমান্টিক পরিকল্পনার সঙ্গে মিলেছে দাম্পত্য জীবনের প্রাত্যহিক মালিন্যকে চলার বেগে বা কাল্পনিক বিচ্ছেদের যোগে চির নবীন রাখার ভাবনা। আসলে অমিত ওইসব পরিল্পনার মধ্যে গদ্যে কতগুলি কবিতার লিখেছে। তার স্বভাবের সঙ্গে সমতাল সঙ্গত করেছে।

এক জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ কথা বলে উঠল। তারার ফুল কণ্ঠ বেড়ে মালা গেঁথে দিল মাঠে মাঠে ফুলের বৈচিত্রে ধরনী তার ধৈর্য হারালো, তখন নদীর ধারে বসে অমিট রায়ের ভাব বিলাসী চিত্ত এক তরুণীর মুখের চেয়ে ধৈর্য হারালো। সমস্ত প্রকৃতি যখন প্রকাশের প্রাচুর্য্যে কম্পিত ও উদ্‌বেলিত তখন অমিত কেতকী মিত্রের আঙ্গুলে আংটি পড়িয়ে বলে উঠল, tender is the night and hoply the queen moon is on her throne, চাঁদ যখন ডুবল, ধরনী যখন তার ফুলের সজ্জা ঘুচালো, চিত্তের মধ্যে ভাবের তরঙ্গ যখন বিলীন হয়ে গেল, তখন আর মনেও রইল না, কোন এক ভাবোদ্বেলিত মুহূর্তে কে কবে কার হাতে আংটি পড়িয়ে দিয়েছিল। আংটি পড়ানোর ব্যাপারটা গৌণ, মুহূর্তটাই অমিতের কাছে সত্য। কিন্তু সেই জ্যোৎস্না রাত্রিতে নদীর ধারে বসে অমিতের আংটি পড়ানোর মধ্যে সে ভবিষ্যৎ মিলনের সূচনা দেখেছিল। সেই মুহূর্তটিকে সে অনন্ত জীবনের মধ্যে ব্যাপ্ত করে ধরে রাখবে এই ছিল তার মনের কথা। কেতকী মিত্রের ওপর মুঠি আলগা হলো, মুর্তির বদল ঘটলো। তখন দাদারই কায়দা কারখানা বকযন্ত্র পরম্পায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই করা বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স গায়ে মেখে শ্রীমতী কেতকী মিত্র হয়ে উঠল কেটি মিটার। কেটি মিটার কেতকী মিত্রের কৃচ্ছ্র-সাধনের রূপ, নিষ্ঠুর বেদনার রূপ, জীবনকে ব্যঙ্গ করবার রূপ।

অমিত-লাবণ্যের প্রত্যাশিত মিলন ঘটেনি। আধুনিক রবীন্দ্রনাথ যোগাযোগের কুমুদিনীর বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি দিলেন লাবণ্যকে। লাবণ্য-শোভনলাল আর অমিত-কেতকীর বিবাহের মধ্যে জীব বৃত্তির স্বীকৃতি। একদিকে 'ওড়ার আকাশ' আর অন্যদিকে 'ছোট বাসা' জীবনের দুই মেরুর কোনটিই মিথ্যা নয়। বিবাহে সঙ্গ-অসঙ্গ কি একত্রে মিলতে পারে না ? উত্তরে অমিত বলেছে 'যে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভাল; যে তা না পায়, দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক মেলে রাজকন্যা, সেও বড় কম সৌভাগ্য।'

বিবাহের নবতম দর্শন অমিত প্রকাশ করেছে, রূপকের ভাষায় — 'কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল — প্রতিদিন তুলবো, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।'

প্রেমের এই দ্বৈত রূপ রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের বিস্ময়কর উপলব্ধি পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভোগ-নির্ভর নিত্যতার উর্দ্ধলোকে প্রেমের জ্যোতির্ময় স্বরূপটি উদ্ভাসিত হলো শেষের কবিতায় — 'আমার প্রেম রবি কিরণ হেন, / জ্যোতির্ময় মুক্তি দিয়ে তোমার ঘেরে যেন।'

বন্ধনের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে প্রেম এখানে মুক্তির ভাস্বরতায় উজ্জ্বল।

লাবণ্য

রবীন্দ্র-ভাষায় লাবণ্যের প্রথম পেন্টিং — "সদ্য-মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখার আঁকা সুস্পষ্ট ছবি — চারিদিকে সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দর পর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এই মাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী সমস্ত আন্দোলনের উপরে — মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে।.... পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।"

লাবণ্যের টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুট আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়।

অমিতের ভাষা-শিল্পে— "লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষ স্বভাবত আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকেও ভোলাতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথের কবি মানসে ও কাব্যনাটক-উপন্যাস-গল্পে নারী অনেকটা স্থান জুড়ে আছে। কবির মতে সমাজে পরিবারে নারীর অমর্যাদাই তার বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন "মাতৃবেশে প্রেয়সীবেশে সেবিকাবেশে নর সমাজকে"[৭] ঘিরে আছে নারী। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে সমাজের সমস্ত অংশের সঙ্গে নারীর চিন্তা জগতেও পরিবর্তনের হাওয়া এসে লেগেছে। কবি দেখলেন, এ নব জাগ্রত বিরাট শক্তির প্রতি আর উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। এসময় কবিতর মনেও নারী সম্পর্কে বিচিত্র প্রশ্নের উদয় হয়েছিল যা কিছুদিন পরেই যোগাযোগ ও শেষের কবিতা উপন্যাস দুটির মধ্যে রূপ পায় এবং মহুয়ায় তা পরিপূর্ণ কাব্যময় অনুভূতি রূপে উৎসারিত হয়।[৮] যোগাযোগ, শেষের কবিতা ও মহুয়া ১৯২৯ সালেই প্রকাশিত হয়। "খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে কবি সাতষট্টি বছর বয়সে একসঙ্গে এমন দুটি উপন্যাস লিখলেন যার পরিবেশ, বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী সম্পূর্ণ আলাদা।"[৯] রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমারের ভাষায় "এ যেন মহাকাব্যের পর লিরিক রচনা।"

লাবণ্যর প্রেমার্থী শোভনলালের পিতা যখন নোটবুকের মধ্যে লাবণ্যর ফটো আবিস্কার করে বাড়িতে লাবণ্যর পিতাকে চূড়ান্ত অপমান করে যান, ক্রুদ্ধ লাবণ্য নীরবে সে অপমান সহ্য করেনি। তার পিতার ছাত্র শোভনলালকে সে তাদের বাড়ি থেকে বহিস্কার করে দেয়। পাত্র হিসাবে এতো উপযুক্ত উচ্চ শিক্ষিত সহপাঠিকে বিবাহযোগ্যা কন্যা কর্তৃক এভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দেবার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব। শুধু তাই নয়, লাবণ্যর পিতা যখন ৪৭ বছর বয়সে এক মহিলার প্রেমাসক্ত হয়ে তা বিয়ে করতে উদ্যোগী হলেন তখন স্বাধীনচেতা লাবণ্য পিতার কাছ থেকে একটি পয়সাও গ্রহণ না করার সংকল্প ঘোষণা করল এবং পিতার কাছে কেবল আশীর্বাদ ভিক্ষা করল যাতে সে নিজের পথ নিজেই বেছে নিতে পারে। সে যুগের আইবুড়ো মেয়েদের মধ্যে, সে যত উচ্চ সমাজের মানুষই হোক না, এরকম স্বাধীন চিত্ততা অভাবনীয় ব্যাপার ছিল।

"আর এক সলিতার জটের পাক লাগিয়া রহিল লাবণ্যের মনে। প্রথম যৌবনে তাহার মনের নরম জমিটুকু গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েচে—খুব পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে— বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়ে না।"[১০] অন্তর্মুখিতা লাবণ্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তার মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেওয়ার মত দীপ্ত পৌরুষ শোভনলালের ছিল না। লাবণ্যর আঘাতকে সে নীরবে সহ্য করে বিদায় নিয়েছে। অমিতের সঙ্গে মোটার গাড়ির দুর্ঘটনা লাবণ্যকে নাড়া দিল। নিজেকে বাস্তব রূপে দেখতে পেল— জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে। অমিতের প্রেমের দুর্জয় আবেগ, তার মনের গভীরে সুপ্ত প্রেমের দীপকে প্রজ্জ্বলিত করেছে। লাবণ্য অনুভব করেছে যে, এ প্রেম তার কল্পনা বিলাস নয়, এ তার জীবনে একান্তভাবেই সত্য।

একদিন লাবণ্য ছিল গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্তি। সেদিন সে শোভনলালের নীরব প্রেমকে পদদলিত করেছে। কারণ তখন তার নারীসত্ত্বা ছিল সুপ্ত। কিন্তু অমিতের উদ্দীপ্ত যৌবনের বিপুল আবেগ লাবণ্যর চেতনার উদ্বোধন ঘটিয়েছে, অমিতের ভালোবাসার বন্যায় আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। কিন্তু অমিতের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার বাসনা যতখানি উচ্ছ্বসিত, লাবণ্য ঠিক ততটাই নিজের মধ্যে আত্মস্থ, নিজেকে যেমন সে অনুভব করেছে, ঠিক সে ভাবেই সে তার প্রখর বিচার বুদ্ধি দিয়ে অমিতের হৃদয় ধর্মকে বিশ্লেষণ করেছে। এ প্রসঙ্গে অমিতের উক্তি "লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্ত স্পষ্ট করে জানতে চায়।" সেই বুদ্ধির আলোতেই লাবণ্য অনুভব করেছে যে অমিতের রোমান্টিক দৃষ্টিতে গড়া রঙ্গীন পৃথিবী, দাম্পত্য জীবনের রূঢ় বাস্তবের আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে, যোগমায়াকে সে বলেছে, "বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাইনে।.... খুঁতখুতে মন যাদের তারা মানুষকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে দিয়ে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে স্ত্রীপুরুষ যে বড় বেশী কাছাকাছি এসে পড়ে— মাঝে ফাঁক থাকে না, তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয় নিতান্ত নিকটে থেকে।..... বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয় তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।" এ বিশ্লেষণ লাবণ্যর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব অপেক্ষা আর একটি স্থির বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে। লাবণ্য তার সূক্ষ্ম অন্তর দৃষ্টি নিয়ে জীবনের বাস্তবরূপকে বিচার করেছে। লাবণ্য-অমিতের সম্পর্কের সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ তাদের মনোবিশ্লেষণ করেছে, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সৃষ্টি করেননি। অমিত ও লাবণ্য এক আঘাতে মিলিত হয়ে পরস্পরের জীবনকে আলোকিত করে কক্ষান্তরে চলে গেছে। অমিতের প্রতি তার প্রগাঢ় ভালোবাসা তাকে আত্মবিস্মৃত হতে দেয়নি কখনও। নিজের মর্যাদাবোধ নিয়ে লাবণ্য বুঝেছে যে অমিতের সমাজ লাবণ্যর সমাজ থেকে 'সহস্র যোজন দূরে'। তাই—

"যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালমন্দ মিলায়ে সকলি।"

সেই শোভনলালের সঙ্গেই লাবণ্য তার জীবনকে গ্রথিত করেছে। আর অমিতের উদ্দেশ্যে রেখেছে—
–

"সব-চেয়ে সত্য মোর সেই মৃত্যুঞ্জয়,
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশ্যে।"

গদ্যের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ লাবণ্যের কাব্যময় অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পাণ্ডুলিপি

প্রথম পাণ্ডুলিপিতে 'কত ধৈর্য ধরি' কবিতার বদলে একটি ইংরেজী রোমান্টিক কবিতা ছিল। পরে দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে কল্পিত নিবারণ চক্রবর্তীকে উপস্থাপনার পর 'কত ধৈর্য ধরি' কবিতাটি সংযোজিত হয়। বর্তমানের প্রচলিত মুদ্রিত গ্রন্থে সর্বশেষ (১৭ সংখ্যক) পরিচ্ছেদের যেরকম সূচনা, তার প্রথম পাণ্ডুলিপিতে (অমিয় চক্রবর্ত্তীর হস্তাক্ষরে) ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে তার অনেকখানিই বর্জিত হয়। অর্থাৎ ঐ পাণ্ডুলিপিতে শেষ পরিচ্ছেদে যতিশঙ্কর ও তার সঙ্গে প্রেম, রোমান্স ও বিবাহ নিয়ে অমিতের তত্ত্বালোচনা বাদ পড়েছে। সম্ভবত উপন্যাসে এক তাত্ত্বিকতার অবাঞ্ছিত অতিরেক বলে সে সময় লেখকের মনে হয়েছিল। পরে প্রবাসীতে ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় আবার মতের বদল হয় ও বর্জিত অংশ পুনঃসংযুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে যতিশঙ্কর না থাকায় তার বদলে আছে যে, ডাক ঘরে গিয়ে ডাক বাবুর হাতে অমিত চিঠি দিয়ে আসে। যে চিঠির আরম্ভ হল এইরকমটি 'সেদিন সন্ধ্যেবেলায়...... ' ইত্যাদি। সর্বশেষ (১৭ সংখ্যক) পরিচ্ছেদের এই অংশটি ('সেদিন সন্ধ্যেবেলায়.......') থেকে প্রচলিত মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির মিল আছে।

ভাষার বন্ধন

শেষের কবিতার ভাষারীতির অভিনবত্ব ক্রিয়াপদের সংখ্যাল্পতায়, কথ্য শব্দের সুপরিকল্পিত ব্যবহারে, নতুন শব্দ যোজনার বিচিত্র কৌশলে সুচিহ্নিত। শেষের কবিতার বাক্য গঠনে এবং শব্দ নির্বাচনে অভূতপূর্ব দুঃসাহস আমাদের বিস্মিত করে। গবেষণাগারের রাসায়নিক পরীক্ষার মতোই বিভিন্ন প্রকৃতির শব্দ ও বাক্যরীতিকে যথেচ্ছভাবে মিলিয়ে-মিশিয়ে কেটে-ছেঁটে অভিনব তাৎপর্যময় করে তোলবার কি বিচিত্র কৌশলই না শেষের কবিতার শিল্প দেখিয়েছেন। অজস্র ইংরেজী শব্দ বাংলা শব্দের মাঝে মাঝে গেঁথে দেওয়া হয়েছে রং বেরঙের পাথরের মতো। উপন্যাসে এত ইংরেজী শব্দের ব্যবহার শেষ তিনখানি উপন্যাসের আগে দেখা যায় না। ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবেশ ও উচ্চ শিক্ষিত নায়ক-নায়িকাদের মুখে এই শব্দগুলি বেমানান হয়নি, বরং চরিত্রগুলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সাহায্যই করেছে। তাই 'সেন্টিমেন্টাল', 'লয়ালটি', 'রিসিভরস্ অফ স্টোলন্ প্রপার্টি', 'পশ্চারিটি', 'ডিস্টিংগুইশড্' – এর মতো খাস ইংরেজী শব্দ প্রবহমান বাংলার মধ্যে অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে। ইংরেজীর মতো সংস্কৃত শব্দের প্রতিও লেখকের মমত্ব কম ছিল না, তাই উন্নাসিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজেও 'দেহলিদও পুষ্পা', 'পথিক-বধূ', 'একটি অনতিপক্ক ফলের মতো', 'পুচ্ছমর্দন' প্রভৃতি খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ইংরেজী শব্দের সঙ্গে সহাবস্থান করেছেন। এই সুমার্জিত পটভূমিতে সম্ভ্রান্ত নর-নারীর প্রণয়োপাখ্যান সাধু শব্দের পাশে পাশে 'ঠাট ঠমক', 'উড়নচণ্ডী', 'বাঁদরামি', 'ছ্যাৎলা পড়া', 'মকশো করা', 'পোড় মুখী'-র মতো ঘরোয়া চলতি শব্দগুলিও সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ব্যাকরণের নিয়ম ভাঙ্গা 'রন্ধুনী', 'আলাপিতা', 'আগ্নেয়তা', 'বৈবাহন', 'ফজলিতর' ইত্যাদি শব্দগুলিও ব্যকরণ সম্মত শব্দের নিকট আত্মীয়ের মতই বসবাস করেছে। আবার প্রয়োজনে কখনো কখনো ইংরেজী শব্দের স্বকৃত অনুবাদও বাদ যায়নি, যেমন- 'ট্যাঁকঘড়ি', 'বর্ষাতি', 'ছাড়', 'চিঠি' ইত্যাদি।

এত গেল শব্দের কারিগরী— শেষের কবিতার উপমার জৌলুষই বা কম কিসে! 'ন্যুরালজিয়ার ব্যথার মতো', 'পাহারা ওয়ালার চোর-ধরা গোল লণ্ঠনের হাসি', 'খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো', 'ইংরেজ বাড়ির

বুলডগের মতো'– একেবারে চমক লাগানো উপমা। এছাড়াও রয়েছে 'শানিয়ে বলা বানিয়ে রাখা', 'কন্যাদায়ের বন্যা' কিংবা 'মেনে নেওয়া' আর 'মনে নেওয়া'-র মতো প্যারাডক্সের খেলা। উদাহরণ তুলে শেষের কবিতার ভাষার মাহাত্ম্য বোঝানো অসম্ভব— কারণ ভাষারীতির এমন বিচিত্র সমাবেশ ও সমন্বয় বাংলা সাহিত্যে বিরল। তবে সযত্ন চর্চিত কৌশল মার্জিত গদ্যরীতির যথার্থ রূপটি উদ্ধৃত বাক্যগঠন প্রণালীতে কিছুটা আঁচ করা যাবে।

"ওর স্ল্যাঙ বিকীর্ণ ইংরেজী ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত, বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর-অলস-কটাক্ষ-সহযোগে অনতিব্যক্ত —"

অথবা

"ওর সমুচ্চ—খুরওয়ালা জুতো জোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়; ছাগল জাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন।

কবি-কল্পনার অতুলনীয় ঐশ্বর্যে এপিগ্রাম দীপ্তির চরম ক্ষুরধার তীক্ষ্ণতায়, হ্রস্ব অথবা অর্থ গৌরবপূর্ণ ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতে ও ভাষণে, বিষয়গত ঐক্যবোধে, সর্বোপরি দৃঢ় সংহত সমগ্রতায় শেষের কবিতার মতোন কাব্যোপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর রচিত হয়নি। লঘু গতিছন্দে চলন, অথচ তারই মধ্যে দৃপ্ত শক্তি ও আভিজাত্যের স্পন্দন, লঘু ছন্দলয়ে আশ্চর্য কঠিন সুগভীর ভাব-গভীর বুদ্ধি-দীপ্তভাষণ। এমন বুদ্ধিসাধ্য দৃঢ় হ্রস্বতা অথচ এমন সরস কবিত্ব সুষমায় মণ্ডিত।

উপন্যাসের কন্টেন্ট অনুযায়ী ভাষা কখনও ঈষৎ কাব্য সৌরভযুক্ত। কখনও ব্যঙ্গের ঝাঁঝ মেশানো, কখনও উপমা, এপিগ্রামে অলংকৃত বা মননধর্মে উজ্জ্বল হতে পারে। উপন্যাসের ভাষা যদি কন্টেন্টের সার্থক প্রকাশ মাধ্যম না হয়ে প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে, যদি ভাষা বিষয়বস্তুকে প্রচ্ছন্ন ও গৌণ করে রেখে নিজের সৌন্দর্য্য ও শিল্প চাতুর্য্যকে বিশেষভাবে ঘোষণা করতে চায়, তাহলে উপন্যাসের শিল্প বিচারে সেই ভাষারীতির সার্থকতা সম্পর্কে স্বতই সংশয় জাগে। এই প্রথম তিনি তার পরিচিত জীবন পরিবেশের বাইরে থেকে একধরণের সংকীর্ণ অতিনাগরিকতা পন্থী ইঙ্গ বঙ্গীয় সমাজ প্রেক্ষীত তার উপন্যাসে নিয়ে এলেন। স্বভাবতই এদের কৃত্রিম জীবনের রূপায়ণে তথা এদের মুখের কথায় অতি প্রসাধন অতি অলংকরণ প্রয়াস হয়ত এক অর্থে বাস্তবতা-বিরোধী নয়। ঈষৎ কৌতুকাশ্রিত ব্যঙ্গরস-মেশানো, উইট, এপিগ্রাম ও প্যারাডক্স দীপ্ত পালিশ করা ঝকঝকে ভাষা বিন্যাস সহযেই আর্কণীয় হয়ে ওঠে।

অমিতের কথা সহজ সাধারণ শব্দের সমাহার মাত্র নয়। তার ব্যবহৃত সেই অজস্র শব্দরাশি থেকে বিকীর্ণ হয়েছে কবিতার তীব্র সৌরভ, ঠিকরে পড়েছে মননের প্রসারিত সচেতন রূপের তীক্ষ্ণ আলোয়, উপমা-এপিগ্রাম-প্যারাডক্সের চোখ-ঝল্‌সানো ঔজ্জ্বল্য-অর্থাৎ সব মিলিয়ে এখানে, এই রোমান্টিক আখ্যান অংশেও আবার সেই অতিসচেতন Stylised ভাষারীতির আত্মঘোষণা। বস্তুত ইঙ্গবঙ্গ সমাজের রূপায়ণে সচেতন ভাষার প্রসাধিত রূপ বাস্তবতার আংশিক আভাস আনলেও অমিতের 'সিরিয়স' প্রেমকাহিনী বিন্যাসে, প্রেমিক অমিতের প্রণয় ভাষণে এই ভাষারীতিকে আদৌ সজীব ও স্বাভাবিক মনে হয় না ! এই ভাষা-শৈলী সম্পকে শ্রীযুক্ত অমলেন্দু বসুর মন্তব্য প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্যঃ

"এই বিশেষ শৈলী 'শেষের কবিতা' ও সমাসাময়িক অন্যান্য গদ্যরচনার বিশেষ ভাবধারার সঙ্গে অবশই সঙ্গতি কিন্তু.... এর কোন সার্বিক প্রয়োগ সম্ভাবনা নেই।"[১১]

অমিতের স্বভাব কবির। সেজন্য তার সংলাপ কবিত্বের নিশ্চয় অপ্রত্যাশিত নয়। আর তাই দেখি, 'মহুয়া'-র সমকালে উপন্যাসের রোমান্টিক সংলাপেই যে শুধু প্রণয় কবিতার সেই সঞ্চারিত তা নয়, নিবারণ। চক্রবর্তীর বকলমে অমিতের রোমান্টিক লিরিকগুলিও আসলে অমিতেরই সংলাপ। বস্তুত সমগ্র উপন্যাসটিই

এক ধরণের 'কাব্যভাষা'-র সুবাসে আচ্ছন্ন, মনে হয় যেন 'লিপিকা' (১৯২২) উত্তর ও প্রাক্-পুনশ্চ' মেজাজ কিছু পরিমাণে এনে দিতে চেয়েছেন। বস্তুত যেখানে সংলাপ নেই, কেবল লেখকের নিজস্ব বিবৃতি বা বর্ণনা, যেখানে রবীন্দ্রনাথের লাবণ্যময় কাব্য সুরভিত গদ্য আমাদের মুগ্ধ করে। তা নিঃসংশয়ে উপন্যাসের শিল্পদেহে সুষমা ও সংগতি অব্যাহত রাখে। অমিত-লাবণ্যের রোমান্টিক এক করুণ-মধুর মুহূর্তের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় লেখক গদ্যভাষাকে ব্যঞ্জনাময় কবিতার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যে মন্ডিত করে তুলেছেন ঃ

"আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানা পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে। সেই অমর্ত্য জগতের অব্যক্ত ধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হলো ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলার ফুলের মত, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।"

শেষের কবিতার সংলাপের অসংগতি ও অস্বাভাবিকতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে সম্ভবতঃ গৌণ দু-একটি চরিত্রের মুখের কথায়। অমিতের সামাজিক পরিবেশ ও ব্যাক্তিত্বের যে ধরণ, তাতে তার মুখে প্রসাধিত বক্রোক্তি যতটুকুও মানায়, যোগমায়া কিংবা যতিশঙ্করের মত চরিত্রের মুখে তা যে আদৌ মানায় না, বুদ্ধদেব বসুর একটি মন্তব্যে তা সমর্থন মেলে ঃ

"আমাদের আঘাত লাগে..... সেইখানে যেখানে যোগমায়া বা যতিশঙ্কর অমিত রায়ের প্রতিধ্বনি করে।"[১২]

বস্তুতঃ সংলাপের ভাষায়— যে সংলাপ এই উপন্যাসের শিল্প শরীর গঠনের প্রধানতম উপাদান, সেই ভাষারীতিতে এই ধরণের সামঞ্জস্যের অভাব উপন্যাসটির নির্মাণ শিল্পের সার্থকতায় নিঃসংশয়ে বাধা সৃষ্টি করেছে।

প্লট নির্মিতি

শেষের কবিতা কাব্যধর্মী উপন্যাস এবং খাঁটি উপন্যাস, উপন্যাসের রাজত্বে এ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় অ-পূর্ব, ইংরাজী ভাষায় Original, আগস্ট ১৯৩৯ সালে লিখিত 'গদ্যকাব্য' প্রবন্ধে তিনি 'শেষের কবিতা মূলতঃ কাব্যরসে অভিষিক্ত জিনিস', এই সমালোচনার উত্তরে লিখেছেন, "আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনরূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে; হয়তো সজ্জা নেই কিন্তু রূপ আছে, এবং এইজন্যই তাদেরকে সত্যকার কাব্য গোত্রীয় বলে মনে করি।"[১৩]

সতেরটি ছোট-বড় পরিচ্ছেদে শেষের কবিতা দশটি কাব্য - খচিত আখ্যানে কোলকাতা-শিলং-কোলকাতার মধ্যে বৃত্তায়িত। এটিই তাঁর একমাত্র উপন্যাস যেখানে বঙ্কিমের রীতিতে প্রতিটি পরিচ্ছেদের একটি করে অর্থবহ নামকরণ আছে। চতুরঙ্গ ও দুই বোন প্রতিটি মূল চরিত্রের নামে এক একটি অধ্যায়ে বা পরিচ্ছেদ, চার অধ্যায়ে চারটি অধ্যায় সংখ্যা-চিহ্নিত, ঘরে বাইরেতে তিনটি মূল চরিত্রের নামে পরপর সবকটি 'আত্মকথা' নামাঙ্কিত পরিচ্ছেদ, অনেকটা চতুরঙ্গের শিল্পরীতির পথে। সমস্ত কাহিনী একটি পঞ্চাঙ্ক নাট্যরীতিতে বিন্যস্ত।

নাটকীয় কাহিনীর সঙ্গে যোগ হয়েছে নাট্যরীতির দ্রুতগতি। প্রথম পরিচ্ছেদটি প্রথমাঙ্ক, এটি আখ্যানে মুখবন্ধ স্বরূপ। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে দ্বিতীয়াঙ্ক, প্লটের আসল ঘটনার শুরু। রোমান্টিক কমিডির নায়ক সাহিত্য দর্পনের কোন নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়, মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গ, আকাশচারী। গ্রীষ্মের দাবদাহ এরাতে বোনেরা গেছে দার্জিলিং, কিন্তু অমিত এল রামধনুর সাতরঙে রাঙানো শৈল শহর শিলং-এ, সেখানে পাইন আর দেওদারের ছায়ায় বসে অবসর যাপনের জন্যে সঙ্গে নিল সুনীতি চাটুজ্যের সেই বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব বইটি এরপর 'মান্দার পর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে ওঠা সমুদ্র থেকে' উঠে এলেন লাবণ্য। ঘটল সংঘাত। পরের দুটি পরিচ্ছেদে (৩-৪) যথাক্রমে লাবণ্যের বর্তমান অভিভাবিকা যোগমায়ার পূর্ব ভূমিকা (৩) এবং লাবণ্য পুরাবৃত্ত (৪) বিবৃত।

এই আখ্যানে শৈল শহরের কথা, সংঘাত, পরিচয়, মিলন-তত্ত্ব যে তুরঙ্গ গতিতে, যে কাব্যালঙ্কারে শোভিত তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল বাকধারায় বিন্যস্ত সেই মনোমুগ্ধকর সংলাপ - বিবরণের সমতুল শিল্প বৈভব রবীন্দ্র সাহিত্যে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এই কাব্য কল্পনার পাইন-দেওদারের স্নিগ্ধ, মায়াময়, মোহময় পরিবেশে সুরমা ও যতিশঙ্করের মাঝে মধ্যে দেখা মিললেও কাহিনীতে তারা প্রায় নিষ্ক্রিয় এবং পূর্ণায়ত চরিত্র মাসিমা কার্যত এক যান্ত্রিক ভূমিকায় উপনীত। সুতরাং এই স্বপ্ন রাজ্য শিলং-এর সুরোভিত পরিবেশে পরিপূর্ণ সক্রিয় চরিত্র ওই দুই নর-নারী, অমিত ও লাবণ্য, উদার-হৃদয় মাতৃসমা যোগমায়ার আগ্রহের সুবাদে এই দুই ছন্ন ছাড়া তরুণ তরুণীর স্বর্গ-শৃঙ্খলে হস্তবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। জীবন্ত, রোমান্টিক, রোমান্সের সজীবতায়, দ্রুততায়, আকস্মিকতায় ৫-৬ পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে। নূতন পরিচয় (৬) ঘনীভূত হয়। কাব্যের তোড়ে লাবণ্যকে উড়িয়ে নিয়ে অমিত এসেছে তার মাসিমার কাছে (৭) অনুমতি প্রার্থনা করতে। অমিতের চেষ্টায় উভয়ের নতুন নামকরণ হয় শুধু উভয়ের জন্যে — মিতা আর বন্যা। মৃত্তিকা-গন্ধী নারী চিরন্তনী কল্পনার আকাশে ডানা মেলেতো চিরকাল থাকে না, তার স্বপ্নের মধ্যে থাকে ঘর বাঁধার কামনা; নিবারণ চক্রবর্তীর কাব্য, অমিত রায়ের বাঁকাচোরা রঙীন বুদবুদের অজস্র ফুলঝুরি কিছুই লাবণ্যকে শান্তি দেয়না। অমিত ক্ষুব্ধ হয়, তখন তার বন্যা যন্ত্রণা-কাতর কণ্ঠে উত্তর দেয়, "আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না।... তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ফের; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেই জন্যেই তুমি এসেছো।"

৯-১১ পরিচ্ছেদে আমরা উপনীত হই। প্রায় সরলরেখ কাহিনীর অবয়বে এই পর্বে একটা সর্বব্যাপী সংক্ষোভ বা বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষ্যণীয়। সে আলোড়ণ আখ্যানের বহিরাবরণ, স্থান ও পাত্রের উপর আবার সে সংক্ষোভ পাত্র-পাত্রীর অন্তর্লোকেও পরিব্যাপ্ত। উপযুক্ত সময় দেখে প্রকৃতিও যেন এই সংক্ষোভ ঘন পরিমণ্ডলে এসে তার জাগ্রত রূপকল্পে যোগ দিয়েছে। ১১ পরিচ্ছেদ (মিলন-তত্ত্ব) রোমান্টিক নাট্য কল্পনার অমরাবতী। অমিতের আংটি দেবার প্রস্তাব এবং সেই সঙ্গে আগামী অগ্রহায়ণ মাসে এদের বিবাহ-কথা ঠিক হয়ে গেল। অমিতের পকেট থেকে বের হয়েছে নিবারণের দ্বিতীয় সত্তা, অমিতের বন্ধু নীল মাধবের খাতা।

মিলন-বিরহ কাব্যের চরম বিন্দুর ললিত পঞ্চমের পর (১২-১৪ পরিচ্ছেদ) উৎরাই পর্বে রাগিণীতে করুণ সুরের আভাস পাঠকের মনে বেদনা জাগায়। এই পর্বের প্রথমদিকে মিলনের পরম রমনীয় শিল্পরূপ, তারই পর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিচ্ছেদের বিষণ্ন সুর। সুসংবদ্ধ কাহিনীর গোড়ার দিকে সেই শোভনলাল কাহিনী এবার শেষ সন্ধ্যা, এই অর্থবহ অধ্যায়টিতে আনন্দের পরিপূর্ণ মুহূর্তে এসে সব আনন্দের পরিবেশের উপর বিষাদের ছায়া ফেলেছে। পরবর্তী আশঙ্কা পরিচ্ছেদটি (১৩) সার্থকনামা। পূর্ব পরিচ্ছেদের যে বিষণ্ন সুরের সুস্পষ্ট আমেজ দেখা গেছে এই পরিচ্ছেদে তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শেষ পরিচ্ছেদ ধূমকেতু নামক অধ্যায়টির নায়ক, কোলকাতার চরিত্রবাহী কুমার মুখুজ্যে এসেছে শিলং-এ অমিতকে কোন এক মায়াবিনী তরুণীর হাত থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টায়। তার স্বার্থ সে সিসির পাণি প্রার্থী, নিরবচ্ছিন্ন একটি মোটা চুরুট মুখে থাকায় তার দ্বিতীয় নাম ধূমকেতু এবং এসেই অবস্থা ঘোরতর দেখে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করেছে। এই খলনায়ক সূত্রে খবরাখবর পেয়েই কোলকাতা থেকে বাহিনী এসেছে অমিতকে উদ্ধার করতে।

পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে (১৫-১৬) শেষের কবিতার নাটকীয় রূপ। কাহিনীর আসল রোমান্টিক পর্ব শিলং-এ শেষ হয়ে এবার মহানগরের চরম বস্তুতান্ত্রিক ঝোড়ো হাওয়া এসে সেই কল্পনার স্বপ্ন দিয়ে গড়া পাইন, দেওদারের মাঝের ঘরটি লন্ডভন্ড করে ফেলছে। ঝড়ের প্রথম ধাক্কাতেই রোমান্টিক কমেডির মায়াপুরী তলিয়ে গেছে, এবার তার অন্ত্যেষ্টি অধ্যায় মুক্তি নামাঙ্কিত চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি (১৬) এই আখ্যানের আকাশ-কল্পনার সমাধি রচনার পরিকাঠামো। শেষের কবিতার এই অংশেও তাই অমিত সাতদিন পরে চেরাপুঞ্জি থেকে ফিরে এসে দেখে কেউ কোথাও নেই, চারিদিকে বোবা শূন্যতা।

শেষের কবিতা উপন্যাসের মায়াময় শেষ পরিচ্ছেদে (১৭) নায়ক অমিত বলেছে, "আমি রোমান্সের পরমহংস", "আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোমান্স, আমার মর্ত্যেও ঘটাব রোমান্স।" লাবণ্যর পুরোনো নাম হাওয়ায় উড়ে গেছে, আজ সে আর পাষাণ অহল্যা নয়, অমিতের কল্যাণে সে ভালোবাসতে শিখেছে। সে যদি অমিতকে যথার্থ ভালোবাসা শিখিয়েছে, অমিতও তাকে যথার্থ প্রেমিক হতে শিখিয়েছে, তাই সে বলেছে,

"তোমারে যা দিয়েছিনু, সে তোমারি দান —
গ্রহণ করেছ যত, ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু বিদায়!"

এই সঙ্গে শেষের কবিতার নাটকীয় কাহিনীর শেষ।

উল্লেখপঞ্জী

১। আবু সয়ীদ আয়ুব, আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, কোলকাতা, ১৯৯৫ পৃ-৩৮।

২। রানী চন্দ, আমার মার বাপের বাড়ি, ভূমিকা, বিশ্বভারতী, ৬ আষাঢ় ১৩৭৯।

৩। বনস্পতির বৈঠক, ২য় খন্ড, পৃ- ৮৮-৮৯।

৪। ঐ, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯৫, কবির এই পত্র খানি ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৪০ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৫। প্রবোধ কুমার সান্যালের রচনাবলী, ১ম - পৃঃ২৩৯।

৬। সংগ্রহ — রবীন্দ্র সৃষ্টির অলঙ্করণ, অভীককুমার দে।

৭। রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৩৮।

৮। তদেব।

৯। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ—রণেন্দ্রনাথ রায়, পৃঃ ১৭৬।

১০। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, নীহাররঞ্জন রায়।

১১। লেখক অবনীন্দ্রনাথ ঃ সাহিত্যলোক, ১৯৭১, পৃঃ ১২৪।

১২। রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য, ১৯৫৫, পৃ-১৬৭।

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যের স্বরূপ।

দুই বোন

পূর্বাভাস

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ তিনটি উপন্যাসে- 'দুই বোন'(১৯৩৩), মালঞ্চ(১৯৩৪) এবং 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) (যদিও এর পটভূমি স্বতন্ত্র)- ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যার কথা আলোচনা করেছেন।'দুই বোন' উপন্যাসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থের প্রথম ছত্রেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- 'মেয়েরা দুই জাতের, এক জাত প্রধানত মা আর এক জাত প্রিয়া'। 'দুই নারী', 'বিজয়িনী', 'স্বর্গ হইতে বিদায়', 'রাত্রে ও প্রভাতে' ইত্যাদি 'চিত্রা' পর্বের কবিতার পর রবীন্দ্রনাথের একদা অত্যন্ত প্রিয় 'দুই নারী' তত্ত্ব- শ্রেয়সী ও প্রেয়সী তত্ত্ব, দেখা দিল নতুন রূপে, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসের একটি চিঠিতেও এই সম্পর্কিত ভাবনার প্রকাশ দেখা গেছে। কিন্তু 'দুই বোন' উপন্যাসের নায়ক শশাঙ্ক, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'লালনরসলালায়িত শিশুগিরি'তে সন্তুষ্ট থাকেনি, মায়ের আঁচল পিয়াসী সাধারণ বাঙালি পুরুষদের থেকে সে এদিক থেকে আলাদা। পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে 'নিত্য স্নেহসতর্ক মাকে' নয় স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রীকেই পেতে চেয়েছিল শশাঙ্ক। তাই তার ঘর জুড়ে শর্মিলা -তার স্ত্রী থাকলেও, সে তার কাজের মধ্যে শর্মিলার বোন ঊর্মিকে পেয়ে চরিতার্থ হয়েছিল।

'দুই বোন' উপন্যাসে আর 'বাঁশরী' নাটক একই বছরে (১৯৩৩) প্রকাশিত। এই উপন্যাস ও নাটকের মধ্যে ভারতের হিন্দু সমাজের জীবন-যাত্রায় নরনারীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে যে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে তারই ইঙ্গিত রয়েছে। 'দুই বোন'-এর ঊর্মি রবীন্দ্র সাহিত্যে সর্বপ্রথম নায়িকা যে চিকিৎসা বিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য একাকী বিলাত যাত্রার দুঃসাহস দেখিয়েছে। দাম্পত্য জীবনে নারী কর্তৃত্বের ছবিও এ উপন্যাসে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কোন গল্প বা উপন্যাসে স্বামীর স্ত্রীর প্রভাবের এই ছবি কিন্তু দুর্লক্ষ্য। 'বউ ঠাকুরানীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'তে দেখা যায় স্ত্রীরা স্বামীদের উপর কোনও প্রভাবই বিস্তার করতে পারেনি। 'নষ্টনীড়ে'র চারুলতাও ভূপতিকে কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারেনি। 'চোখের বালি'-র আশাও বিপথগামী স্বামীকে সদুপদেশ দেবার মত দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। 'গোরা' উপন্যাসে দুই প্রবীণা গৃহকর্ত্রী আনন্দময়ী ও বরদাসুন্দরী রাসভারী মহিলা হলেও তাঁদের স্বামীদের উপর সামান্য প্রভাবই বিস্তার করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন পর্যালোচনায় দেখা যায়, কবির প্রচন্ড ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে মাতা সারদাদেবী কখনও কোন বিষয়ে পরামর্শ দিতে সাহসী হননি। 'ঘরে-বাইরে'-র বিমলা স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ে স্বামী নিখিলেশের মতামতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েও নিখিলেশকে তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একচুলও সরিয়ে আনতে পারেনি । 'যোগাযোগ'-এর কুমুদিনীর কাউকে সামান্যতম জিনিস দেবারও অধিকার ছিল না। 'শেষের কবিতা'-র লাবণ্য অমিতকে বিবাহ করতেই অস্বীকার করেছে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে বর্ণিত দাম্পত্য সম্পর্কের পটভূমিকায় 'দুই বোন' উপন্যাসে স্বামী শশাঙ্কের ওপরে শর্মিলার কর্তৃত্বের ছবিটি বাস্তবিকই অভূতপূর্ব। শশাঙ্ক মধ্যবয়স্ক ইঞ্জিনিয়ার 'মায়ের জাত' শর্মিলার অতিরিক্ত সেবায় অনুরাগে স্বামীর অবস্থাটা অনেকটা অসহায় শিশুর মতো। 'স্বামীর জীবনলোকে এমন কোনও প্রত্যন্ত দেশ নেই, যেখানে তার সাম্রাজ্যের প্রভাব শিথিল'। মায়ের মত যত্নে শর্মিলা স্বামীকে পরিণত করেছে একটি পুতুলে। একবার স্বামীর সঙ্গে ট্রেনে ভ্রমণ করার সময় তাদের প্রথম শ্রেণীর কামরাতে এক উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ সামরিক কর্মচারীকে সে কামরা থেকে নেমে যেতে বাধ্য করে কারণ ঐ সাহেবটিই তাদের সেই কামরা ছেড়ে যেতে বলেছিল। এতটা ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী শর্মিলা কর্মক্ষেত্রে স্বামীর পদোন্নতি নিয়ে অন্যায় হওয়ায় তাকে পদত্যাগ করতে এবং তার আত্মীয় সমুর দাদার সঙ্গে কোলকাতায় ব্যবসার অংশীদার রূপে বাধ্য করে।স্বামীর উপর

এইরকম অপ্রতিহত প্রভাব এবং তাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা -রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কোন নারী চরিত্রের মধ্যেই এই সাবলীলতা আমরা লক্ষ করি না।

উর্মি শর্মিলার ছোট বোন, দিদির অসুস্থতায় সংসারের দায়ীত্ব নিতে এসে শশাঙ্কের সঙ্গে দেহ সম্বন্ধ সাপেক্ষ ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সারাদিন হোলির রঙে মাতার পর ফাল্গুনী পূর্নিমার রাতে তীব্র কামনায় উন্মত্তের মতো নিজের বিছানায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে উর্মি। ঘুম আসছে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয় নি। আমের বোলের গন্ধে মন উঠেছে ভরে। আজ বসন্তে মাধবীলতার মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা সেই বেদনা যেন উর্মির সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎসুক করেছে। পাশের নাবার ঘরে গিয়ে মাথা ধুয়ে নিলে, গাঁ মুছলে ভিজে তোয়ালে দিয়ে। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে কিচ্ছুক্ষণ পরে সপ্নজড়িত ঘুমে আবিষ্ট হয়ে পড়ল।

"রাত্রি তিনটের সময় ঘুম ভেঙেছে। চাঁদ তখন জানলার সামনে নেই। .... উর্মির বুক ফেটে কান্না এল, কিছুতেই থামতে চায় না । উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল। প্রাণের এই কান্না- দিয়ে ভাষায় এর শব্দ নেই, অর্থ নেই। প্রশ্ন করলে ও কি বলতে পারে কোথা থেকে এই বেদনার জোয়ার উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তার দেহ মনে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনের কর্মতালিকা, রক্তের সুখনিদ্রা"।

অবিবাহিতা নারীর এই তীব্র যৌন আকাঙ্ক্ষার আকুলতা রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কোনও রচনায় পাওয়া যায় না। বাবার নির্বাচিত পাত্রকে উপেক্ষা করে আপন ভগ্নীপতির প্রতি তার দুরন্ত আকর্ষণের ছবিটা মনের চোখে দেখতে পেয়ে জাহাজে করে একা বিলাত চলে যায় উর্মি উচ্চতর ডাক্তারি বিদ্যা শিখবার জন্য। সমাজ প্রচলিত পারিবারিক বিধিনিষেধের গন্ডি যে রবীন্দ্রনাথ 'নষ্টনীড়'-এর সময় থেকেই ভেঙ্গে আসছেন এখানে তারই তীব্রতর প্রতিচ্ছবি।

১২৯৮ সালের 'স্ত্রী শিক্ষা' থেকে ১৩৪৩-এর 'নারী' প্রবন্ধ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের মধ্যে নারীত্বের দাবীতে নারীর বিদ্রোহিনী রূপে তাঁর দোলাচল মনোবৃত্তি ধরা পড়ে। ১৩২১ সালে বলাকা পর্বের এক কবিতায় - 'দুই নারী-তত্ত্ব' পুনরুচ্চারিত ;

'কোন ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী........
একজন উর্বশী সুন্দরী
বিশ্বের কামনা রাজ্যে রানী
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজন লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।
একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুধাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি ....
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।
আর জন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায় ....
ফিরাইয়া আনে

নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য সুধায় মধুর।'

অথচ প্রথম দলের মেয়ে উর্মিমালাও সতীত্ব প্রয়াসী ছিল বিমলাও তার সামরিক বিহ্বলতা নিয়ে কিছুকাল প্রথম দলের, সন্দীপ বলেছে। দ্বিতীয় দলেই রবীন্দ্র সৃষ্ট নারীদের শোভাযাত্রা - আশা, কুমু, সুচরিতা, বিভা, এলা, আনন্দময়ী এবং আরও কত। এ দুয়ের মধ্যে কোথায় স্থান হবে মৃণাল, মুক্তির নায়িকার, সোহিনী, দামিনীর ?

চরিত্র

উর্মিমালা

রাজারাম মারা যাওয়ার পর উর্মির হবু বর তার অভিভাবক হয়ে উঠল। উর্মি অবাক হয়ে দেখল এই যুবকটির মধ্যে হৃদয়ের কোন রঙ, যৌবনের কোন আবেগ, প্রণয়ের কোন তাপ নেই। সবটাই মাষ্টারির কঠোর শাসন, নিয়ামানুবর্তিতা, জীবনের সরস মধুর অধ্যায়টি সেখানে তিরস্কৃত। অথচ বয়োধর্মে তো বটেই, কিছুটা ব্যক্তিগত প্রবণতার বশে ঐ অধ্যায়টির প্রতিই উর্মির সহজ আকর্ষণ। কাজেই নীরদের শিক্ষা এবং নিজের প্রবৃত্তির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল। তবে এই দ্বন্দ্ব তার চিত্তকে দীর্ণ করতে পারেনি। প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জমা হচ্ছিল মনের গভীরে, কিছু জানায়, অনেকটাই অজানায়। বাইরে সে মনকে বুঝিয়ে একটা আপস করে নিয়েছিল। নীরদের চরিত্রের শুষ্ক কঠিন নিয়মানুগ এমন কি তার স্টোয়িক মনোভাবকেও সে একটা চরিত্র-গৌরবের ভূমিতে স্থাপিত করে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। নিজের হৃদয়ের প্রবণতাকে দায়িত্বহীন লঘুতা ভেবে নিন্দা করে সে নিজেকে তার হবু স্বামীর আদর্শে তৈরি করতে চাইল। কিন্তু ভিতরে অবরুদ্ধ আক্রোশ কত তীব্র হয়ে উঠেছিল তার প্রকাশ ঘটল পরে। ১) শশাঙ্কের সঙ্গে যে চটুল লীলায় সে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, তার একটা কারণ বন্দী প্রতিক্রিয়া। ২) বিলেতে থেকে যখন খবর পাওয়া গেল নীরদ মেম বিয়ে করে সেখানে থেকে যাচ্ছে, তখন উর্মি মুক্তির উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। অনেকদিনের জমে থাকা বাষ্প এইভাবে বেরিয়ে এল। এর আগে নীরদ-বিষয়ে তার মনের সচেষ্ট শ্রদ্ধায় ফাটল ধরেছিল, বারবার টাকা চেয়ে পাঠানোয় তার নির্লোভ আদর্শবাদের গৌরব ধূলিসাৎ হবার উপক্রম, যদিও একরকম জোর করে উর্মি তা বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল — বোঝাই যাচ্ছিল ব্যর্থ চেষ্টা।

শশাঙ্কের সঙ্গে হাস্যে লাস্যে রঙ্গ-রসিকতায় যে উচ্ছল লীলা শুরু করল উর্মি তাতে এদেশি পরিবার জীবনের এক ধরনের মঞ্জুরি ছিল — শালী-ভগ্নীপতির সম্পর্ক। 'নষ্টনীড়ে' এইরূপ আর একটি গার্হস্থ্য সম্পর্কের আড়ালে লেখক গ্রহণ করেন বৌদি-দেবর সম্পর্ক। কখন সীমানা ডিঙিয়ে তা প্রণয় হয়ে উঠল ওরা জানতে পারে নি। উর্মি দোলের দিনের অতি উদ্দাম ও রঙিন উৎসবের পরে হঠাৎ উপলব্ধি করল, নিজেকে অপরাধী মনে করে কাঁদল, পরিনামহীন এই নিন্দাযোগ্য সম্বন্ধ থেকে সংযত হতে চাইল। নীরদের স্মৃতিতে কর্তব্যের কথা খুব বড় করে মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলে সে হৃদয়কে শাসন করতে চাইল। দিদির বাড়ি থেকে পালিয়ে এল। এমন সময়ে পেল নীরদের বিয়ের চিঠি। একটা বিপুল মুক্তির উচ্ছ্বাস তাকে পেয়ে বসল। ঠিক তখুনি, তার সেই মুক্তমনের সঙ্গী হয়ে দেখা দিল জামাইবাবু। শর্মিলার বাড়িতে ফিরে আসতে হল। তার সংযত হবার সব চেষ্টা বানচাল করে দিল শশাঙ্কের ক্রমিক প্ররোচনা। শশাঙ্ক স্পষ্ট ভাষায় একদিন প্রণয় নিবেদন করল। উর্মির দিক থেকে ব্যাপারটা চরম পর্যায়ে পৌঁছল। শর্মিলা স্বামীর সঙ্গে উর্মির বিয়ে ঠিক করে ফেলল। শশাঙ্ক সহজভাবেই রাজি হয়ে গেল, সে স্বয়ং উর্মির কথা আদায় করল। শশাঙ্কের ব্যবসা ফেল পড়ল, অনেকদিন ধরে সব মনোযোগ ব্যবসা থেকে সরিয়ে এনে উর্মির উপরে নিবিষ্ট হয়। উর্মি চতুর্দিক থেকে অপরাধবোধ ও গ্লানির মধ্যে মজ্জিত হল। শশাঙ্কের বিবেচনাহীন উদ্দামতার কারণ হয়ে, দিদির জীবনে বিরাট বিপর্যয় ডেকে এনে, এবং এই সব কিছুই তার নারী-হৃদয়ের প্রথম প্রেমের আনন্দ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোত থেকে মানসিকতার যে পর্যায়ে নিয়ে গেল সেখানে কোনো সান্ত্বনা ছিল না। আদর্শবাদ ও মহানব্রতের যে আশ্রয় এক সময়ে তৈরী করে রেখেছিল তাও আজ আর অবশিষ্ট নেই। উর্মির মনের এই তরঙ্গগুলি লেখক অন্তরালে রেখেছিল দিদির পরিবারের ভাঙচুর আবার জোড়া লাগুক, সে ভগ্নচিত্ত নিয়ে ছেড়ে আসা, ভুলে যাওয়া ব্রতে আশ্রয় নিতে

চলল। আধুনিক মানুষ আর পুরানো রীতির ট্র্যাজিক হিরো হয় না, এরূপ অবরুদ্ধ বেদনাকে চিত্তে বহন করে 'ট্র্যাজিক' হয়ে ওঠে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের রচনা আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করে বলেছেন ,- " 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' ও 'বাঁশরী'- এই তিনখানি বইতে কবি 'প্রেম' ও 'ভালোবাসা'-র মধ্যে সূক্ষ্ম রেখা টানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বাহিরে সামাজিকভাবে-নিঃসম্পৃক্ত নরনারীর আকর্ষণ জনিত প্রেমেরও ক্ষেত্র আছে। সে প্রেম দেহসম্বন্ধ-নিরপেক্ষ, সাধারণ যৌন লক্ষণের ঊর্দ্ধে ; মনস্বিতা ও হৃদয়াবেগ (intellectuality ও emotion) এমন একটা সুন্দর সমন্বয়ের স্তরে কল্পিত হয় — যেখানে দেহের ক্ষুধা লুপ্ত, মানুষের মধ্যে সুপ্ত-পশু মৃতপ্রায়। কিন্তু বাস্তবতার জগতে দেখা যায় যে, পশু মৃতপ্রায় তো নহেই, সে অত্যন্ত তীব্রভাবেই জাগ্রত — অনুকূল স্পর্শাভাবেই অবচেতনে ডুবিয়া থাকে। এই সোনার কাঠির স্পর্শে তাহার মনও যেমন জাগে, বুভুক্ষিত দেহও তেমনি নিজ প্রাকৃতরূপ ধারণ করে। এই দেহতত্ত্ব চিররহস্যময়"।[১]

'দুই বোনের' বিষয় বিবাহিত পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্ক বহির্ভূত প্রেম। শশাঙ্ক ও শর্মিলার দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেছে ঊর্মিমালা। শর্মিলার অতি যত্নে শশাঙ্কের দাম্পত্য-জীবনে কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শশাঙ্কর অবচেতনে একটা অতৃপ্তিবোধ ক্রমশঃ জাগ্রত হয়ে উঠছিল। নিজের অগোচরেই একটি প্রেয়সী নারীর সান্নিধ্যের জন্য শশাঙ্কর মন উন্মুখ হয়েছিল। অন্যদিকে কঠোর তপস্যার মধ্যে উচ্ছল প্রাণাবেগকে আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছিল। সেইদিক থেকে তার মনও ছিল বুভুক্ষু। শর্মিলার অসুস্থতার সূত্র ধরে এই দুটি ব্যাকুল হৃদয় অবচেতনভাবেই পরস্পরের সম্মুখীন হল। কিন্তু শর্মিলার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে শশাঙ্কের মানসিক রূপ অস্পষ্ট থাকেনি। শর্মিলা চিরদিনই পুরুষের কর্মের সাধনাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। ঊর্মিমালার তীব্র প্রাণোচ্ছলতা শশাঙ্ককে সেই সাধনার পথ থেকে বিচ্যুত করেছে, এটাই তার সব থেকে বড় বেদনা। অন্যদিকে শশাঙ্ককে কর্মভ্রষ্ট করার মধ্য দিয়ে ঊর্মিমালাও নিজের মনের প্রচ্ছন্ন রহস্যের সন্ধান পেল। ঊর্মির চাপল্য শশাঙ্কের 'রক্তকে দোলায়িত' করেছে, হোলির দিন ঊর্মি ও শশাঙ্কর রঙের মাতামাতির পর গভীর রাত্রে "জানালার কাছে ঊর্মি চুপ করে বসে। ঘুম আসছে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে রক্তের দোলা শান্ত হয় নি। ..... আজ বসন্তে মাধবীলতার মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফোটাবার বেদনা সেই বেদনা যেন ঊর্মির সমস্ত দেহকে ভিতর থেকে উৎসুক করেছে। ঊর্মির বুক ফেটে কান্না এল, কিছুতেই থামতে চায় না।......... প্রানের এই কান্না — ভাষায় এর শব্দ নেই, অর্থ নেই। প্রশ্ন করলে ও কি বলতে পারে কোথা থেকে এই বেদনার জোয়ার উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে ওর দেহ মনে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় দিনের কর্মতালিকা, রাত্রের সুখনিদ্রা"। ঊর্মিমালা অনূঢ়া ; বিবাহিত শশাঙ্ককে কেন্দ্র করে তার প্রাণাবেগ মুক্তি পেয়েছে। ঊর্মিমালার জীবনতৃষ্ণা শশাঙ্কের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। শশাঙ্ক বিবাহিত আর শর্মিলা ঊর্মিমালারই বোন। সমাজ এই প্রেমকে সমর্থন করুক বা না করুক শশাঙ্ক ও ঊর্মিমালার মধ্যে যে একটা মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী, এটা স্বভাবতই মনে জাগে। বুদ্ধদেব বসু 'রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন- 'শ্যালিকার সঙ্গে শশাঙ্কর প্রণয় বড় বেশি মসৃণভাবে এগিয়ে গেছে — যেন বিবেক-বুদ্ধির পিছুটান নেই — কারোরই মনে দ্বন্দ্ব নেই কোনো, শর্মিলা তারই আপন বোন, তার উপর পীড়িত। এ অবস্থায়, শুধু বাইরের জগতের সঙ্গে নয়, নিজের অন্তরেই ঘাত-প্রতিঘাত অনিবার্য, আর সেটাই স্রষ্টা লেখকের প্রধান উপাদান"।

ঊর্মিমালাকে লেখক প্রেয়সী নারী রূপে অঙ্কিত করতে চেয়েছেন। তার সম্পর্কে লেখকের বক্তব্য "ঊর্মিমালা যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার । চঞ্চল দেহে মনে উজ্জ্বলতা ঝলমল করে বেড়ায়।" রবীন্দ্রনাথ ঊর্মিমালার আচার-আচরণ সব কিছুর মধ্য দিয়ে

তার প্রাণোচ্ছলতাই ব্যক্ত করেছেন, যেটা প্রেয়সী নারীর একমাত্র ধর্ম নয়। রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী, দামিনী, বিমলা, লাবণ্য এমনকি হেমনলিনী, সুচরিতার মধ্যেও যে গভীর মননের দিক রয়েছে, উর্মিমালার মধ্যে সেই গভীরতার আংশিক প্রকাশও নেই। নীরদকে আশ্রয় করে তার মন প্রথমদিকে বিকাশলাভ করতে চেয়েছিল, কিন্তু নীরদের কঠিন নিয়মানুবর্তিতা তাকে মুক্তির জন্য ব্যাকুল করেছে। সুতরাং নীরদের একান্ত অনুবর্তী হয়ে চলার প্রেরণার মূল যে তার মনে দৃঢ়ভিত্তিক নয়, একথা সহজেই অনুমেয়। তারপরেই সে তার আকাঙ্ক্ষিত মুক্তির সন্ধান পেয়েছে পীড়িতা শর্মিলার শুশ্রূষার অজুহাতে। শর্মিলার সতর্ক প্রহরায় গন্ডিবদ্ধ শশাঙ্কর জীবনের আকাঙ্ক্ষা মিলিত হয়েছে উর্মিমালার মুক্তি-বাসনার সঙ্গে। উর্মিমালা যখন প্রেমের অনুভূতি অন্তরে উপলব্ধি করছে তখনই তার হৃদয়-দ্বন্দ্ব বিকাশের প্রশস্ত অবকাশ ; সেই দ্বন্দ্ব আমরা দেখেছি 'ঘরে-বাইরে'-র বিমলার মধ্যে। কিন্তু উর্মির পরিহাস মুখর চঞ্চল জীবনাবেগকে রবীন্দ্রনাথ যতটা প্রাধান্য দিয়েছেন, ততটা তার মনের গভীরতার সন্ধান পাঠককে দিতে পারেন নি। শর্মিলা তার সহোদরা , পরম স্নেহময়ী। কিন্তু তার জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে উর্মির মনে কোন দ্বিধার সৃষ্টি হয় নি। শশাঙ্কর ব্যবসা ভরাডুবি উর্মিকে সচেতন করেছে, সে সকলকে ত্যাগ করে বিলাত যাত্রা করেছে এবং যাত্রার পূর্বে দুটি সংক্ষিপ্ত চিঠি রেখে গেছে। কাহিনির অন্তেও তার মনের গতি সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ রাখেন নি এবং এখানে পাঠক তার কল্পনা দিয়েও সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারে না। 'শাস্তি' ছোটগল্পে,'নষ্টনীড়ে' কাহিনির শেষে নায়িকার সংক্ষিপ্ত উত্তর 'যোগাযোগ' উপন্যাসে কুমুদিনীর নীরব প্রত্যাবর্তন তাদের অন্তরের অসীম শূন্যতাকে বহন করে এনেছে। কিন্তু উর্মির অকস্মাৎ বিদেশযাত্রা এবং তার চিঠি দুখানি সেরকম কোন ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত বহন করে না। সুতরাং মনস্তাত্ত্বিক বিচারে 'দুই বোন' উপন্যাসের চরিত্রগুলি অপরিস্ফুট, অপরিণত।

শর্মিলা

রবীন্দ্রনাথ শর্মিলার চরিত্র রচনা করতে গিয়ে তার মধ্যে সেবা-লালন-তত্ত্বাবধানের মনোভাবকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু শর্মিলা একটি বিশিষ্ট রমণী রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

১) শর্মিলা চরিত্রে দাপুটে ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। বিশেষত স্বামীর সম্মান নিয়ে যেখানে প্রশ্ন সেখানে সে দুঃসাহসী যোদ্ধা।

২) স্বামী সর্বস্ব বলে বিশেষভাবে শশাঙ্ক-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রকাশ পেলেও শর্মিলার স্বাধীনচিত্ততা ও দর্প যে তার অন্তলীন ধর্ম তার নিদর্শনও গল্পে আছে। রেলে যে অধিকারের লড়াই সে করেছিল তা তো তার স্বভাবগত দর্প বলেই না।

৩) শশাঙ্ক-উর্মির মধ্যেকার ব্যাপারটিকে ওদের দুজনের মত সেও প্রথমে মনে করেছিল শালী-ভগ্নীপতির রহস্য-কৌতুক। সে অসন্তুষ্ট হচ্ছিল শশাঙ্কের কাজে বিঘ্ন হচ্ছিল দেখে। কিন্তু সকলের আগে সেই বুঝতে পেরেছিল যে ওদের আচরণে অন্য সুর বাজছে। ব্যক্তিগত মর্যাদা বোধের জন্য সে কোন কলহ করেনি। কোনরূপ প্রতিযোগিতায় নামেনি উর্মির সঙ্গে, স্বামীর মন ফেরাবার জন্য কোনো ভাবাবেগপূর্ণ আবেদন সৃষ্টি করেনি, তীব্র অভিমানে বিমুখ হয়ে থাকেনি। তবে শেষ পর্যন্ত বেদনায় ও অপমানে সে ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়েছে। তার মরণাপন্ন অবস্থার দায় এই চাপা যন্ত্রণার।

৪) শর্মিলা স্বামীর সঙ্গে বোনের বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। 'বিষবৃক্ষ'-এর সূর্যমুখীর সঙ্গে তার মিল। শুধু এখানেই নয়, আরও নানা দিক থেকে। বুদ্ধিমতী শর্মিলা বুঝেছিল, এ হল নিয়তি। তার স্বভাবে যা নেই সে যা শশাঙ্ককে দিতে পারেনি, সে তো তার অন্তর্গত রক্তে নেই বলেই। আর স্বামীর যার জন্য তৃষ্ণার অবধি নেই জানা গেল, তাকে রোধ করার বোকামি করবে না শর্মিলা। রোগের চূড়ান্ত অবস্থায় স্বামীর সেবা যত্নের দায়িত্ব বোনের হাতে চিরতরে দিয়ে যাবার বাসনা সে প্রকাশ করেছিল, রোগমুক্তিতে সে সরাসরি ওদের বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত করল। এই ঘটনাই তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া পুরো ধরে রেখেছে। এর মধ্যে ব্যর্থ প্রণয় ও অর্থহীন জীবন, নিগূঢ় অভিমান, দর্পিতার অপমানবোধ, তীক্ষ্ম বুদ্ধিতে চরিত্র ভেদের ক্ষমতা এবং মানব-চরিত্ররূপ নিয়তির কাছে আত্মসর্মপণ পাঠ করা যায়।

(৫) শর্মিলা এতখানি সংযতচিত্ত, বুদ্ধিমতী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলেই শশাঙ্কের কণ্ঠস্বর এবং সংলাপের ঠিক অর্থ বুঝে নিল, ''আবার ঋণ করেছি তোমার কাছে ...... যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই ....একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে তেমনি আবার আমাকেও বিশ্বাস করো''। শর্মিলা ঠিকই বুঝল এ শুধু ব্যবসা ডোবাবার কথা নয়, শুধু অর্থের ঋণ নয়, সঙ্গে হৃদয়ও আছে। সে যখন আগেকার মতো বিশ্বাস করার আবেদন জানায় তখন বিশ্বাস শব্দের অর্থ হল - 'ভালোবাসা'। কর্মে উদ্বুদ্ধ এই শশাঙ্ককে শর্মিলা ভালোভাবেই জানে। তাদের মধ্যেকার বরফ গলা শুরু হয়। পুরনো দিনগুলির শব দুজনের মধ্যে 'মধ্যবর্তিনী' হয়ে থাকে না। শর্মিলার আত্মবিশ্বাস আছে, সেই দিন গুলি বিলীয়মান স্মৃতি হতে চলেছে - সে তাকে ক্ষীণতম স্মৃতিতে পরিণত করতে পারবে।

শর্মিলার মাতৃরূপের ছায়ায় শশাঙ্ক শুধুই তার কর্মসঙ্গিনীকে দেখেছে, কিন্তু যে নারী বিচিত্রবেশে নানা লীলা চাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে পুরুষকে উদ্দীপ্ত করে, সেই রূপ থেকে শশাঙ্ক বঞ্চিত, তার সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা থেকেই উপন্যাসের মূল সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের প্রারম্ভে নারীর প্রেয়সী রূপ ও কল্যাণময়ী মাতৃরূপের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে এবং সেই পটভূমিকায় শর্মিলা ও উর্মিমালাকে প্রতিষ্ঠিত করে যে দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়েছে। নারীর দুই রূপের দ্বন্দ্বের পরিবর্তে দুটি নরনারীর হৃদয়ের অপরিতৃপ্ত প্রণয় পিপাসার রূপই স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নারীর মাতৃরূপ অপেক্ষা প্রেয়সী রূপের পরিচয়ই

অধিকতর। বিনোদিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষার উদ্দাম রূপ মহেন্দ্রকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেই উদ্দামতার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে তার কল্যাণীমূর্তি বিকশিত হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রেমের পাত্রও মহেন্দ্র থেকে বিহারীতে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রেমিকা বিনোদিনীর এই বিবর্তনের চিত্রে রবীন্দ্রনাথ তার মানসিক যন্ত্রণার রূপটি কোথাও অস্পষ্ট রাখেন নি। প্রেয়সী ও কল্যাণীরূপের দ্বন্দ্ব অতি উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত হয়েছে বিনোদিনীর মধ্যে। বিমলা বিবাহিত নারী হয়েও সন্দীপের লুব্ধ বাসনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছে। কিন্তু তার অন্তরাত্মার গভীরে যে কল্যাণকামী মাতৃমূর্তি সুপ্ত ছিল, অমূল্যকে আশ্রয় করে তার জাগরণ ঘটেছে। একদিকে সন্দীপের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, অন্যদিকে অমূল্যর প্রতি তার নিবিড় স্নেহ, এই দুয়ের দ্বন্দ্বে বিমলাও কম জর্জরিত হয় নি।

'গোরা' উপন্যাসের আনন্দময়ী, কিংবা 'শেষের কবিতা'র যোগমায়া, কিংবা 'চোখের বালি'র অন্নপূর্ণা সম্পূর্ণ রূপেই মাতৃভাবাপন্ন চরিত্র। কিন্তু তাঁরা জীবনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এই রূপে অধিষ্ঠিতা। তাছাড়া অন্নপূর্ণা, আনন্দময়ী বা যোগমায়া - এঁরা কেউই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নন। কিন্তু 'দুই বোন' উপন্যাসের শর্মিলা প্রধান চরিত্রের অন্যতম এবং রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে শুধু মাতৃধর্মকেই একান্তভাবেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যার ফলে শর্মিলার চরিত্রের কোন বিবর্তন বা পরিণতি নেই। শশাঙ্ক ও ঊর্মিমালার চাপল্য প্রথমদিকে সে সস্নেহ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছে। কিন্তু তারপরে যখন অনুভব করেছে শশাঙ্কের অন্তরের টান কোন দিকে, তখন তার মধ্যে একমাত্র নিজের ব্যর্থতার জন্য বেদনাবোধ ছাড়া আর কিছুই নেই। তার ঔদার্য এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যে অবলীলাক্রমে সে শশাঙ্ক ও ঊর্মিমালার প্রণয়কে প্রশ্রয় দিয়েছে এবং মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে এই বলে 'যার জন্য কাজ খোওয়াতে ওর ভাবনা নেই তাকে শুদ্ধ খোওয়ানো ওর সইবে না'। প্রিয়া রূপের সাধনায় সে ব্যর্থ হয়েছে - এটুকুই তার বেদনা। সে শশাঙ্কর সঙ্গে ঊর্মিমালার বিবাহের প্রস্তাবও দিয়েছে। স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যবর্তিনী' নামক ছোট গল্পটি। নিবারণের স্ত্রী হরসুন্দরী একটা মহৎ ত্যাগের সংকল্প নিয়ে শৈলবালার সঙ্গে নিবারণের দ্বিতীয়বার বিবাহ ঘটাল। কিন্তু যেদিন শৈলবালা অনায়াসেই তাকে সরিয়ে নিবারণের হৃদয়ে নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করল, অসহনীয় মর্মবেদনা নিয়ে হরসুন্দরী সেদিন নিজের অন্তরকে পর্যবেক্ষণ করল। একটি ক্ষুদ্র কাহিনিতে রবীন্দ্রনাথ যে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে এলেন, 'দুই বোন' উপন্যাসের কাঠামোয় সেই সমস্যা সৃষ্টির প্রচুর সম্ভাবনা থাকলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে এক প্রকার উপেক্ষাই করেছেন।

ভাষার বন্ধন

অতিশায়িত, কৃত্রিমতাগন্ধী ভাষারীতির প্রয়োগের কারণ কাহিনি-চরিত্র তথা জীবন পরিবেশ-পরিকল্পনার যথোপযুক্ততায়। নাগরিক সচ্ছল মধ্যবিত্ত নরনারীর জীবনকথা হল 'দুই বোন' উপন্যাস। 'এপিগ্রাম'-যুক্ত ভাষায় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সপ্রতিভ বিন্যাস, উচ্চ-মধ্যবিত্ত নাগরিকতার পরিমীলিত রূপের প্রতিফলন থাকলেও 'শেষের কবিতা'-র কাব্যময়তা, 'স্মার্ট' ভাষারীতিতে সরস ও সজীব করার কৌতুকরস নেই।

প্লট নির্মিতি

রবীন্দ্র-উপন্যাসের মধ্যে 'দুই বোন' ক্ষুদ্রতম। জীবনীকার প্রভাতকুমার বলেছেন, ''বাইরে থাকার সময় লেখক এর একটি খসড়া করে রেখেছিলেন, শান্তিনিকেতনে ফিরে সেটিকে 'মাজিয়া ঘষিয়া' প্রকাশের উপযুক্ত করিলেন।'' ১৩৩৯ সালের অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাসে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় এই কাহিনিটি বের হতে থাকে, প্রকাশিত হয় ঐ বছরই।

চরিত্রের স্বল্পতায়, কাহিনির সংহতিতে এবং উজ্জ্বল, তির্যক, ইঙ্গিতধর্মী বাক্‌বিন্যাসে এর আখ্যানটি অনেকাংশে ছোটগল্পের লক্ষ্মণাক্রান্ত। কিন্তু কয়েক স্তরান্বিত প্লটের বিন্যাসে, বিশ্লেষণাত্মক প্রকরণ পদ্ধতিতে চরিত্র-চিত্রণে এবং প্লটের সামগ্রিক রূপরেখায় এটি পরিচ্ছন্নভাবে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাস বা 'নুভ্যাল'। প্রমথনাথ বিশী কথিত এটি 'খন্ডোপন্যাস' মোটেও নয়, 'দুই বোন' একটি অখন্ড, পূর্ণাকৃতি ক্ষুদ্র উপন্যাস।

তত্ত্ব-দর্শন-সাধনার রসভাষ্য হিসেবে কাব্য রচনার ব্যাপকতা মধ্যযুগে দেখা গেছে। রবীন্দ্রনাথ মধ্যযুগীয় কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোক ছিলেন না। তবু তাঁর সাহিত্যে তত্ত্ব ও শিল্পের পারস্পারিক মেলবন্ধন লক্ষ্য করা গেছে। 'দুই বোন' উপন্যাসের শুরু হল এইভাবে —

''মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পন্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি। এক জাত প্রধাণত মা, আর-এক প্রিয়া।'' — এই বক্তব্য উপমায় ও চিত্রে পূর্ণ করে তুলেছেন ৮২টি শব্দের বিস্তারে।

১৯২৯ থেকে ৩৩ -প্রায় চার বছর রবীন্দ্রনাথ কোনো উপন্যাস লেখেন নি। বাংলা উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের তখন বিপুল জনপ্রিয়তা, নব্যদের হাতে রবীন্দ্র-রচনারীতি একটা চ্যালেঞ্জের সামনে। শুধু উগ্র তারুন্যের সরস প্রতিবাদে নয়, বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতের লেখা মুদ্রিত হবার ফলেও। সেই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের তিয়াত্তর বছর বয়সের এই অভিনব উপহার। গল্পের জগতের নব প্রজাতির আবির্ভাব।

উপন্যাসের চারটি অংশ সমান আকারের নয়। শর্মিলা-৭পৃ., নীরদ-৬.৫পৃ . উর্মিমালা-১৭ পৃ; শশাঙ্ক ৬.৫ পৃ । শর্মিলা, শশাঙ্ক, নীরদ মোটামুটি সমান মাপের অংশ, উর্মিমালা অন্য যে-কোন অংশের দ্বিগুণেরও বড়।

প্রথম অংশ 'শর্মিলা' : তার চরিত্রের জয় এবং সীমাবদ্ধতা দুই-ই প্রকট এই অংশে। শশাঙ্ক প্রকাশ পেয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক-সংঘাতের মধ্য দিয়ে, স্বাধীন ভাবে নয়।

দ্বিতীয় অংশ 'নীরদ' : রাজারামের কিছু ভূমিকা আছে। হেমন্ত একটি বর্ণাঢ্য উল্লেখ। নীরদের ব্যক্তিত্ব এবং দ্বিধা নিয়েও আত্মসমর্পণ উর্মির।

তৃতীয় অংশ 'উর্মিমালা' : উর্মির জীবনের যে অধ্যায়টা নীরদকে জড়িয়ে, তার কথা আগের অংশে পড়লেও এবারেই দেখা গেল উর্মির মনের দিক থেকে তার বেশ সংকটময় পর্যায়। তৃতীয় অংশের বাকিটা উর্মি-শশাঙ্কের কথা। নীরদ এই অধ্যায়ের শুরুতেই অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে। থেকে গিয়েছে উর্মির মনের প্রতিক্রিয়ায়।

চতুর্থ অংশ 'শশাঙ্ক' : শুরুতে উর্মি-শশাঙ্কের প্রণয়লীলার অনুবৃত্তি, শুধু অনুবৃত্তি নয়, নব পর্যায়ে তা আরো খানিকটা এগিয়েছে। শর্মিলার দীর্ণ হৃদয় সবচেয়ে বেশি মেলে ধরা হয়েছে। আগে শশাঙ্ককে গ্রহচ্যুত করার টানটা আসত মূলত উর্মির দিক থেকে, এখন ঠিক উল্টো -উর্মিকে ব্রতচ্যুত করার উৎসাহ শশাঙ্কের তরফে। কিন্তু শশাঙ্কের ব্যক্তিত্বের পুনর্জাগরণে এই অধ্যায়ে তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য একটা পূর্ণতা পেয়েছে। অধ্যায়টির নামকরণে এই সংশয়ে প্রকাশের অবকাশ নেই।

উল্লেখপঞ্জী

১ । রবীন্দ্রজীবনী, তৃতীয় খন্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

মালঞ্চ

পূর্বাভাস

প্রযুক্তির বিচারে 'মালঞ্চে'র কাহিনি একটি আকর্ষণীয় দিক হ'ল এর কাব্যময় বিন্যাসভঙ্গি —"এই উপন্যাসের কাহিনীর পরিকল্পনায় কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে।" [১] প্রেম, মালঞ্চ ও আসন্ন মৃত্যুর ধূসর ছায়া সব মিলিয়ে পাঠকচিত্তে এক করুণ সৌন্দর্যময় জীবনের প্রতিভাস সঞ্চারিত হয় যেন। তার সংবেদনটুকু এর কাহিনিতে এক অন্তর্গূঢ় রসসঞ্চার করে। তবে একথা ঠিক এর কাহিনি-বিন্যাসের এই বাইরের স্নিগ্ধ কাব্যময়তার অন্তরালে রয়েছে এক প্রখর অন্তর্দাহময় নাট্যদ্বন্দ্বাশ্রিত বিন্যাস। বস্তুত নায়িকার দ্বন্দ্বজর্জর মানস সংকটের এই বিন্যাসই 'মালঞ্চে'-র কাহিনিকে বহুলাংশে ঐক্য-সংহতি দান করেছে, সন্দেহ নেই।

'মালঞ্চে'-র অন্যতম বৈশিষ্ট্য এতে বর্ণিত ব্যক্তি চরিত্রে মানস সংকটের রূপটি নিছক মনোবিশ্লেষণের পথে সর্বদা আত্মপ্রকাশ করেনি। তা' বহুলাংশে করেছে একধরণের নাট্যধর্মী অবয়বের মধ্যেমে। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, পরবর্তী উপন্যাস 'চার অধ্যায়'-এ এই বৈশিষ্ট্যটি আরোও স্পষ্ট। অবশ্য এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, যে 'মালঞ্চ'-এর নির্মাণরীতিতে নাট্যলক্ষণ থাকলেও এর কাহিনিতে দুর্লভ নাট্যচমক সৃষ্টির চেষ্টা কোথাও নেই। এর কারণ উপন্যাসটির যে নাট্যরস তা মনস্তত্ত্বের দ্বন্দ্বময়তার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি করতে চেয়েছেন লেখক, স্থূল আকস্মিক ঘটনার সাহায্যে নয়।

'মালঞ্চ'-এর মধ্যে যে নাট্য সম্ভবনা বর্তমান তার প্রাথমিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ — স্বয়ং লেখককৃত এর নাট্যরূপ।[২] সেখানে দেখা যায় যে, মোটের উপর মূল উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাসের ধারা ও রীতিকে অনুসরণ করেই নাটকের দৃশ্যগুলি উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুত, অনেকটা নাটকের মতোই 'মালঞ্চ'-এর ঘটনা ও চরিত্র প্রত্যক্ষভাবে পাঠকের গোচরে আসছে, বলতে পারি একধরণের audio-visual আবেদন সৃষ্ট হচ্ছে অনেকক্ষেত্রেই। লেখকের বিবৃতির চেয়ে অবজেক্টিভ দৃশ্যরূপ ও সংলাপেই কাহিনিকে এগিয়ে যেতে বেশি সাহায্য করেছে। এখানে স্মরণীয় যে পূর্ববর্তী উপন্যাস 'দুই বোন'- এ এই বিবৃতি ধর্মের বাহুল্যের জন্য কাহিনি সজীব হয়ে উঠতে পারে নি। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, 'মালঞ্চ'-এ নাটকীয় প্রত্যক্ষতার উপর বেশি নির্ভর করার ফলে, চরিত্রের মনোবিশ্লেষণ এখানে ব্যক্তিজীবনের পরিচয়কে পরিস্ফুট করতে ততটা ব্যবহৃত হয়নি। যদিও মাঝে-মাঝে নীরজার ভাবনা অনুভবের কিছু মন্ময়ী (Subjective) রূপ ফুটেছে, তবু নাটকের মতো মুখ্যত সংলাপই এই উপন্যাসে ব্যক্তির মনোজীবনকে উদঘাটিত করার দায়িত্ব নিয়েছে যেন। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের প্রসঙ্গিত মন্তব্য এখানে স্মরণীয়ঃ "গল্পোক্ত চরিত্রগুলির মুখ দিয়াই প্রায় সব কথা বলান, লেখকের নিজের ব্যাখ্যার প্রায় অনুপস্থিতি ইত্যাদি...নাটকীয় লক্ষণ এই উপন্যাসে বর্তমান।" [৩] উপন্যাসে নাটকীয়তার আরো লক্ষণ হ'ল এখানে পরিবেশ বিন্যস্ত হয়েছে মঞ্চের দৃশ্যপটের মতো এবং উপন্যাসে বিবৃত সময়কে যথাসম্ভব সংহত করতে চাওয়া হয়েছে। সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই ঘটনাকে ধরে রাখতে চেয়েছেন লেখক। বাগান (মালঞ্চ) এই গ্রন্থের 'মঞ্চ' পরিবেশের এক মুখ্য উপকরণ। কিন্তু মালঞ্চ বা বাগানের ভূমিকা বস্তুত এর কাহিনিতে তার চেয়েও অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। মালঞ্চের পরিবেশকে কাহিনির মধ্যে নিয়ে আসার আঙ্গিকটি অভিনব ও অর্থবহ। মালঞ্চই নীরজা-আদিত্যের প্রেমের প্রতীক — এই দুয়ে একাত্ম হয়ে আছে যেন। আর এই প্রতীকী প্রেমচেতনাই কেন্দ্রে থাকার ফলে উপন্যাসের কাহিনিতে ঐক্য ও সংহতি এসেছে। কাহিনির নানা পরিচ্ছেদে ক্রমশ সেই চেতনার উন্মোচন ও বিবর্তন ঘটেছে — কাহিনিতে যত 'সিচুয়েশন' এসেছে সবই ওই নীরজার মনের মালঞ্চ শুজিয়ে আসার মর্মস্পর্শী গল্পকেই ক্রমশ গড়ে তুলেছে। আর সেদিক থেকে এর শেষের নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডি উপন্যাসের ক্রম উন্মোচনশীল ঘটনার স্বাভাবিক বাস্তবসম্মত পরিণাম হতে পেরেছে বলে মনে হয়।

'মালঞ্চ' উপন্যাসের নাটকীয়তার অন্তরঙ্গ লক্ষণ এর কাহিনির দ্বন্দ্বময় রূপ। বলাবাহুল্য, এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত হৃদয় সম্পর্কিত একটির পর একটি 'সিচুয়েশনে'র উন্মোচনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ উদঘাটিত হয়েছে এর কাহিনির অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব-জটিলতার রূপ। মালঞ্চের কাহিনি শুরু হয়েছে একটি দ্বন্দ্বময় ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তার উন্মোচনের প্রায় অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে। ফলে কাহিনির বিশদ পূর্ণায়ত অবয়বটি পরিস্ফুট হবার সুযোগ পায় নি। কিন্তু তবু এ কাহিনি যেভাবে যতটুকু বিন্যস্ত হয়েছে, সন্ধান করলে তারই মধ্যে এর একধরণের আদি-মধ্য-অন্ত্য-যুক্ত রূপ পাওয়া যায়। সেটি ফুটেছে যথাক্রমে এই উপন্যাসের প্রথম থেকে চতুর্থ, পঞ্চম থেকে অষ্টম এবং নবম থেকে শেষ

পরিচ্ছেদে। আগাগোড়া মালঞ্চ-এর কাহিনিতে ক্রম বিকশিত হয়েছে একটি দ্বন্দ্বময় রূপ। কিন্তু এর একেবারে গোড়া থেকেই সেই দ্বন্দ্বটি স্পষ্ট নয়। অসুস্থ নীরজার মনে আদিত্য-সরলার সম্পর্ক নিয়ে একটি সংশয়ের কাঁটা উঁকি দিয়েছে গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে। সেই কাঁটা উন্মুলিত হয়ে তা ক্রমশ নীরজার মনের গভীরে বিদ্ধ হয়েছে ছোট ছোট নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আয়া রোশনি ও হলা মালীর সঙ্গে কথোপকথন, সরলার হাত দিয়ে স্ত্রীর কাছে আদিত্যের ফুল পাঠানো, রমেনের সঙ্গে সরলার বিবাহ দেবার অস্বাভাবিক আগ্রহপ্রকাশ ইত্যাদি। নায়িকার অন্তর্জীবন চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষে এসে কেবল সংশয়ে ক্ষতবিক্ষত হয় নি, একটি নিশ্চিত প্রত্যয়ে পরিণতি পেয়েছে সেই অস্পষ্ট সন্দেহ। এর পরবর্তী অর্থাৎ মধ্য পর্যায়ে দেখি নীরজার সংশয়ের কাঁটা একদিকে যেমন তার নিজের গোপন সত্তাকে রক্তাক্ত করেছে, অন্যদিকে তেমনি সেই কাঁটা আদিত্যের হৃদয়কেও আঘাত করে তার মনের গোপন আবরণ খুলে দিয়ে সরলার প্রতি তার অনতিস্ফুট প্রেমকে উদঘাটিত করে দিয়েছে। এই ক্ষুদ্রায়ত কাহিনিতে আদিত্য-সরলার প্রেমের সেই স্বরূপ উন্মোচন করতে লেখককে আদিত্য ও সরলার জবানীতে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণের আশ্রয় নিতে হয়েছে। আবাল্য প্রণয়ের এই আবহমান গভীর রূপের উন্মোচন সংক্ষিপ্ত 'ফ্ল্যাশব্যাক' রীতিতে যে তেমন প্রত্যয়সিদ্ধ হয়ে ওঠেনি, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তবু স্বীকার্য যে, উপন্যাসটিতে কাহিনির আকর্ষক ঘটনাবিন্যস্ত রূপ না থাকলেও, এর মধ্যদিয়ে এক জটিল গভীর নাট্যরূপ অভিব্যক্ত হয়েছে। তা কেবল নীরজার অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই নয়, একদিকে নীরজার সঙ্গে আদিত্যের মানস-সংঘাত, অন্যদিকে আদিত্য ও সরলার সদ্য-উদাঘাটিত সম্পর্কের গূঢ় জটিলতা থেকেও উদ্ভূত হয়েছে।

কিন্তু হৃদয়ের এই আশ্চর্য গভীর দ্বন্দ্বময় কাহিনি সর্বত্র পূর্ণায়ত প্রকাশ লাভ করেনি — এর আয়তনের সীমাবদ্ধতার জন্য। এই ক্ষুদ্রকায় উপন্যাসে নানা জটিল গভীর ঘটনার তাই অনেকস্থলে প্রায় আভাসমাত্র পাই, কিন্তু উপযুক্ত বিস্তৃতির অভাবে তাদের উপন্যাস যোগ্য বিশ্বাস্যতা পুরোপুরি তৈরি হয় না। এর একধরণের নিদর্শন হচ্ছে, অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক অতীত ঘটনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের প্রয়াস, যেমন, উপন্যাসের গোড়ায় আদিত্য-নীরজার দশবছর আগের সুখী দাম্পত্য জীবনের ঘটনা এবং আদিত্য-সরলার প্রচ্ছন্ন প্রণয়ের সূচনাপর্বের আখ্যান। শেষোক্ত আখ্যানটির কথা আগেই বলেছি। আর দশ বছর-ব্যাপী দাম্পত্য প্রণয়ের আদৌ কোন বিষদ অনুপুঙ্খ পরিচয় না থাকায় স্বামীর হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য নীরজার বেদনা- যন্ত্রণা পাঠকচিত্তে তেমন গভীর সংবেদন আনে না যেন। উপন্যাসটিতে বিশ্বাস্যতা সৃষ্টির অভাবের আরেক ধরণের নিদর্শন হচ্ছে —শুধু অতীতের নয়, বর্তমানেরও কোন ঘটনাকে একান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করার প্রয়াস, যার ফলে সেগুলি মনে হয় আকস্মিক ও আরোপিত। এর দৃষ্টান্ত শেষ দিকে সরলার রাজনীতির সংস্রবে আসা, জেলে যাওয়া ও হঠাৎ জেল থেকে মুক্তি পাওয়া। সবকটি ঘটনাই বিশেষ উদ্দেশ্যে নিতান্ত আরোপিত মনে হয়।

উপন্যাসটির কাহিনীর একেবারে শেষে- নীরজার মৃত্যুর মর্মন্তুদ 'সিচুয়েশন' 'মালঞ্চ'-এ নানা উপকরণের মধ্য দিয়ে —ক্ষীয়মান বাগানের ম্লান সৌন্দর্য, নায়িকার ব্যাধি ও অন্তর্বেদনায় বিশীর্ণ রূপ এবং উপন্যাসের সমগ্র পরিবেশের উপর আসন্ন মৃত্যুর এক অলক্ষ্য বিষণ্ণ ছায়া এদের মাধ্যমে কাহিনির নিহিত নাট্যদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও পাঠকচিত্তে যে একধরণের কোমল কাব্যময়তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে, তা উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় এসে হঠাৎ যেন হারিয়ে যায়। পাঠকের চিত্তপটে এখন ভেসে ওঠে নিদারুণ নিষ্ঠুরতায় কঠিন এক মর্মদাহী চিত্ররূপ—চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথের আঁকা এই পর্বের অনেক ছবি যার তুলনা।

উপন্যাসটি মেলোড্রামা কি? আমার মনে হয় না। দেহে- মনে রুগ্ন মুমূর্ষু এই নায়িকার জীবনকে আশ্রয় করে উপন্যাসের কাহিনির যে ধারা প্রবাহ, আসন্ন নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি নায়িকার দাম্পত্য প্রেম ও তার প্রতীক মালঞ্চের আত্যন্তিক বিনষ্টির যে অন্তর্জ্বালাময় অনুভব এবং প্রতিনায়িকার প্রতি তার যে স্বাভাবিক তীব্র ঈর্ষা ও বিদ্বেষ এদের সমবায়ে কাহিনির পরিণাম কখনোই নিশ্চয় মিলনান্তক হ'তে পারে না, এমন কি শান্তরসাশ্রিত বা কোমল বিষাদযুক্ত পরিণতিও বোধকরি প্রত্যাশিত নয়। নায়িকা চরিত্রের অন্তর্লোকের গূঢ় অনতিব্যক্ত বহ্নিজ্বালার যে ক্রমবর্ধমান তীব্রতা—যাকে অন্যে, এমনকি সে নিজেও অবরুদ্ধ রাখতে সচেষ্ট হয়েছিল প্রাণ পণ— তাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলে, এই কাহিনির পরিণতিকে লেখকের নিতান্ত অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার নিদর্শন বলে মনে হবে না। তবে কাহিনির এই পরিণতি সম্পর্কে সম্ভাব্য মতভেদের সব দায়টুকু পাঠকের উপর ছেড়ে দিলে অন্যায় হবে। এর পরিণতি অংশকে যে অনেক পাঠকের অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে তার একটি বড় কারণ কাহিনী বিন্যাসে 'ডিটেলস্'-এর অভাব।

অলংকরণ ঃ 'মালঞ্চ'-এ নাট্যরূপ আষাঢ় ১৩৮৬ তে নবকলেবরে প্রকাশ পেল বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদ ও ছ'টি ছবি সমেত।

সূর্যমুখী ফুল ও গাছ	(প্রচ্ছদ)
সরলা হাতে তার অর্কিড	(পৃ.৯)
বাগানের কাজের মালী	(পৃ.৩২)
রোশনী	(পৃ.৩৩)
নীরজা ঃ ঐ বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখিনি একটুও	(পৃ. ৪২)
ঘাটের বেদীর ওপর রমেন ও সরলা	(পৃ. ৪৫)
নীরজা আধশোওয়া পড়ে আছে রোগশয্যায়	(পৃ. ৮৯)

'মালঞ্চ'-র এই ছবিগুলি কালি – কলমের অসাধারণ রেখাঙ্কন, মডেলিং-এর 'এফেক্‌টে' বলিষ্ঠ রেখায় আঁকা হয়েছে। দীঘল করে নিয়ে অবয়বীদের রূপারোপ করার মধ্যে শিল্পীর নিজস্ব ধরন স্পষ্ট। ক্যালিগ্রাফির সূক্ষ্ম মোচড়কে এই ছবিগুলোতে আশ্চর্য সফলতায় ব্যবহার করেছেন শিল্পী। আঁটসাট ভূমিতে ছবির বিষয় বস্তুকে বাঁধলেও ভিতরে ভিতরে ভূমি বিস্তারের আয়োজন রয়েছে।[৪]

চরিত্র

নীরজা

মালঞ্চ উপন্যাসের নায়িকা নীরজা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধে নারীর যে দুই রূপের কথা নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন, সেই কল্যানী ও প্রিয়ারূপের নিদর্শন শর্মিলা ও উর্মিমালা নয়। শর্মিলা যদি নারীর কল্যানীবৃর্তি হয়, তবে নীবজা নারীর প্রিয়াস্বভাবকে ধারণ করে আছে। উপন্যাসের প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ রোগজীর্ণা নীরজার স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে তার বিদ্রোহী মনের সন্ধান দিয়েছেন। সে স্মৃতির মধ্যে আছে মালঞ্চকে কেন্দ্র করে আদিত্য ও নীরজার মিলিত কর্মপদ্ধতি। অবিমিশ্র মুখে জড়ান সেই দশবছরের সুখ স্মৃতিতে নীরজা আদিত্যের জীবনের একাধারে কর্মসঙ্গিনী, লীলাসঙ্গিনী, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান ছিল না। আদিত্যর প্রতি তার প্রেমের তীব্রতাই তাকে মালঞ্চের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল, কারণ এই বাগানটি ছিল আদিত্যের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এরপরে নীরজার শারীরিক অক্ষমতা তার কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছে। প্রাণশক্তির প্রাচুর্য নিয়ে যে উদ্যানকে সে ফুলে ফলে শোভিত করে তুলেছিল, সেই উদ্যান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে আশ্রয় করল রোগশয্যা। এই খানে থেকেই নীরজার অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত।

"সকলের চেয়ে তাকে বাজল যখন দেখলে বাগানের কাজে সহযোগিতার জন্যে আদিত্যের দূর সম্পর্কীয় বোন সরলাকে আনাতে হয়েছে।" রবীন্দ্রনাথ নীরজার মনোবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তার দ্বন্দ্ব জর্জরিত মনের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন —"ওর মনের মধ্যে যে রস ছিল নিছক মিষ্ট আজ কেন সে হয়ে গেল কটু; যেমন আজকালকার দুর্বল শরীরটা ওর অপরিচিত, তেমনই এখানকার তীব্র নীরস স্বাভাবটাও ওর চেনা স্বভাব নয়। সে স্বভাবে কোন দাক্ষিণ্য নেই। এক-একবার এই দারিদ্র্য ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লজ্জা জাগে মনে, তবু কোনোমতে সামলাতে পারে না। ভয় হয়, আদিত্যের কাছে এই হীনতা ধরা পড়েছে বুঝি, কোন দিন হয়ত সে প্রত্যক্ষ দেখবে নীরজার আজকালকার মনখানা বাদুড়ের চঞ্চুক্ষত ফলের মতো, ভদ্র প্রয়োজনের অযোগ্য।" এই ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের তীব্র দাহই নীরপ্রাকে একটি মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রে পরিণত করেছে। আদিত্যর সঙ্গে সরলার আন্তরিক সম্পর্ক নীরজাকে ঈর্ষাকাতর করে তুলেছে, আর সেই ঈর্ষা থেকেই নীরজার প্রেমবহ্নি আরও প্রজ্জ্বলন্ত হয়ে তার হৃদয়ে এক গভীর ক্ষত চিহ্ন রেখে গেছে।

'দুইবোন' উপন্যাসে শর্মিলাও এমনই বেদনাবিদ্ধ হয়েছিল উর্মিমালার সঙ্গে শশাঙ্কর নিবিড় ঘনিষ্ঠতায়। কিন্তু শর্মিলার মাতৃস্বভাব সেই বেদনাকে অন্তরের নিভৃতে রেখেছে, আর নীরজা তার হৃদয়ের যন্ত্রণাকে সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছে। শর্মিলার অন্তর্দ্বন্দ্বের দিকটি অত্যন্ত অস্পষ্ট; কিন্তু নীরজার ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ হৃদয়ের চিত্র অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অঙ্কিত। আদিত্যর প্রতি ভালবাসার প্রাবল্য নীরজাকে আদিত্যের, উদ্যানের সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছিল; তার কারণ নীরজার উদ্যানপ্রীতি নয়, গভীর স্বামী প্রেম, কিন্তু দেহের অক্ষমতায় সেই উদ্যান পরিচর্যার দায়িত্ব থেকে যেদিন নীরজা অব্যাহতি পেয়েছে, এবং সরলাকে তার স্থান পূরণ করতে দেখেছে, সেদিন নীরজার অন্তর মথিত করে তার বঞ্চিত নারী-হৃদয় আর্তনাদ করে উঠেছে। তার মনে হয়েছে যে এ যেন আদিত্যর অন্তর থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে এবং সেই স্থান অধিকার করে নিয়েছে সরলা। অথচ তার এই চিত্তবিক্ষোভের কোন সংগত কারণ তখনও পর্যন্ত ঘটেনি। কারণ আদিত্য অকৃপণ হস্তে গভীর স্নেহমমতায় নীরজাকে ঘিরে রেখেছিল আর সরলাও কর্তব্যের বাইরে একটি পদক্ষেপ ফেলেনি। সুতরাং নীরজা নিজের কল্পনা থেকেই তার মানস-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে। নীরজা মনোজগৎ উদঘাটনের মধ্য দিয়ে আদিত্যর প্রতি তার প্রণয়ের তীব্রতা প্রকাশই রবীন্দ্রনাথের মূল লক্ষ্য ছিল। তাই মালঞ্চ প্রসঙ্গে নীরজা তার অনুভূতি ব্যক্ত করেছে — "বিয়ের পর যেদিন জেনেছিলেম তোমার বাগান তোমার প্রাণের মতো প্রিয়, সেদিন থেকে এই বাগান আর আমার মধ্যে ভেদ রাখিনি একটুকুও। নইলে তোমার বাগানের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া বাধত ওকে সইতে পারতুম না। ও হত আমার সতিন।" অসুস্থ অবস্থায় মালঞ্চর সঙ্গে তার সম্পর্ককে এই ভাবে নীরজা বিশ্লেষণ করেছে।

কিন্তু সরলাকে দেখে অবচেতনে সে যেন অনুভব করেছে যে এইবার সে যথার্থই উদ্যান থেকে অর্থাৎ আদিত্যর জীবন থেকে বিচ্যুত হবে; তীব্র ঈর্ষায় তার সমগ্র অন্তর জর্জরিত হয়েছে। তার হৃদয়ের দ্বন্দ্ব যত বর্ধিত হয়েছে ততই সে আদিত্যকে আরও গভীরভাবে আকর্ষণ করতে চেয়েছে। ব্যাকুল আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আদিত্যর হৃদয়ে তার স্থানকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছে, তার সেই আর্তস্বরের মধ্য দিয়ে স্বামী প্রেমবঞ্চিতা নারীর জীবন

পিপাসা ধ্বনিত হয়েছে। মনের অস্থিরতা নীরজা ব্যক্ত করেছে আদিত্যর কাছে— "আমি নিশ্চয় জানি, আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি থাকব আমি এই খানেই থাকব, আমি তোমারই কাছে থাকব....। তোমার বাগানের গাছ পালা সমস্তই আমি দেখব, যেমন আগে দেখতুম তার চেয়ে অনেক ভালো করে দেখব। কাউকে দরকার হবে না।.... তোমাকে এত ভালবাসি সেই কথা মনে করে আমাকে দয়া করো। এতদিন তুমি আমাকে যেমন আদরে স্থান দিয়েছ তোমার ঘরে, সেদিনও তেমনই করেই স্থান দিয়ো। ঋতুতে ঋতুতে তোমার যেসব ফুল ফুটবে তেমনই করেই মনে মনে তুলে দিয়ো আমার হাতে। যদি নিষ্ঠুর হও তুমি, তাহলে তো এখানে আমি থাকতে পারব না। আমার বাগান যদি কেড়ে নাও তাহলে হাওয়ায় হাওয়ায় কোন শূন্যে আমি ভেসে বেড়াব?...বলো, আমি তোমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হব না, তাহলে সবাইকে আমার ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারব।" মৃত্যু-পথযাত্রিনী নারীর এই ব্যাকুল প্রণয়াভিক্ষার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তার মনস্তাত্ত্বিক সংকটকেও ব্যক্ত করেছেন, নীরজা একদিকে স্বামীর হৃদয়ে তার একক অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে; আবার আরেকদিকে তার আদিত্যর সঙ্গে সরলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করেছে। এই দুয়ের দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। অথচ 'দুইবোন' উপন্যাসে শর্মিলা সহজে শশাঙ্কর সঙ্গে ঊর্মিমালার বিবাহ কল্পনা করেছে। নীরজার দ্বন্দ্বের সামান্যতম আভাসও শর্মিলার মধ্যে ছিল না। তাকে যেন প্রথমাবধিই রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ, ক্ষমা ও ধৈর্যের প্রতিমূর্তিরূপে সৃষ্টি করে এক আদর্শ মানবী করে তুলতে চেয়েছেন। নীরজার আদিত্যকে ভালবাসার মধ্যে এক তীব্র আবেগ রয়েছে, কিন্তু শর্মিলার প্রেমে জীবনের সেই উত্তাপ অনুভব করা যায় না। অশান্ত হৃদয়ের উদ্দামতা নীরজা বার বার শান্ত করার চেষ্টা করেছে, সরলাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করার কল্পনা করেছে। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে নীরজার জীবনের প্রেম বিকশিত হয়ে উঠেছিল, সেই আদিত্যর সঙ্গে সরলার মিলিত জীবনকে নীরজা কোনমতেই স্বীকার করতে পারেনি, যদিও তার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু যেহেতু নীরজাকে কোন আদর্শলোকের মানবীরূপে অঙ্কিত করার কামনা রবীন্দ্রনাথের ছিল না, তাই অন্তিম মুহূর্তে সে নিজেকে আদিত্যর হৃদয় থেকে বিচ্যুত করে সেই স্থান সরলাকে দিয়ে যেতে পারেনি। তীব্র ভাষায় সে তার শেষ কথা বলেছে — 'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না।.... জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব, থাকব।" নীরজার এই অন্তিম উক্তি, আত্মত্যাগের মহৎ আদর্শে অনুরণিত হয়নি। কিন্তু বাস্তব জীবনের যে প্রেম পিপাসা নীরজার অন্তরের গভীর থেকে উৎসারিত হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক সঙ্গতি কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জীবনের অপূর্ণতাকে সে পূর্ণ করতে চেয়েছে আদিত্যর হৃদয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনায়।

আজ দশ বৎসর পর সেই স্বামীর ক্রমবর্ধমান ঔদাসীন্য এবং নিজের আসনে অন্যের অভিষেকের চেষ্টা — এই ছায়াহীন রৌদ্রে শূন্যময় ভবিষ্যতের আভাসে নীরজার চিত্তে দাক্ষিণ্যের স্রোত শুকিয়ে নীরস হয়ে যাওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। আজ তার সব কিছুতেই ভয়, সেদিন আর নেই, মনে সে আর জোর পায় না। সরলা সম্বন্ধে তার বর্ধমান ঈর্ষা সে আদিত্যর কাছেও গোপন করল না, সরলার কাছেও নয়; নানা সূত্রে তার মনের দুর্বলতা উভয়ের কাছেই প্রকাশ পেয়ে গেল। যে কথা ছিল চেতনার গভীরে নীরজার ভাষায় ও ভঙ্গিতে তা ব্যক্ত হওয়া মাত্র আদিত্য ও সরলা সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আবিস্কার করল দু'জন দু'জনার কাছে ধরা পড়ে গেছে, আর ফিরবার পথ নেই। তবু অন্তর্দ্বন্দ্বের হাত কেউ এড়াতে পারল না। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সরলার ক্ষেত্রে যদিও খানিকটা বিবেকদশংনজাত, আদিত্যর ক্ষেত্রে সে রকম কিছু প্রায় অনুপস্থিত। অন্যদিকে দূর সম্পর্কীয় দেবর রমেনের অবতারণা করা হয়েছে গল্পের মধ্যে নীরজাকে শান্ত করার জন্য, তার মনের গ্রন্থি আলগা করাবার জন্য এবং পরে সরলার জেলে যাবার সুবিধার জন্য। আভাস আছে গল্পে যে, এই রমেন সরলার পাণি প্রার্থী, কিন্তু আভাস মাত্রই; কারণ আগাগোড়া রমেনের আচারে-ব্যবহারে কোথাও তা পরিস্ফুট হয়নি। দুঃসহ ও অমানুষিক মনে হয় রমেন যখন শয্যাবিলগ্না নীরজাকে উপদেশ দেয় দাক্ষিণ্যের মহিমা সম্বন্ধে, যখন সে বলে, " যা নিজে ভোগ করতে পারবে না, তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পারো না যাকে এতদিন এত দিয়েছ? *** মিনতি করে বলছি তোমার সারাজীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষ মুহূর্তে কৃপণ করে যেয়ো না।" ভাবলে অবাক হতে হয়, নীরজাকে রমেন এমন দাক্ষিণ্যে উৎসাহিত করছে যে দাক্ষিণ্যের ফল সবটা না হোক অধিকাংশ ভোগ করবে স্বামী আদিত্য নয় সরলা, এবং বলছে এমন লোককে যে তার সুদীর্ঘ দশ বছরের ভালবাসার সঙ্গী স্বামীর জীবন থেকে নির্বাসিত হতে চলেছে। আদিত্য নিজেও থেকে থেকে নীরজাকে ইঙ্গিত করছে তার হৃদয়ের কৃপণতা এবং অনৌদার্যের প্রতি! যেন অপরাধ যা কিছু সবই নীরজার অথচ এদিকে যে নীরজার অন্তর ঘরদাহে তপ্ত বালুকাময় মরুভূমির মত পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে সেদিকে কারও দৃষ্টি নেই, কেউ তার জন্য দয়া ও অনুকম্পা বোধ করছে না।

স্থিরবুদ্ধি দক্ষ হিসাবীর মেজাজে সরলা অস্থির আদিত্যকে বোঝাচ্ছে। "*** শুনেইছ ডাক্তার বলেছেন বেশিদিন ওঁর সময় নেই। এইটুকুর জন্য ওঁর মনের কাঁটা তোমাকে উপড়ে দিতেই হবে। এই কয়দিনের মধ্যে আমার ছায়া কিছুতেই পড়তে দিও না ওঁর জীবনে। *** আমার হয়ে এই ব্রতটি তুমি নাও। দিদির জীবনান্তকালের শেষ কটা দিন দাও তোমার দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে। একেবারে ভুলিয়ে দাও যে আমি এসেছিলাম ওঁর সৌভাগ্যের ভরাঘট ভেঙে দেবার জন্যে।" এ কি দয়া না নিষ্ঠুরতার চরম? এর চেয়ে মানবিক হত সরলা যদি জোর করে নীরজার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নেমে পড়ত। অন্যদিকে রমেন একটু আগেই আদিত্যকে বোঝাতে গিয়ে বলেছে, "*** বৌদিদির যা জানবার তা তিনি আপনিই জেনেছেন। আর ক'টা দিন পরেই তো এই পরম দুঃখের জটা এলিয়ে যাবে। তুমি তা নিয়ে মিথ্যে টানাটানি করো না। বৌদি যা বলতে চান শোনো, তার উপরে তোমারো যা বলা উচিত আপনিই সহজ হয়ে যাবে।" অর্থাৎ তুমি আর ক'টা দিন ধৈর্য ধরে থাক, তারপরই তুমি বন্ধন মুক্ত! গল্পের শেষ দৃশ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুরতম আচরণ আদিত্যর নিজের। অন্তিম শয্যায় শুয়ে নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে অত্যন্ত ব্যাকুল হৃদয়ে নীরজা আদিত্যর হাত চেপে ধরে বলল—

— " একেবারেই থাকব না, কিচ্ছুই থাকব না? বলো আমাকে, তুমি ত অনেক বই পড়েছ, বলো না আমাকে সত্যি করে।"

— "যাদের বই পড়েছি তাদের বিদ্যে যতদূর আমারও ততদূর! যমের দরজার কাছটাতে এসে থেমেছি, আর এগোয়নি।"

— "বলো না তুমি কী মনে করো! একটুও থাকব না? এতটুকুও না?"

— "এখন আছি এটাই যদি সম্ভম হয়, তখন থাকব সেও সম্ভব।" কি শুষ্ক, নীরস, শীতল, নির্মল, উত্তাপলেশহীন, মনুষ্যধর্মবোধহীন আদিত্যর কণ্ঠস্বর, কথা বলবার ভঙ্গি! বলা যেতে পারে, আদিত্যর মনে নীরজার সম্বন্ধে ভালবাসার লেশমাত্র অবিশিষ্ট নেই। কাজেই সে যে আচরণ করেছে, যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কথা বলেছে তা সত্যাচরণের ভাষা ও ভঙ্গি। কিন্তু এই সত্যাচরণ মনুষ্যধর্মবোধ বহির্ভূত আচরণ, এবং সেই হেতু মিথ্যা; মৃত্যুর দুয়ারে বসে এই নিষ্ঠুর নির্মম আচরণ একান্তই অমানুষিক! তবু অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে নীরজা একবার প্রাণপণ শেষ চেষ্টা করল অকৃপণ হতে তার সর্বস্ব ত্যাগ করে দেউলিয়া হতে —"সরলাকে না দেখে যেতে পারবো না! ভালো হবে না তাতে। আশীর্বাদ করবো তাকে। শেষ আশীর্বাদ। *** কৃপণের মতো মরবো না। *** দেবো দেবো, সব দেবো।' কিন্তু পারল না। সরলা এসে পায়ে হাত দিয়েই যেন বিদ্যুতের আঘাতে সমস্ত শরীর আক্ষিপ্ত হয়ে উঠল!"

"পা দ্রুত আপনি গেল সরে। ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'পারলুম না, পারলুম না, দিতে পারব না, পারব না।' বলতে বলতে স্বাভাবিক জোর এল দেহে— চোখের তারা প্রসারিত হয়ে জ্বলতে লাগল। চেপে ধরলে সরলার হাত, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হল, বললে 'জায়গা হবে না তোর রাক্ষসী, জায়গা হবে না। আমি থাকব, থাকব থাকব।' হঠাৎ ঢিলে সেমিজ পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণমূর্তি বিছানা ছেড়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে, 'পালা পালা পালা এখনি, নইলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে, শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত!' বলেই পড়ে গেল মেঝের উপর।"

— এ কি বীভৎস হৃদয়হীন নির্মম পরিণতি নিরপরাধ নীরজার। এক বিশ্ব-সত্যকে আপন ব্যক্তিত্বের ব্যাধিগ্রস্ত অস্তিত্বে এবং মৃত্যুতে বহন করেছে, তা হল 'ইম্মরটাল লংগিংস্' — মরণশীল জীবনে বাঁচার ও ভোগের অমর কামনা। তার মধ্যে পুষ্পিত পঙ্কজ এবং পঙ্ক সবই আছে, সব নিয়েই সত্য যে বাঁচার বাসনা। আধুনিক পাঠকের কাছে শুধু শেকসপিয়র নয়, জীবনানন্দের কবিতার কথাও মনে আসে—

'জোনাকির ভিড় সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে করে নি মাখামাখি?'

এও যেমন জীবন, তেমনি এও তো জীবনই—

"থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলেনি কি: 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনো জলে ভেসে?
চমৎকার।
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার।'"

'মালঞ্চ'-এর নায়িকা চরিত্রকে আশ্রয় করে যে নিগূঢ় কাব্যধর্ম প্রকাশ পেয়েছে তার উৎসমূলে আছে মৃত্যু, প্রেম ও নিসর্গরূপের (পুষ্পোপাদ্যানের তথা বাসন্তী দিনরাত্রির) সমবায়ী প্রেক্ষাপট। উপন্যাসটিতে যে সব নরনারীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতার ছবি উপন্যাসে আছে নিশ্চয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের পরিণামী সংবেদনে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা কিংবা ত্রিকোণ প্রণয়ের নৈতিক সংকট যেন গৌণ হয়ে যায়, মুখ্য হয়ে ওঠে আসন্ন মৃত্যুর অন্ধকার ছায়ার ভঙ্গুর প্রেমের জন্য নীরজার অসহায় আর্তির কাব্যময় ব্যঞ্জনা ঃ

"ওই বাগানটি সম্ভব আর আমিই হব অসম্ভব, এ হতেই পারেনা, কিছুতেই না। সন্ধ্যেবেলায় অমনি করেই অস্পষ্ট আলোয় কাকেরা ফিরবে বাসায়, এমনি করেই দুলবে সুপরিগাছের ডাল ঠিক আমারই চোখের সামনে, সেদিন তুমি মনে রেখো আমি আছি, আমি আছি, সমস্ত বাগানময় আমি আছি।"

চরম উপসংহারের ভয়ংকর পরিণামটুকু বাদ দিলে নীরজা চরিত্রের সামগ্রিক পরিকল্পনায় ও বিন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার সঙ্গে এই করুণ কাব্যময়তা গূঢ়ভাবে আশ্লিষ্ট হয়ে আছে— একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার আত্ম-প্রক্ষেপণই চরিত্রটি বিন্যাসে ব্যঞ্জনাধর্মী রোমান্টিক কাব্য প্রবণতা সহায়ক তা বলাইবাহুল্য। ফলত এইসব চরিত্র সৃজনে বাস্তবতা খুব বেশি প্রত্যাশিত নয় আবার তা উপেক্ষিতও নয়। যদিও সেই বাস্তবতা প্রচলিত বহিরঙ্গ বাস্তব ডিটেল্‌সের উপর নির্ভরশীল নয়। সেটি কোথাও কোথাও 'অন্তঃবাস্তবতা'র পর্যায়ভুক্ত।

প্রকৃতির রূপ-ভাষ্য (পরিবেশ)

'মালঞ্চে'র পরিবেশ মুখ্যত পারিবারিক। তাকে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র উপন্যাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা হিসাবে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন, তার প্রাথমিক পরিচয় আছে নামকরণে এর ব্যবহারে — সমগ্র রবীন্দ্র উপন্যাসে পরিবেশের উপর এ ধরণের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ আর দেখা যায় না। কেবল নামকরণেই নয়, মালঞ্চের পরিবেশ চিত্র মাঝেমাঝেই বিভিন্ন 'সিচুয়েশনে' দেখা দিয়ে উপন্যাসের নরনারীর মনস্তত্ত্বের নানা গভীর ইঙ্গিত ও মূল্যচেতনার আভাস এনেছে। উপন্যাসটিতে এই পুষ্পোদ্যানকে আশ্রয় করে একই সঙ্গে কাব্যময় নিসর্গরূপ ও নিগূঢ় মনস্তাত্ত্বিক নাট্যধর্ম উন্মোচিত হয়েছে। বস্তুত মালঞ্চের বাসন্তী প্রকৃতির অপরূপ 'লিরিক'-ধর্মী প্রেক্ষাপটেই করুণ তিক্ত নাট্যরস — এক তীব্র 'কনট্র্যাস্ট' রূপে যেন আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। অবশ্য উপন্যাসটিতে পুষ্পমালঞ্চের বিশদ চিত্ররূপ কোথাও বর্ণিত হয় নি, এটা লক্ষণীয়। বরং টুকরো টুকরো ছবির সুষ্ঠু ইঙ্গিতময় প্রয়োগ উদ্যানটিকে প্রতীকী তাৎপর্য দান করেছে। কখনও অর্কিড ঘর, কখনও গোটা বাগানটি যেন নীরজা আদিত্যের ভালবাসার প্রতীক হয়ে উঠেছে। যেদিন তাদের সেই প্রেমের পাত্রটি ছিল কানায় কানায় ভরা, নীরজার স্মৃতিতে সেদিনের মালঞ্চ-ও ছিল পুষ্পিত লাবণ্যে পরিপূর্ণ। আবার নীরজার অনুভবে যখন তাদের দাম্পত্য ভালবাসা ক্ষয়িষ্ণু, তখন তার চোখে সেই মালঞ্চের সৌন্দর্য-ও জীর্ণ, মলিন ও ভঙ্গুর। নায়িকার জীবনের, বিশেষভাবে তার হৃদয়ের অনুভূতির সঙ্গে পুষ্পোদ্যানের এই নিগূঢ় সজীব একাত্মতার ফলে উপন্যাসটিতে মালঞ্চ কেবল প্রতীকী উপকরণমাত্র। বস্তুত তা একটি প্রতীকী চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করেছে।

'মালঞ্চে'র নায়িকা নীরজার মনের সঙ্গে পুষ্পোদ্যানের এই গভীর অন্তরঙ্গ সাযুজ্য দেখে মনে পড়ে — হেনরী জেম্‌সের 'দ্য পোর্ট্রেট অব্ এ লেডি' উপন্যাসের নায়িকা ইসাবেলের জীবন সংক্রান্ত একটি চিত্রকল্পকে। জেম্‌স উক্ত উপন্যাসে ইসাবেলের জীবন-প্রসঙ্গে তার মানস সত্তার রূপান্তর প্রসঙ্গে একটি উদ্যানের প্রতীকী চিত্রকল্পের কাছে বারবার ফিরে এসেছেন — "Her nature had for her own imagination a certain garden - like quality."[৫]

ইসাবেলের মনের সেই উদ্যান নীরজার মনে প্রতিফলিত মালঞ্চের মতো কখনও স্নিগ্ধ সুরভিত কুঞ্জে পুষ্পিত শাখায় পরূপ, কখনও বা "Only dusty pestiferous tracts planted thick with ugliness and misery."[৬]

উপন্যাসটির আরম্ভ ও শেষ অংশের পরিবেশ রচনায় লেখক সূক্ষ্ম প্রয়োগ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। গ্রন্থটির ঘটনা মাত্র কয়েকদিনের। কিন্তু ওরই মধ্যে উপন্যাসের নায়িকার অন্তর্জীবনে যেন আমূল রূপান্তর ঘটে গেছে। একেবারে প্রথম পর্যায়ে মনের আকশে যেটুকু আশা ও আশ্বাসের অলোকিত সৌন্দর্য ছিল, অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছে সেই আলো সম্পূর্ণ মুছে গেছে। আর এই মানসচেতনার রূপান্তরের প্রেক্ষিত হিসাবে আরম্ভ ও শেষের উদ্যান তথা নিসর্গের পরিবর্তিত চিত্রকল্পের অপরূপ প্রয়োগ দেখতে পাই। আরম্ভে ও শেষে চোখে পড়ে নীরজার সেই একই শয়নকক্ষ। কিন্তু সেখান থেকে বাইরের উদ্যান ও প্রকৃতির যে রূপ দুই অংশে (আরম্ভ ও শেষ) দৃশ্যমান, তা প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা। প্রথম পরিচ্ছেদের বর্ণনা; " পূব দিকের জানালা খোলা। দেখা যায় নীচের বাগানে অরকিডের ঘর... বেড়ার গায়ে গায়ে অপরাজিতার লতা। অদূরে...জল কুলকুল করে বয়ে যায় নালায় নালায় ফুলগাছের কেয়ারির ধারে ধারে। গন্ধনিবিড় আমবাগানে কোকিল ডাকছে যেন মরিয়া হয়ে।"—এখানে ঘরের জানলা দিয়ে চোখে পড়ে মালঞ্চের মধ্যাহ্নকালীন প্রকৃতির স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সৌন্দর্য। অর্থাৎ মর্ত্যলোকের লাবণ্যময় রূপ তখনও বর্তমান, কিন্তু শেষ পরিচ্ছেদে রাত্রির পরিবেশে ওই কক্ষেরই "খোলা জানালার থেকে দেখা যায় বাগানের গাছগুলোর পুঞ্জীভূত কালিমা, আর তার উপরের আকাশে কালপুরুষের নক্ষত্রশ্রেণী।"—এখানে নায়িকার সমাসন্ন মৃত্যুর ম্লান ছায়ায় সেই একই জানালা দিয়ে দেখা নিসর্গ তার আগেকার সমস্ত লাবণ্য-দীপ্তি হারিয়ে মাটি ও আকাশ জোড়া এক অন্ধকার চিত্রকল্পের সংহত ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে।

ভাষার বন্ধন

'মালঞ্চ'-এর ভাষায় এই কাব্যময়তার লক্ষণ এই 'কন্টেন্টে'র সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ'— দুটি উপন্যাসেই দেখি অসুস্থ শয্যাগত স্ত্রীর চোখের সামনে তাদের স্বামীর পরকীয় প্রেমের কাহিনি গড়ে উঠেছে। কিন্তু 'দুই বোন'-এর কাহিনিতে অসুস্থ শর্মিলার মনোজীবনের কথা মুখ্য হয়ে ওঠেনি। প্রাধান্য পেয়েছে শশাঙ্ক-ঊর্মির প্রাণোচ্ছল পিপাসার ছবি। অন্যদিকে 'মালঞ্চ'-এর মূল আশ্রয় হল আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় ও ব্যর্থ প্রণয়ের বিষণ্ণ ভাবনায় আর্ত অসুস্থ এক নারীমনের ছবি। ফলে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয় উপন্যাসের বিবৃতি-বর্ণনার ভাষায় অনেক বেশি গীতিকাব্যোচিত মেদুর এক বিষাদময়তা ছড়িয়ে পড়েছে। বস্তুত ভাষার এই অন্তর্লীন প্রবণতা উপন্যাসটির প্রত্যাশিত আবহ রচনায় যথেষ্ট আনুকুল্য করেছে সন্দেহ নেই। একটি দৃষ্টান্ত দিই ঃ "বাগানের দেউড়িতে ঢং ঢং করে ঘন্টা বাজল বেলা দুপুরের। ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের সঙ্গে তার সুরের মিল। তিনটে পর্যন্ত মালীদের ছুটি। ওই ঘন্টার শব্দে নীরজার বুকের ভিতরটা ব্যথিয়ে উঠল, উদাস হয়ে গেল তার মন। আয়া এল দরজা বন্ধ করতে। নীরু বললে, না না থাক্। চেয়ে রইল যেখানে ছড়াছড়ি যাচ্ছে রৌদ্র-ছায়া গাছগুলোর তলায় তলায়।"

সমস্ত উপন্যাসটির বর্ণনা-বিবৃতিই এ ধরণের চিত্র-সংগীতের লাবণ্য-কোমল ইঙ্গিতধর্মী ভাষায় লেখা। এই ভাষার বাইরের বিন্যাসরূপ গদ্য হলেও সংক্ষিপ্ত বাক্যবিন্যাস, ক্রিয়াপদের আপেক্ষিক বিরলতা, গূঢ় ভাষণের সংহতি, ছন্দের দোলা ইত্যাদির গুণে এই ভাষা সমকালীন 'পুনশ্চ'-এর গদ্যকবিতার অবয়ব - সামুয্য লাভ করেছে। 'দুই বোন'-এর ভাষাতেও কোথাও এই গদ্যকবিতার প্রবণতা হয়ত চোখে পড়ে, কিন্তু আগেই বলেছি যে সঙ্গত কারণেই মালঞ্চের ভাষায় কাব্যময়তা তথা গদ্যকবিতার রূপের প্রকাশ অধিকতর সার্থক। ভাষার সাহায্যে প্রতীক-ধর্মী ইঙ্গিতময়তা সৃষ্টিতে ভাষায় মায়াবী কোমলতা সঞ্চারে 'মালঞ্চ' এক সফল শিল্পকর্ম। তবে প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে 'মালঞ্চ'-এর কাব্যময়তা তার একটি রূপ, ভিন্ন আরেকটি রূপ তার অন্তর্জ্বালাময় দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ নাট্যচেতনা। উপন্যাসে তা বিধৃত হয়েছে প্রধানত সংলাপের ভাষায় আর তাই স্বাভাবিক কারণে সংলাপের ভাষায়। কাব্যময়তার চেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে সংক্ষিপ্ত ক্ষিপ্রতা ও দৃঢ়সংহতি।

প্লট নির্মিতি

রবীন্দ্রনাথের শেষ জটা উপন্যাসের দ্বিতীয় 'মালঞ্চ'। ১০৩৯ (১৯৩৩) সালের অগ্রহায়ণ - ফাল্গুন মাসে বিচিত্রায় 'দুইবোন' প্রকাশিত হবার পর এই পত্রেই পরের বছর ১৩৪০ (১৯৩৪) সালে আশ্বিন-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'মালঞ্চ' আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ঘটে ঐ বছরেই।

'মালঞ্চে'-র নায়িকা প্রথমাবধি মৃত্যুশয্যায়, স্বামীর উন্মার্গ-বৃত্তিতে ঈর্ষাদগ্ধ, অশান্তচিত্ত। রোগগ্রস্ত জীবনে ঈর্ষার অনলে চিরকাল দগ্ধ হতে হতে তার এক বীভৎস প্রণালীতে অপমৃত্যু হয়েছে। এখানে প্লটে দশটি সাধারণ পরিচ্ছেদে কাহিনি সমাপ্ত হয়েছে। এটি পরিশুদ্ধ নাট্যরস সমৃদ্ধ প্লট। শিল্পী নিজে এর নাট্যকৃত রূপ রচনা করেছিলেন, অপ্রকাশিত সে পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্রভবনে (শান্তিনিকেতনে) রক্ষিত আছে। সুতরাং এই উপন্যাসটিতে বর্ণনা, সংলাপ, বিশ্লেষণ সহ আছে নাটকীয় তুরঙ্গগতি ও তির্যক, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপের প্রাচুর্য, যা শিল্পীকে এর নাটকীয় রূপ দিতে প্রলুব্ধ করেছে।

'মালঞ্চ'র দশটি পরিচ্ছেদের মধ্যে ৬টি দৈর্ঘ্যে এক থেকে দুই পৃষ্ঠা মাত্র এবং সর্ববৃহৎ ৪র্থ পরিচ্ছেদটি পৃষ্ঠাঙ্ক আট। প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে প্লটেব ভিতপত্তন আদিত্য-নীরজার বিবাহের পর যে একটি দশকের প্রলম্বিত হনিমুন ঐ মালঞ্চকে কেন্দ্র করে কেটেছে, তারই বিস্তৃত ইতিহাস। এটি বিগতকালের স্মৃতিচারণ। সেই একটি দশকের মিষ্টিমধুর দাম্পত্য জীবনের শেষে নীরজা একটি মৃতশিশুর জন্ম দিয়ে আজ কোন অজ্ঞাত, দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী, বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে তার দিন কাটে। এবং সেই অবস্থাতেই সুরভিত সে বিগত দিনের স্মৃতিচারণার এখন সহযোগী, তার শিশুকালের আয়া ও বর্তমানের পরিচারিকা রোশনি এবং বাগানের মালি হলা। বিবাহোত্তর জীবনের একটি দশক তাদের উভয়ের প্রেম-ভালোবাসা, স্বপ্নকল্পনা দিয়ে গড়া ঐ মালঞ্চের মধ্যে যেন তার স্মৃতি-সত্ত্বা এখনো জড়িয়ে আছে, ঐ মালঞ্চের মধ্যে অর্কিড হাউসটি ছিল যেন তার প্রাণভোমরা। সে সব তো এখন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে যুগান্তরের ইতিহাস, নীরজার কাছে। আদিত্য-নীরজার সম্মিলিত উদ্যমে যা হয়ে উঠেছিল তাদের সত্যের অমরাবতী, সেখানে আজ এই যৌবনবতী সরলার সঙ্গে তার স্বামী কাল কাটায়। স্বামী

সোহাগিনী নীরজা ছিল সেখানের রঙমহলের সাকী, নন্দনকাননের ইন্দ্রানী এবং আদিত্যের হোমসেক্রেটারি। একাধারে গৃহিণী, জায়া, সচিব। সেই বিগতযুগের ইতিবৃত্ত বর্তমানে মৃত্যুপথযাত্রী রোগিনীর স্মৃতিচারণার উপজীব্য। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "মালঞ্চই ইহার প্রচ্ছদপট রচনা করিয়াছে, সমস্ত উপন্যাসটির আকাশ-বাতাস পুষ্পোদ্যানের গন্ধে সুরভিত হইয়াছে।[৭]

কাহিনির প্রায় সূচনা থেকেই প্রেমিক নীরজা মৃত, তার ঈর্ষাজীর্ণ শরীরে এখন সেই প্রেমময়ী, সর্বসুখদাত্রী নীরজার প্রেতাত্মার আবাসস্থল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখি, ক্ষুদ্রমনা, ঈর্ষাপরায়ণ, বিকৃত মস্তিষ্ক নায়িকা নীরজা, সরলা তার কাছে এক মায়াবিনী নারী, 'অলুক্ষণে মেয়ে'। তার 'মাঠের মতো কপাল, ঘোড়ার মতন লাফিয়ে চলন', 'মেয়ে মানুষের পুরুষালী বুদ্ধি ভালো নয় ওতে অকল্যাণ ঘটায়'।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ আজ দোলপূর্ণিমা, আবীর খেলার দিন। 'দুইবোন'-এ এদিন যৌবনদীপ্ত ঊর্মিমালা কর্মরত শশাঙ্ককে আবীর ও গুলালো রাঙিয়ে তুলেছিল, তারও সর্বাঙ্গে তার প্রতিদান এসেছিল মাত্রাধিক্যভাবে। সরলা ঊর্মিমালা নয়, রমেনও নয় শশাঙ্ক। দীঘির ঘাটে নীরবে, নিভৃতে, এখানে শুধু আবীর সহযোগে প্রেমের পূজা-উৎসব সম্পন্ন হল। উভয়েই জানে, এ প্রেম কোনোদিন চিরবন্ধনে আবদ্ধ হবার নয়, তবু তারা প্রেমের অমরাবতীতে ক্ষণকাল উপনীত হয়ে তাদের কামনা-বাসনা এমনি শুচিশুভ্র মন নিয়ে সার্থক করে তোলে। এ যেন দুই আসক্তিহীন প্রেম-পূজারীর মাটির পৃথিবীতে স্বর্গরচনার খেলা।

'রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্য' গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসু মন্তব্য করেছেন ঃ "বিষয়টি পুরোনো এবং চিরনূতন, এর মধ্যে মানুষের মনটাকে ভাঁজে ভাঁজে খুলে দেখাবার প্রচুর অবকাশ আছে বলে, যুগে যুগে কথকের কাছে এর আকর্ষণ অক্ষয়। 'দুইবোন' লিখে রবীন্দ্রনাথের যেন তৃপ্তি হলো না; বিষয়টিকে আরোও নির্মমভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছায় অল্পকাল পরেই আবার তাকে লিখতে হলো মালঞ্চ।"

সরলা সেই যুগে ৩১ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত থেকে সমাজকল্যাণমূলক নানা কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলাও ত্রিশোর্ধ বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থেকে দেশহিতকর নানা কাজের সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে রেখেছিলেন, যদিও ঠাকুর পরিবারের কন্যা তাঁর মায়ের নারীমুক্তির অসম্পূর্ণ আদর্শের কাছে নত হতে বাধ্য হন।

চার অধ্যায়

পূর্বাভাস

১৯৩৪ সালের গ্রীষ্মকালে বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় কবি তাঁর নৃত্যনাট্যের দলসহ দক্ষিন ভারত পরিক্রমার পর সিংহলের (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা) কলম্বো বন্দরে পৌছন। সেখানে গিয়েই সংবাদ পান আগের দিন দার্জিলিং-এর কাছে লেবং-এ বাংলার গভর্ণর স্যার জন অ্যান্ডারসনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি রক্ষা পেয়ে যান। পৌছানর পরদিনই (১০মে) এক তারবার্তায় কবি স্যার জন অ্যান্ডারসনকে জানান, এই ঘটনায় ''আমরা বাংলার সকলেই লজ্জিত ও অনুতপ্ত''।

শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক আকাশ বিশেষভাবে উত্তপ্ত। চরমপন্থীদের তৎপরতা যেমন বল্গাহীন, ব্রিটিশ শাসকদের চন্ডনীতিও তখন আরো মাত্রাহীন হয়ে উঠেছে। এই ঘটনাটির আগে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে অগ্নিযুগের বিপ্লববাদের প্রেক্ষিতে কবি একটা খসড়া কাহিনি রচনা করেছিলেন। লেবং-এর ঘটনার পর শ্রীলঙ্কায় দুমাস অবস্থানকালে গ্রন্থটি সমাপ্ত করেন। জীবনী লেখক প্রভাতকুমার জানাচ্ছেন, দেশে ফিরে বারবার সেটি সংশোধনের পর ব্রহ্মবান্ধবের একটি উক্তি 'আভাস' নাম দিয়ে সেটি মুখবন্ধরূপে যোগ করে এটি প্রকাশ করলেন (ডিসেম্বর, ১৯৩৪)।

''সেই অন্ধ উন্মত্ততার দিনে একদিন...হঠাৎ এলেন উপ্যাধ্যায়।...আলাপের শেষে তিনি বিদায় নিয়ে উঠলেন। চৌকাঠ পর্যন্ত গিয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, 'রবিবাবু, আমার খুব পতন হয়েছে'। এই বলেই.... চলে গেলেন।.... ''

উপন্যাসের আরম্ভে এই ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী, বৈদান্তিক, তেজস্বী, নির্ভিক ,ত্যাগী, বহুশ্রুত, অসামান্য প্রভাবশালী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ঝাঁপ দিলেন বঙ্গভঙ্গ-স্বদেশী-আন্দোলনে। এই প্রসঙ্গটি 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে 'আভাস' প্রসঙ্গে স্মরণ করা হয়েছে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাস নিয়ে বির্তকের ঝড় উঠলে দ্বিতীয় সংস্করণে 'আভাস' পরিত্যক্ত হয়।

'প্রবাসী' পত্রে (বৈশাখ, ১৩৪২) 'চার অধ্যায়' সম্মন্ধে 'কৈফিয়ৎ' নামে একটি প্রবন্ধে তার জবাব দেন। তার মধ্যে তিনি লেখেন, ''চার অধ্যায়ের রচনার কোনো বিশেষ মত উপদেশ আছে কিনা সে তর্ক সাহিত্য বিচারে অনাবশ্যক। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এর মূল অবলম্বন কোনো আধুনিক নায়ক-নায়িকার প্রেমের ইতিহাস। সেই প্রেমের নাট্যরসাত্মক বিশেষত্ব ঘটিয়েছে বাংলাদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ভুমিকায়। এখানে সেই বিপ্লবের মধ্যে যে তীব্রতা ও বেদনা এসেছে সেইটিই সাহিত্যের পরিচয়। তর্ক উপদেশের বিষয় সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের উপকরণ'' (প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪২)।

বইটি প্রকাশের পর 'প্রবাসী'র 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধের পূর্বে অমিয় চক্রবর্তীকে একটি পত্রে (২৯ চৈত্র, ১৩৪১) কবি লেখেন,''চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি যাদু.... অন্তু আর এলার ভালোবাসার বৃত্তান্তটা লিরিকের তোড়া রচনা-নবেলের নির্জলা আবহাওয়ায় শুকিয়ে যেতে হয়তো দেরি হবে।''

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের রচনা সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন — ''তাঁহার অন্যান্য রচনার সঙ্গে ইহাদের প্রভেদ এই যে, প্রথম বয়সের রচনাগুলি পর্বে পর্বে ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়াছে,আর শেষ বয়সের রচনাগুলির তন্মধ্যে চিত্রও অন্যতম, মনোরহস্যের রসাতলে অবরোহণমুখী। প্রথম বয়সের রচনা উচ্চেতনমুখী। উচ্চেতন বলতে

বুঝি ব্যক্তিগত চৈতন্যের ঊর্দ্ধে যে বিশ্বব্যাপী চৈতন্যলোক আছে তাহাই, ইহাকে বলিতে পারি বিশ্বচৈতন্য। আর অবচেতনা থাকে ব্যক্তিগত মনের অস্পষ্ট অন্ধকারে, জ্ঞানের সাধারণ আলোক সেখানে প্রবেশ করে না বলিয়া সেই রহস্যলোক সাধারণত অজ্ঞাত রহিয়া যায়। বিশ্বচৈতন্যে উন্নীত হইতে যেমন অনুপ্রেরণার আবশ্যক, অবচেতনার গহ্বরে নামিতেও তেমনি অনুপ্রেরণার আবশ্যক ....। রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণার বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, দুই জাতীয় অনুপ্রেরণাই তাঁহার জীবনে কার্যকরী হইয়াছে-উচ্চেতনমুখী প্রথমদিকে, আর অবচেতনমুখী শেষ দিকে।''[১]

"........১৩১০-১২ সাল হইতেই এই ধরণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার পরিচয়, এবং ১৩৪০-৪২ পর্যন্তও এই পীড়া হইতে সে আপনাকে একেবারে নিঃশেষে মুক্ত করিতে পারে নাই। বাঙালীর এই মানসিক পটভূমিকার সম্মুখে 'চার অধ্যায়ের স্থাপনা''।[২]

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'আশ্রম বিদ্যালয়ের সূচনা' নামে একটি প্রবন্ধে তিনি উপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উপাধ্যায় ও তার সহযোগী রেবাচাঁদের (অনিমানন্দ) ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যের প্রথম উদার প্রশংসা ব্রহ্মবান্ধবের লেখনী থেকেই উৎসারিত হয়েছিল। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের 'গুরুদেব' অভিধাটিও তাঁরই দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধবের প্রতি তাঁর 'অপরিশোধনীয়' কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।

'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'চার অধ্যায়' উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন: ''প্রতিবেশের চারিদিকের বেষ্টনী-রেখাটি ছেদহীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে নাই সমগ্র অবস্থানটি আমাদের মানসনেত্রে অবিচ্ছিন্ন ঐক্যে প্রতিভাত হয় না।''

অলংকরণ

অগ্রহায়ণ ১৩৪১-এ প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'চার অধ্যায়'। প্যাস্টেলে প্রচ্ছদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

১৪ মার্চ ১৯৩৫ সালে অমিয় চক্রবর্তী কবিকে লেখেন:

Publisher-রা বলচে আপনার হাতের আঁকা black and white নক্‌সা পেলে তারা চার অধ্যায়ের ইংরেজিতে ব্যবহার করবে এবং বইখানি যাতে artistic এবং literary surprise রূপে য়ুরোপে প্রকাশ পায় তার ব্যবস্থা করবে। ....পূরবী গোছের size হবে- যদিও পাৎলা বই হবে, তবু spacing দিয়ে এবং প্রত্যেক chapter এর আগে একপাতা designs দিয়ে ফলিয়ে তুলবে। Pure design -এর দিকেই এদের ঝোঁক- Eric Gill বা Clare Leighton-এর block পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাঁদের হাতের চেয়ে আপনার হাতের জোরালো design পেলেই শতগুণে সবাই আনন্দিত এবং বিস্মিত হবে। সবসুদ্ধ ছ'খানি design চাই- তবে দু-চারটে বেশি হলেই ঠিকমতো বাছাই করে সাজাবার সুবিধা হয়। যদি design গুলির মধ্যে কোনো ভাবার্থ থাকে তাহলে এই বইয়ের সঙ্গে মানানসই হলে ভালো হয়, তাতে সবটাই সমৃদ্ধ হবে- গঙ্গার ধারের পোড়ো বাড়ির, অদ্ভুত সিঁড়ি, নানারকমের ছায়ামূর্তির আনাগোনা। কিন্তু design -এর কোনো রূপকার্থ থাকার বিশেষ দরকার নেই, বিশুদ্ধ design ও চলবে। কথাটা সবার মনে জেগেচে আর উৎসাহিত করে তুলেচে তাই সকলেরই ইচ্ছে আপনার হাতের আঁকা কিছু এই বইয়ে

যায়। যদি বেশি না হয় অন্তত cover-এর জন্যে এবং প্রথম পৃষ্ঠার জন্যে দুটো design হলেও চলে। মাসখানেক সময় আছে। এখানকার সমবেত প্রার্থনা আপনার কাছে জানালাম।

এরপর ২৮ মার্চ ১৯৩৫ রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তী কে লেখেন :

তোমার পাব্লিশরের মত নিয়ে কাজ কোরো। রথীদের পরামর্শেই চার অধ্যায়ের তর্জমা এখানে পাঠাতে cable করেছিলেম। কোনই প্রয়োজন ছিল না..... এখনো বলচি আমার অপেক্ষা না রেখে তুমি ছাপ্তে দিও।...... তোমার অনুরোধ মতো design আঁকতে বসেছি। শাদা কালো করিনি-রং দিয়েছি, তাতে ক্ষতি নেই- রং বাদ দিলে আপনিই ওগুলো হবে শাদা কালো। রঙের জন্যে আমার হাত নিশপিস্ করে।.........[৩]

চরিত্র

অতীন

এলা ও অতীনের ভালোবাসার কাহিনিই এর মূল কথাবস্তু। আখ্যায়িকার সঙ্গে পটভূমির সম্পর্ক কি আলোচনা করতে গিয়ে কবি নিজেই বলেছেন : ''নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়ক নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয় চারদিকের অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝর প্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষ রূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, একদিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ, আর একদিকে তার বাইরের সংবাধ। এই দুইয়ে মিলে তার সমগ্র চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এলা ও অতীনের ভালোবাসার সেই বৈশিষ্ট্য এই গল্পে মূর্তিমান করতে চেয়েছি।''

গল্পের নায়ক অতীন। অতীন-চরিত্রের বিবর্তনে স্পষ্ট যে, সে স্ব-ভাব ভ্রষ্ট, স্ব-ধর্ম বিচ্যুত, সে মনে করে তার আত্মা নিঃসংশয়ে পরাভব স্বীকার করেছে পরধর্মের কাছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অতীন যে পথে নেমেছিল সে পথ থেকে ফিরতে পারেনি, কারণ কর্মজাল জড়িয়ে ধরেছে, নিস্কৃতির উপায় ছিল না।

'চরিত্রের বিশেষত্ব' ও 'অবস্থার ঘাত প্রতিঘাত' চার অধ্যায়ে দুই-ই আছে। কিন্তু উপন্যাসে অবস্থার 'ঘাত প্রতিঘাত' অপেক্ষাকৃত গৌণ প্রকৃতির। এই প্রেম কাহিনির বহ্নিশিখাদীপ্ত আরক্ত ও আতপ্ত আবহ রচনা করেছে অতীন্দ্রের চরিত্র। অতীনের আদি বসতি ছিল বাণীলোকে। সে 'চিরদিন কথা-পাওয়া মানুষ'। সে জাত শিল্পী, স্বভাবে তার আভিজাত্য ও শালীনতার ধ্রুবলোক। কিন্তু সে স্বধর্মচ্যুত হয়েছে। বৈপ্লবিক চক্রান্তের জটিল জালে অবরুদ্ধ হয়ে শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যকে সে হত্যা করেছে। অবসরপুষ্ট অভিজাত জীবনচর্যাকে ছেড়ে সে দুঃখবরণের ব্রত গ্রহন করেছে। শিল্পীর এই স্বধর্মভ্রষ্টতার বেদনা তার সবচেয়ে বড় বেদনা। তাই এই পথভ্রষ্ট শিল্পী বলেছে: ''কতদিন কল্পনা করেছি সেই সিংহাসনের স্তম্ভে অলংকার রচনার ভার নিয়েছি আমিও। তোমার অন্তু চিরদিন কথা-পাওয়া মানুষ। তাকে কোনদিন ঠিকমত চিনবে সে-আশা আর রইল না- তাকে কিনা ভর্তি করে নিলে দলের শতরঞ্চ খেলার বোড়ের মধ্যে।''

বিপ্লব প্রসঙ্গে অতীনের সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, এতে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন করা হয়, রাষ্ট্র বিধাতাদের ইচ্ছা প্রত্যেককে একই মাপে রচনা করা। বিক্ষুব্ধ অতীন বলেছে: ''স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে পুতুল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল। মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়। আমাকে সেই জীব বলে শ্রদ্ধা যদি করতে তাহলে আমকে দলে তোমরা টানতে না, বুকে টানতে।'' রবীন্দ্রনাথ শুধু স্বাতন্ত্র্যের কথাই নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সপক্ষেও বহুবার নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। যে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কোনো মূল্য দেখে না তাকে কবি উচ্চ স্থান দেন নি (সকল মানুষ মিলে মৌমাছির মতো একই মতো একই নমুনায় চাক বাঁধবে, বিধাতা এমন ইচ্ছা করেন নি। কিন্তু সমাজ বিধাতারা কখনো সেই রকম ইচ্ছে করেন। তাঁরা কাজকে সহজ করবার লোভে মানুষকে মাটি করতে কুণ্ঠিত হন না। তাঁরা ছাঁটাই কলের মধ্যে মানুষ বনস্পতিকে চালিয়ে দিয়ে ঠিক সমান মাপের হাজার হাজার সরু সরু দেশলাই কাঠি বের করে আনেন)[৪]। অতীনের পথভ্রষ্টতার মধ্যে তার কবি জীবন ও ব্যক্তিজীবনের ট্রাজেডি নিহিত আছে। সে তার এই আত্মহত্যা সম্পর্কে অতিসচেতন- এই সচেতনতাই তার বেদনাকে তীব্রতর করেছে : ''স্বভাবকে হত্যা করেছি, সব হত্যার চেয়ে পাপ কোনো অহিতকে

সমূলে মারতে পারিনি, সমূলে মেরেছি কেবল নিজেকে। সেই পাপে আজ তোমাকে হাতে পেলেও তোমার সঙ্গে মিলতে পারব না।"

অতীনের এই আত্মঘাতী স্বভাবের মূলে আছে প্রেম। বাইরের দিক থেকে মনে হবে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাই বোধহয় অতীনের পথভ্রষ্টতার জন্য দায়ী। কিন্তু এলার প্রতি অনিবার্য আকর্ষণই তার এই প্রচেষ্টাকে তীব্রতর ও তরান্বিত করেছিল। দেশপ্রেমের নামে নারীপ্রেমের কাছে আত্মসমর্পণ করা তার পক্ষে আর এক ধরনের স্বধর্মচ্যুতি। তবু এই স্বধর্মচ্যুতির মধ্যে তার প্রেমিক আত্মার পরিতৃপ্তি। তাই এলার কাছে সে বলেছে: "তোমার সঙ্গে মিলতে চেয়েছিলুম এইটে অত্যন্ত সহজ কথা। দুর্জয় সেই লোভ। প্রচলিত পথটা ছিল বন্ধ। মরিয়া হয়ে জীবন পণ করলুম বাঁকাপথে। তুমি মুগ্ধ হলে। আজ জেনেছি আমাকে মরতে হবে এই রাস্তায়"। দেশপ্রেম ব্যাপারটি যে নিতান্তই বাহ্য, এলার প্রতি আকর্ষণই যে একমাত্র সত্য, অতীনের স্বীকারোক্তি থেকে তা প্রমাণিত হয়েছে। 'রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আবর্ত' ও 'মুখোশ পরা চুরি ডাকাতি খুনোখুনির অন্ধকার', অতীনের মনকে বিমুখ ও বিরক্ত করে তুলেছিল। শুধু তাই নয় এপথ মিলনেরও অন্তরায়, অথচ সেই গোলকধাঁধা থেকে বেরিয়ে আসার উপায়ও ছিল না। তাই অবরুদ্ধ কামনার দীপ্তশিখা গোটা উপন্যাসের মোহ-মদিরার কাঞ্চন-দ্যুতি সঞ্চারিত করেছে। অতীনের নিয়তি তার প্রেম। সেই প্রেমই নির্মম হয়ে তার অভিশপ্ত জীবনের উপরে নেমে এসেছে উদ্যত মৃত্যুর মতো। যে দিন সে স্বধর্মভ্রষ্ট হয়েছিল, সেইদিনই সে স্বভাবকে গলা টিপে মেরেছে। তারপর থেকে এক কালো ছায়া তাকে অনুসরণ করছে।

বৈপ্লবিক জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা অচরিতার্থ মিলনাকাঙক্ষার অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠেছে। এই অংশই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ অংশ। উপন্যাসের আধারটি যেন একটি স্বভাবশীতল পাষাণপাত্র, সেই পাত্রে ওই দুর্লভ অগ্নিশিখা জ্বলছে। অতীনকে দগ্ধ করে তারই প্রেম জ্বলছে। এই অংশগুলি যেন কয়েকটি অপূর্ব সুন্দর প্রেমের কবিতা। কখনো এ প্রেম কামনায় খরদীপ্ত, কখনো বা মিলনাকাঙক্ষায় উচ্ছ্বসিত, কখনো বা দুঃসহ বেদনায় করুণ, আবার কখনো বা পূর্বস্মৃতির পর্যালোচনায় বিষন্ন, উন্মনা। প্রেমের বিচিত্র মধুর লিরিক ঝঙ্কার উপন্যাসটির অপূর্ণতাকে ঢেকে দিয়েছে। 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে অতীনের সংলাপ মুখর হৃদয়াবেগ তার রাগরক্ত মনের পদ্মরাগরশ্মিতে উদ্ভাসিত। এটাই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

অতীন ও এলার প্রেম জীবনের মধ্যে কোনো দ্বিতীয় পুরুষ বা নারীর আবির্ভাব হয়নি। কিন্তু এখানে বাধা সৃষ্টি করেছে অতীনেরই অন্তঃপ্রকৃতি। এলা দেশের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করেছিল। কিন্তু অতীনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মনে হয়েছে, "এমন বিপ্লব ঘটতে পারে সে-কথা কোনোদিন ভাবতে পারিনি"। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'শক্তির গর্ব' ধূলিসাৎ হয়েছে। চার অধ্যায়ের প্রেমাবেগের মধ্যে যে দুঃসহ বেদনা আছে, তার উৎসমূল কোন তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে নয়, কোনো বাইরের ঘটনার প্রবল অভিঘাতে নয়। অতীনের আত্মদ্রোহ ও স্বভাব বিরোধিতার মধ্যেই এই প্রেমের তীব্র বিক্ষোভ ও উজ্জ্বল অপচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়টিকে এই প্রেমের ভূমিকা বলা যায়। এই ভূমিকার শুরুতেই অতীনের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে: "তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ"। কবিতার এই চরণটি ক্ষণ-উচ্চারিত নয়, এ যেন সেই ভীষণ মধুর প্রেম নিয়তির সর্ব প্রথম পদক্ষেপ, যার সর্বনাশা নৃত্যের তালে তালে চার অধ্যায়ের রক্তফেনোচ্ছল প্রণয়সুরা উচ্ছ্বসিত। এই স্মর-গরল কাহিনির প্রথমেই রূপমুগ্ধ পুরুষের অমর পিপাসার ইতিবৃত্ত-"তোমার সঙ্গে আমার মিলন সেই মরীচিকার বাসর ঘরে" অথবা "যে আকাশ থেকে কোন এক অপরূপ পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চিরদিনটাকে"। এই অধ্যায়ের আসল কথক অতীন; এলার কাঠিন্য এখনো ঘোচেনি। সে অতীনের উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগের উত্তরে শুধু বলেছে :"আমি নিঃস্ব কতটুকুই বা তোমাকে দিতে পারি"। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমদিকে এলা চরিত্রে যতটুকু আবরণ ছিল, শেষদিকে তা উন্মোচিত হয়েছে। অতীন

প্রথম থেকেই যেমন নিজের হৃদয়কে সম্পূর্ন উদ্‌ঘাটিত করেছিল, এলার পক্ষে সম্পূর্ণভাবে আত্মোদ্‌ঘাটনের জন্য একটু সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। অতীন তার কাপুরুষতার জন্য অনুশোচনা করেছে; যথেষ্ট বর্বর হতে পারেনি কেন, এই তার অনুশোচনা। অতীনের ভদ্রতা ও কল্পনাপ্রিয়তার আড়ালে যে 'বর্বর পৌরুষ' ছিল তার বঞ্চিত দেহমন আর্তস্বরে বলে উঠেছে ঃ ''অন্তরে আমি পুরুষ, আমি বর্বর উদ্দাম। সময় যদি না হারাতুম এখনই তোমাকে বজ্রবন্ধনে চেপে ধরতুম, তোমার পাঁজরের হাড় টনটন করে উঠত; তোমাকে ভাববার সময় দিতুম না, কাঁদবার মতো নিঃশ্বাস তোমার বাকি থাকত না, নিষ্ঠুরের মতো টেনে নিয়ে যেতুম আপণ কক্ষপথে''। অতীনের এই বর্বর পৌরুষের উত্তাপে এলার মনের যতটুকু যুক্তিতর্ক, বুদ্ধিশালিনী নারীর মত বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, আত্মরক্ষার তুষারস্তিমিত আবরণ - সমস্ত কিছু বিগলিত হয়ে আদিম নারীর নিরাবরণ কণ্ঠ আবেগস্পন্দিত হয়ে উঠেছে ঃ ''দস্যু আমার, কেড়ে নিতে হবে না গো, নাও এই নাও, এই নাও''।

তৃতীয় অধ্যায়ের শেষার্ধ থেকে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত একটানা একটি সংলাপ যেন একটি অখন্ড লিরিক। এর অনেকখানিই অতীনের পূর্বস্মৃতির আলোকে অপরূপ। শেষ অধ্যায়ের এই অভিশপ্ত প্রণয়ীযুগলের উপর যখন আতঙ্কের ছায়া নেমে এসেছে, তখনকার লিরিক আরও দানা বেঁধে উঠেছে। একদিকে অতীনের স্মৃতি রোমন্থন, অন্যদিকে এলার আত্মসমর্পণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর মাঝে মাঝে শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় আসন্ন বিপদের সঙ্কেত চারঅধ্যায়ের শেষাংশকে কামনায় খরদীপ্ত ও বেদনায় করুণ করে তুলেছে। এলা অতীনের উপরেই দোষারোপ করে বলেছে ঃ ''তোমার স্বভাব এক জায়গায় মেয়েদের মতো। ইচ্ছা থাকতে পারে প্রবল কিন্তু উদ্দাম ভাবে তার দাবি প্রকাশ করতে তোমার রুচিতে ঠেকে''। অতীন চরিত্র অনেক বেশি 'সেন্টিমেন্টাল'- তাই সে রোমন্থনের আমেজ কাটিয়ে 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' হতে পারে না। চরিত্র হিসেবে অতীনের কাছে এলা অনেকখানি নিষ্প্রভ। কিন্তু অতীনের তুলনায় এলার মন অনেক পরিণত - 'প্র্যাক্‌টিক্যাল'। নারী-পুরুষের জীবনদৃষ্টির এই পার্থক্য উত্তর-রবীন্দ্রের উপন্যাসে বহুবার দেখা দিয়েছে।

অতীনের কণ্ঠে লিরিকের উচ্ছ্বাস-তীব্র, বর্ণময় কিন্তু অখণ্ড। লিরিকের মসৃণ-চিক্কণ গতি সমতলবাহী ; এলা চরিত্র নাটকীয়, আকস্মিকতার চমকে চমকে তার চকিত ঔজ্জ্বল্য- কয়েকটি ক্লাইম্যাক্স নিয়ে তার চরিত্র তৈরী।একেবারে একসঙ্গে তাকে পাওয়া যায় না,-এক একটি ক্লাইম্যাক্সের উত্তপ্ত মুহূর্তে তার রহস্যের এক একটি প্রান্ত শিথিল হয়। সর্বনাশের চূড়ান্ত মুহূর্তে তার সর্বশেষ অন্তর্বাসটিও শিথিল হয়েছে ঃ

এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে ''মারো আমাকে অন্তু, নিজের হাতে। তার চেয়ে সৌভাগ্য আমার কিছু হোতে পারে না''। মেঝের থেকে উঠে দাঁড়িয়ে অতীনকে বারবার চুমো খেয়ে খেয়ে বললে ''মারো এইবার মারো''। ছিঁড়ে ফেললে বুকের জামা।

অতীন পাথরের মূর্তির মতো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এলা বললে, ''একটুও ভেবো না অন্তু। আমি যে তোমার, সম্পূর্ণই তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।''

এলার এই মৃত্যুকামনার মধ্যে আর একটি দিক আছে,- সেটি বেঁচে থেকে অতীনের প্রেমে ধন্য হওয়ার কামনা। আসলে সে মৃত্যুকামনাই নয়, অতৃপ্ত ও তৃষিত জীবনের সর্বশক্তি দিয়ে অতীনের কাছে আত্মসমর্পণ করে নবজীবন লাভের শেষ প্রচেষ্টা। অতীনের নিজের প্রকৃতি যেখানে এই মিলনের দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় সৃষ্টি করেছে, এলা সেখানে সমস্ত নিষেধের, সংস্কারের আবরণ নিজ হাতে ছিঁড়ে ফেলেছে। কারণ এলা রূপিণী নারীর এই হল সর্বশেষ অস্ত্র-সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। যদি সেই অব্যর্থ শরনিক্ষেপে অতীন্দ্ররূপী পুরুষকে আয়ত্ত করা যায়।অতীনের দ্বিধা নেই, সে প্রথম থেকেই প্রাণে এলাকে পাওয়া যাবে না-তাই শুধু কাব্য-ভাষণেই তার কামনাকে রূপ দিয়েছে। এলা দেশের কাছে উৎসর্গীকৃত, কিন্তু দুর্বার প্রেমাবেগ তার সর্ববন্ধন ছিন্ন করেছে। নারী-পুরুষের আদিম

বর্বর ভালোবাসার এমন নাট্যকাব্য রবীন্দ্রসাহিত্যে দুর্লভ। নারী পুরুষের প্রেমচর্যার পার্থক্যকে যেমন এখানে সূক্ষ্মভাবে আঁকা হয়েছে, তেমনি প্রেমের আদর্শায়িত দিব্য ভাবরূপের গহনতলে যে অন্ধ, উন্মত্ত ও বর্বর রূপ আছে তাকেও উত্তর সপ্ততিবর্ষ কবি দুঃসাহসিকতার সঙ্গে রূপ দিয়েছেন। আরও পরে কবি 'ল্যাবরেটরি' গল্পের সোহিনীকে সৃষ্টি করেছেন। সোহিনী অসাধারণ, কিন্তু তার মন এত বেশি পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে সেখানে প্রেমের আদিম রহস্যলীলার ছায়াপাত ঘটেনা। এলা যত বুদ্ধিমতীই হোক না কেন সোহিনীর তুলনায় তার মন কাঁচা। অন্তর ও বাহিরের ঝড় যখন একই সঙ্গে আঘাত হেনেছে তখন থিসিস-লেখা বিদ্যা ও ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য-কঠিন যবনিকা ছিন্ন হয়েছে- সেই ছিন্ন যবনিকার আড়ালে যাকে দেখা গেল, এক আদিম যুগের নগ্ন নারী, বর্বর ভালোবাসার তৃষ্ণায় যার কণ্ঠ পিপাসাতুর, দেহ বন্ধন শিথিল।

উত্তরপর্বের উপন্যাসে ব্যক্তিচরিত্রের যে নিঃসীম আকাঙ্ক্ষা, জীবন সম্পর্কে তার যে অনিঃশেষ জিজ্ঞাসার প্রবণতার কথা আগেই বলেছি, তার মধ্য দিয়ে চরিত্রের যে ব্যঞ্জনাধর্ম আভাসিত, তা বলা বাহুল্য, রোমান্টিক কাব্য চেতনায় আক্রান্ত। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ থেকে তাঁর, কবি দৃষ্টি, poetic vision কে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, সঙ্গতও নয় জীবনকে তার সমগ্রতায় উপলব্ধি করতে গেলে শ্রষ্টার সৃজনীচেতনাকে সমন্বয়ী তথা সামগ্রিক হতেই হবে, আলাদা হলে চলবে না। কিন্তু আমরা এখানে ঠিক সেই অর্থে কাব্যচেতনার কথা বলছি না। আমরা বলতে চাই, উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রের বিন্যাস-রীতিতে লেখক যেখানে বহিরঙ্গ বাস্তবের বাস্তব জীবনচিত্রের ডিটেলসের উপর বেশি নির্ভর না করে রোমান্টিক ভাবচেতনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আর এ ধরণের ব্যাপার ঘটেছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের উত্তরপর্বের উপন্যাসে। এই পর্বেই যেন কবি-রবীন্দ্রনাথ, রোমান্টিক-রবীন্দ্রনাথ, সংকেত ও ব্যঞ্জনার শিল্পী রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এলা

চার অধ্যায় উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনকে সামনে রেখে সেই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত রূপ কিভাবে মনস্তাত্ত্বিক সংকটের সৃষ্টি করে এলা ও অতীন্দ্রের অর্ন্তজগতের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করেছে, সেই কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু দ্বন্দ্ব এখানে বর্হিজগতের সঙ্গে অর্ন্তজগতের নয়, বর্হিজগতের ক্রিয়াকলাপ মানুষের অর্ন্তলোকে যে দ্বিধার সৃষ্টি করছে সেই দ্বিধাই চার অধ্যায় উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা নিয়ে এসেছে।

নায়িকা এলা নারীসুলভ কোনও শালীনতার ভান না করেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার চিন্তা-ভাবনার বিচার- বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত ছিল। পুরুষই যে কেবল নারীর উপর পীড়ন করে তাই নয় নারীও, তার মানসিক পশ্চাদপদতার কারণেই কিভাবে পুরুষকে- তার স্বামীকে পীড়ন করতে পারে তার দৃষ্টান্ত এলার মা -বাবার দাম্পত্য জীবন। তার প্রথম কৈশরের দিনগুলিতে সে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করত বাবার উপর মায়ের পীড়ন। এলা সেই বয়সেই নিজের অত্যাচারিনী স্ত্রীর অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বাবাকে ভীরু বলে মনে করত। আধুনিক নারীবাদিদের কাছেও এ এক শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত। পুরুষের উপর মানসিক পীড়নের একপেশে ঝোঁক যে নারী প্রগতির আন্দোলনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে একথা তাদের মনে রাখা উচিত।

বিবাহই যে নারী জীবনের একমাত্র মোক্ষলাভের উপায় নয় এই ধারণা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী পর্যায়ের সব নায়িকার মধ্যেই বর্তমান। 'সরলা'র মত কবিতায় বা 'অপরিচিতা'-র মত গল্পে যেমন নারী বধূবেশ প্রত্যাখ্যান করে- 'যাব না বাসর কক্ষে বধূবেশে সাজায়ে কিঙ্কিনী'। এলাও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করার পর তার মায়ের মৃত্যু হলে তার বাবার তাকে বিবাহ দেবার ইচ্ছায় সম্মতি জানাতে পারেনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডি সসম্মানে উত্তীর্ন হওয়ার পর তার বাবাও মারাগেলেন তাকে অবিবাহিত রেখেই। তারপর কাকার সংসারে এসে পড়ে এলা। সেই পরিবারেও তার কাকিমার সংকীর্ণতা তাকে ব্যথিত করে। কিন্তু পূর্ববর্তী কালের নারীদের মতো বিবাহের জাঁতাকলে পিষ্ট হবার কথা সে চিন্তা করতে পারেনা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেয়েদের বিবাহ নিতান্ত নাবালিকা অবস্থায় দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রির ছাপ কারও মধ্যেই ছিল না। কিন্তু তার সৃষ্ট নায়িকাদের তিনি স্বতন্ত্র করে গড়ে তুলেছেন।তারা কাজের অধিকার দাবি করেছে। কর্মের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে নিজেদের। এলা ইন্দ্রনাথকে, সম্পূর্ণ অপরিচয়সত্ত্বেও অসংকোচে বলেছে, 'আমাকে আপনার কোনো একটা কাজ দিতে পারেন না'।'আজকালকার দিনে' অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে এ রকম আবেদন বিশেষ আশ্চর্যের নয় এ কথা ইন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন এবং স্বীকার করে নিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। পুরষের প্রেরণাস্থল হয়ে নিজেকে আড়ালে রাখার সাধনাই কেবল নয়, কর্মোদ্যোগী মেয়েদের সক্রিয় অংশগ্রহণও রবীন্দ্রনাথের সম্মতি পেয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। বিপ্লবী দলের নেতা ইন্দ্রনাথ এমনই একটি মেয়ের সন্ধানে তৎপর ছিলেন যে তরুণদের দেশের কাজে আত্মোৎসর্গের জন্য আকর্ষণ করতে পারে। এলার আবেদনের সাড়া দিয়ে ইন্দ্রনাথ বললেন, ''কলকাতায় সম্প্রতি নারায়ণী হাইস্কুল মেয়েদের জন্য খোলা হয়েছে। তোমাকে তার কর্ত্রীপদ দিতে পারি, প্রস্তুত আছ ?''

'প্রস্তুত আছি যদি আমাকে বিশ্বাস করেন'।

ইন্দ্রনাথ এলার মুখের দিকে তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি রেখে বললেন, 'আমি লোক চিনি। তোমাকে বিশ্বাস করতে আমার মুহূর্তকাল বিলম্ব হয়নি। তোমাকে দেখামাত্রই মনে হয়েছে, তুমি নবযুগের দূতী , নবযুগের আহ্বান তোমার মধ্যে !'।

হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মুখে এমন কথা শুনে এলার বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। সে বললে, 'আপনার কথায় আমার ভয় হয়। ভুল করে আমাকে বাড়াবেন না। আপনার ধারনার যোগ্য হবার

জন্য দুঃসাধ্য চেষ্টা করতে গেলে ভেঙ্গে পড়বে। আমার শক্তির সীমার মধ্যে যতটা পারি বাঁচিয়ে চলব আপনার আদর্শ, কিন্তু ভান করতে পারব না।'

''ইন্দ্রনাথ বললেন, 'সংসারের বন্ধনে কোনোদিন বদ্ধ হবে না এই প্রতিজ্ঞা তোমাকে স্বীকার করতে হবে। তুমি সমাজের নও তুমি দেশের।''

এলা মাথা তুলে বললে, 'এই প্রতিজ্ঞাই আমার'। রবীন্দ্রনাথ চার অধ্যায় উপন্যাসের প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত 'আভাস' শিরোনামাঙ্কিত ভূমিকায় ব্রহ্মবান্ধবের জীবন ও কর্মকে 'চার অধ্যায়' রচনার প্রেরণা বলে উল্লেখ করেন। অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষ তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : 'ইন্দ্রনাথ-এলা-অতীনের কাহিনী অংশে বিবেকানন্দ -নিবেদিতা-ব্রহ্মবান্ধবের,.... ফটোগ্রাফিক সাদৃশ্য নয় কিন্তু নিশ্চিতরূপে নিবিড়তম অন্তস্তলশায়ী অনুষঙ্গগত সাযুজ্য-সামীপ্য তথ্যসচেতন রসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অনুভব করবেন...।'[৫] যাই হোক বাস্তব পরিবেশ থেকেই তো স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির রসদ সংগ্রহ করে নেন।

বিপ্লবীদের শিবিরে এলা দলের কাজে পাঁচবছর আত্মনিয়োগ করেছিল। সেখানে দ্বিতীয় বছরে উচ্চশিক্ষিত যুবক অতীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথের এটি একমাত্র রচনা যেখানে একটি মেয়ে স্বয়ং প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলতে এগিয়ে এসেছে। এলা অতীনের কাছে স্মৃতিচারণার ছলে তাদের প্রথম সাক্ষাতের কথা স্বীকার করেছে- 'জীবনে সেই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য একচমকের চিরপরিচয়' মন বললে, কোথা থেকে এল এই অতিদূর জাতের মানুষটি, চারদিকের পরিমাপে তৈরি নয়, শেওলার মধ্যে শতদল পদ্ম। তখনই মনে মনে পণ করলুম এই দুর্লভ মানুষটিকে টেনে আনতে হবে, কেবল আমার নিজের কাছে নয়, আমাদের সকলের কাছে'। তবে 'শেষের কবিতা'-র লাবণ্যর মতো সেও তার প্রেমিক অতীনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় নি, ইন্দ্রনাথের কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করেছে যে তার পক্ষে নিজের সুখের কথা চিন্তা করাও পাপ-একথা এলা গভীরভাবে বিশ্বাস করাতে নিজেকে চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতীনের প্রতি তীব্র আকর্ষণের কাছে সে পরাস্ত হল। ব্যাকুল হয়ে সে অতীনকে বলে, 'এখনই তুমি হুকুম করো আমি ভাঙব পণ। ভুল করেছি আমি।..... আমি তোমার সেবিকা, তোমার চরণের সেবিকা, আমাকে ফেলে যেয়ো না, ফেলে যেয়ো না'। কিন্তু অতীন তার প্রস্তাবে রাজি হয় না। নিঃসন্দেহে বলা চলে রবীন্দ্রসাহিত্যে অঙ্কিত নায়িকা চরিত্রের মধ্যে এলা সর্বপেক্ষা দুঃসাহসিকা। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের নায়িকা সোহিনীর মতো সেও প্রায় লৌকিকতা বর্জিত। রবীন্দ্রসৃষ্ট অপর কোন নায়িকাই এলার মত স্পষ্টভাষিনী এবং বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধিসম্পন্না নয়। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় বলা যায়, 'একথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের অন্য কোনো রচনায় স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়-বাসনার এমন তীব্রতা এমন স্বচ্ছ হয়ে প্রকাশ পায় নি যেমন পেয়েছে 'চার অধ্যায়ে'। তাঁর গদ্য বইয়ের মধ্যে একমাত্র এখানেই তিনি স্বীকার করেছেন যে ভালোবাসা বর্বর'।[৬]

জীবনদর্শন সম্মন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রকার obscurantist মনোভাব ছিল না, সমাজ জীবনের অনিবার্য পরিবর্তনকে সহজ প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি রূপেই তিনি গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবন একদিকে যেমন গভীর আধ্যাত্মিক হচ্ছিল তেমনি বাইরের দিকে Unconventional ও Secular হয়ে বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিচিত্র ভাবে রূপ নিচ্ছিল। না হলে 'জন্মদিনে'র পাশাপাশি তিনি 'ল্যাবরেটরি' লিখতে পারতেন না'।[৭]

প্রকৃতির রূপ-ভাষ্য (পরিবেশ)

উপন্যাস যদি কেবল সংলাপে পর্যবসিত হয়, তবে সমালোচক বার্ণাড দ্য ভোটো যাকে বলেছেন, উপন্যাসের প্রকৃত 'Substance and colour' তার অভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাছাড়া কেবল সংলাপের মাধ্যমেই চরিত্র পাঠকের মানসপটে প্রত্যক্ষগোচর হয় না, তার জন্য প্রয়োজন বাস্তব পরিবেশের সজীব চিত্ররূপ। পাঠকের এই মানসিকতা সম্পর্কে দ্য ভোটো-র আর একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি স্মরণীয়: "He must have some way of visualizing the character against a background .... A scene can't be only dialogue for him."[৮]

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা অংশে পরিবেশচিত্র নায়িকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সাযুজ্যের ইঙ্গিত বহন করেছে। সেখানে আসবাব ও অন্যান্য জিনিসপত্র সহ এলার ঘরের যে চিত্ররূপ ফুটে উঠেছে, তার সঙ্গে এলার সুদূর ব্যক্তিত্বের গূঢ় সংশ্লেষের সংকেত আছে। এই সঙ্গে আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, চার অধ্যায়ের অন্তত দুটি অধ্যায়ের সূচনায় পরিবেশ-চিত্র-বর্ণনায় রঙের প্রতি লেখকের বিশেষ প্রবণতা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাতটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে পাঁচটি ভিন্ন রঙের এবং তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম বাক্যটিতেই চার রকম সবুজের বর্ণলতা চোখের সামনে ঝলমল করে ওঠে। মনে রাখতে হবে, চার অধ্যায় রচনাকালে (১৯৩৪) রবীন্দ্রনাথ কেবল বিশ্ববন্দিত লেখক নন, রীতিমত এক প্রতিষ্ঠিত আধুনিক চিত্র শিল্পীও বটে, রঙের বিচিত্র প্রয়োগে যাঁর ছবির জগৎ সমুজ্জ্বল। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের সমকালীন আধুনিক ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে ভার্জিনিয়া উলফের impressionist চিত্রকলা-প্রভাবিত পরিবেশ - চিত্রের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

'চার অধ্যায়ে' 'বর্তমানে'-র সমস্যাসংকুল পরিবেশের পাশে দু একটি অতীতদিনের আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশচিত্র আঁকা আছে- যেমন (ক) স্টিমারের পরিবেশ (খ) এলার বাসার ছাদে অতীতের জন্মদিনের আনন্দানুষ্ঠান-পরিবেশ। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, সেদিনের সেই অনুষ্ঠানের আনন্দোজ্জ্বল পরিবেশ ছিল যে -ছাদে, ঠিক সেখানে আজ কয়েকমুহূর্ত পরেই অতীন - এলা তাদের জীবনের চরমতম সংকটের মুখোমুখি হতে চলেছে [৯] । প্রয়োগ কৌশলের দিক থেকে এটি তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের উপন্যাসে পরিবেশের একটি প্রধান লক্ষণ এর সীমিত সংহত রূপ। সেদিক থেকে শেষ উপন্যাস চার অধ্যায়ের মঞ্চধর্মী দৃশ্যপটের দৃঢ়বদ্ধ প্রতীকী সংহতিকে নিঃসন্দেহে প্রয়োগচিন্তার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের এক নতুন নিরীক্ষারূপে গণ্য করা চলে। 'করুণা' থেকে 'চার অধ্যায়' এর বিবর্তন, তা'তে রবীন্দ্রনাথ প্রথানুসারী পরিবেশচিত্রণ থেকে শুরু করে ক্রমে আধুনিক উপন্যাসের নিজস্ব যে রীতিবৈশিষ্ট্য-ব্যঞ্জনাধর্মী প্রতীকী চিত্রকল্প-রচনার সংহত রীতি-তাকে খুঁজে পেয়েছেন। উপন্যাসের প্রয়োগশিল্পে রবীন্দ্রনাথের পরিমিতজ্ঞান ও ঔচিত্যবোধ (Sence of Propriety) কত নির্ভুল ও সূক্ষ্ম, দৃষ্টি কত গভীর ও ইঙ্গিতবহ-তার একটি নিশ্চিত প্রমাণ এই পরিবেশ বিন্যাসরীতি। বিপ্লবপন্থীদের পরিবেশ চিত্রণের মাধ্যেও অবাস্তবতা আছে। কানাই গুপ্তের চায়ের দোকান প্রথম অধ্যায়ের পটভূমি। কবি যত দুর সম্ভব এই বর্ণনাটিকে বাস্তবনিষ্ঠ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বেশ বোঝা যায় যে কবি তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে পদক্ষেপ করেছেন। তাই এই ছবি অস্বাভাবিক। মনে হয় কতকগুলি পূর্ব সংস্কার ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে তিনি বর্ণনা দিয়েছেন। 'ছিন্নপ্রায় চটের পর্দা', দার্জিলিং চা কোম্পানির মার্কা-মারা প্যাকবাক্স', 'হাতল ভাঙ্গা দুধের জগ' প্রভৃতি উপকরণ সংগ্রহ করে কবি যথেষ্ট বাস্তব নিষ্ঠ বর্ণনা দিতে চেয়েছেন। কিন্তু এর চেয়ে অবাস্তব অংশ এই উপন্যাসে আর নেই। তৃতীয় অধ্যায়ে অতীনের গুপ্ত

বাসস্থানের বর্ণনাকে কবি যথাসাধ্য বাস্তব করার চেষ্টা করেছেন। মেঝের উপর কম্বল, চাটাই, বালিশের বদলে বই ভর্তি পুরোনো ক্যাম্বিসের থলি, 'এনামেল উঠে-যাওয়া একখানি বাটি','নোনা রঙের ছোপ-লাগা অনেকগুলো ময়লা গামছা' প্রভৃতি দিয়ে পরিবেশের রূঢ়তা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই নিতান্ত পোশাকী। সুমার্জিত ভাষা, বানীবিলাস ও অনন্যসাধারণ বৈদগ্ধ যেন পরিবেশের কুশ্রীতাকে ঢেকে দিয়েছে। এই ধরনের ছবি আঁকার চেষ্টা তার শেষ জীবনের কতকগুলি কবিতাতেও লক্ষ করা যায়। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় যে দৈনন্দিন জীবনে কুশ্রীতা ও দৈন্যের ছবি জোর করে আঁকতে বসে কবি সার্থক হতে পারেন নি। এই জাতীয় মালিন্য ও শ্রীহীনতা কবিকে পীড়িতই করেছে। তাই কবি একটু পরেই এই সমস্ত প্রসঙ্গের পাশ কাটিয়ে সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন। 'অনসূয়া' কবিতায় নোংরা গলির শ্বাসরোধকারী পরিবেশকে অতিক্রম করে তিনি কালিদাসের যুগের বরনায়িকাদের সন্ধানে চলেছেন উজ্জয়িনীর রূপ তীর্থে। 'চার অধ্যায়ের' বাস্তব পরিবেশ আঁকার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, মাঝ খান থেকে অতি নাটকীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

গুপ্তহত্যা, অজ্ঞাত আততায়ীর বিভীষিকা, মাঝে মাঝে বিপদ সঙ্কেতসূচক হুইস্‌লধ্বনি, লাল রঙের চিঠি 'ডেনজর সিগন্যাল'- কোনটিরই অভাব নেই। কিন্তু এতো আয়োজন সত্ত্বেও নেপথ্যের অন্তরালবর্তী-ভীতি-রহস্যসূচক আবহাওয়া তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। আসন্ন বিপদের রহস্য সঙ্কেতের দ্বারা দৃশ্যগুলিকে ব্যঞ্জনাগর্ভ করে তোলা হয়নি। ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'চার-অধ্যায়ের' এই প্রসঙ্গটি সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : ''মাঝে মাঝে হুইস্‌লের শব্দ পাই বটে, কিন্তু ইহা রঙ্গালয়ের মেকি হুইস্‌ল , ইহা আসন্ন বিপদের তীক্ষ্ম সূচনা, রহস্যময় অগ্রদূত হিসাবে চিত্তকে স্পর্শ করে না। এলার জীবনে এমন কি শঙ্কাময় সম্ভাবনা আসন্ন যাহাতে ক্লোরফর্মের সাহায্যে তাহাকে চেতনার দ্বার রুদ্ধ করিতে হইবে, সেই ভয়াবহ পরিণতির সুরটি উপন্যাস-মধ্যে বাজিয়া উঠে না''।[১০]

প্রথম অধ্যায়ে কানাইএর দোকানের প্রতিচিত্র, তার আগে 'করুণা' উপন্যাসে কাশীর এক দরিদ্র পল্লীর একটি বাড়ির বর্ণনায়, পরে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে পরিত্যক্ত একটি কুঠিবাড়ির বিবরণে একই কল্পনায়িত শিল্পরীতির অনুবর্তন। 'জীবনস্মৃতি'র 'স্বাদেশিকতা' পরিচ্ছেদে কিশোর কবি তার জ্যোতিদাদার সঙ্গে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পোড়ো বাড়ির গোপনসভার বিবরণ দিয়েছেন, সেখানের শিল্পরীতিও খুব বেশি ভিন্ন নয়।

ভাষার বন্ধন

চার অধ্যায়ের কাঠামো বহুলাংশে নাটকের মতো হলেও, এর আন্তর সত্তা একান্তভাবে নাট্যধর্মী নয়। সেই সত্তার সঙ্গে অবশ্যই বিজড়িত হয়ে আছে দ্বন্দ্বময় নাট্যচেতনা, কিন্তু তারই পাশাপাশি বলতে পারি, তারই সঙ্গে মেশামেশি হয়ে আছে সূক্ষ্ম লিপিকের ইঙ্গিতধর্ম। আর এই দুই প্রবণতারই প্রতিফলন ঘটেছে সংলাপের ভাষায়। বলাবাহুল্য চার অধ্যায়ের ঘটনা ও প্রেক্ষাপট ভাষায় এই যুগলবন্দী ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে-এই কড়ি-কোমলের মিশ্র সমাহার।

নাটকীয়তা সঞ্চারে যে সংলাপ প্রযুক্ত তাতে দেখতে পাই ভাষার দ্রুত সংহতরূপ সংক্ষিপ্ত বাগ্‌বন্ধ। এই কঠিন উজ্জ্বল ভাষার সাহায্যে লেখক প্রকাশ করতে চেয়েছেন আবেগের আবর্ত তথা ব্যক্তিত্বের সংঘাত। প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রনাথ ও এলার এবং তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে অতীন-এলার নাট্যধর্মী সংলাপ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শেষ দুটি অধ্যায়ে এলার সংলাপে কোথাও কোথাও দেখি, তার অসহায় যন্ত্রনার সুতীব্র আবেগ প্রকাশ করতে সে একই কথার পুনরুক্তি করেছে : "এলা অতীনের পা জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমি তোমার সেবিকা, তোমার চরণের সেবিকা, আমাকে ফেলে যেয়ো না, ফেলে যেয়ো না"। কিংবা, "আমি যে তোমার, সম্পূর্ণই তোমার, মরণেও তোমার। নাও আমাকে। নোংরা হাত লাগতে দিয়ো না আমার গায়ে, আমার এ দেহ তোমার।"-বলা বাহুল্য সংলাপের এ-ভঙ্গি নিঃসংশয়ে নাট্যধর্মী। এই গভীর আবেগের অন্য এক প্রকাশ দেখি উপন্যাসটির কাব্যরসাশ্রয়ী ভাষায়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ চার অধ্যায়ের ভাষায় এই কাব্যলক্ষণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: "চার অধ্যায়ের যে দিকটা আমাদের পাঠককে ভোলায় সে ওর কবিতা অংশ। ওর ভাষায় লাগিয়েছি জাদু, সেইটের ভিতর দিয়ে তারা যে জিনিসটা পায় সেটা গদ্যের বাহন নয়"।[১১]

একদিকে রোমান্টিক প্রেমিক কবিসত্তার স্মৃতিভারাতুর কোমল নমনীয় দিক এবং আরেকদিকে গাঢ় তীব্র অনুভব তথা সংরাগ ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই লিরিকধর্মী ভাষার মাধ্যমে। অবশ্য বলা বোধহয় নিষ্প্রয়োজন (কারণ তা শেষ পর্যায়ের উপন্যাস সমুহের আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছে) যে, এই কাব্যধর্মী ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে মননদীপ্তি, সচেতন বৈদগ্ধ ও চিত্রকল্পধর্মী, উপমা-উৎপ্রেক্ষাদির সাহায্যে বিস্ময়কর অলংকরণপ্রবণতা। ভাষার এইসব উজ্জ্বল উপকরণের সঙ্গে আশ্লিষ্ট হয়ে 'চার অধ্যায়ের' সংলাপের কাব্যময় ভাষা আধুনিক উপন্যাসের পরিশীলিত নায়ক-নায়িকার চরিত্রের অর্ন্তলোকের গূঢ় গভীর দিকগুলি, তাদের সুতীব্র স্বপ্ন কামনা, অতীত স্মৃতিবাহিত 'নস্ট্যালজিয়া' কিংবা স্বপ্নভঙ্গের নিরুপায় বেদনাকে সুন্দর অভিব্যক্তি দান করেছে: "সেই সুর আমার মনের মধ্যে এসে লাগল হঠাৎ আলোর ছটার মতো; যেন আকাশ থেকে কোন এক অপরূপ পাখি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল আমার চির দিনটাকে"। কিংবা,

"আমার চোখ দুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই আমার ছুটি। অতি ছোট তার আয়তন, সোনার জলে রাঙ্গানো ফ্রেমের মতো"।

বস্তুত 'শেষের কবিতা'-র পরে 'চার অধ্যায়ে' পৌঁছেই বিশেষ ভাবে দেখতে পাই-কাব্যের মোহমাখানো ভাষার 'জাদু'-তে পাঠককে 'ভোলাবার' এই প্রবণতা। অমিত বা অতীন রোম্যান্টিক কবি স্বভাবের বলেই যে কেবল এমন ঘটেছে, তা মনে করার বোধহয় কারণ নেই। অতীন সম্পর্কে বলা চলে, তার নিছক কবি-রূপের চেয়ে, সব মিলিয়ে তার বাক্‌শিল্পীসত্তার পরিচয়ই উপন্যাসে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

আর তাই 'চার অধ্যায়'-এ কেবল কাব্যময়তা নয়, ভাষার সামগ্রিক কারুশিল্পই উপন্যাসের কাহিনি-পরিবেশ-সম্বলিত জগৎকে ছাড়িয়ে যায় যেন। সংলাপের ভাষার চমক লাগানো মোহময় খন্ড সৌন্দর্যের জালে মুগ্ধ পাঠকের দৃষ্টি বারবার আবদ্ধ হয়ে পড়ে, উপন্যাসে প্রত্যাশিত জীবনের

সমগ্রতার বোধ পাঠকচিত্তে সঞ্চারিত হতে বাধা পায়। আর এখানেই 'চার অধ্যায়'-এর ভাষা সংলাপের প্রকৃত সীমাবদ্ধতা।

প্লট নির্মিতি

কাকা ও কাকিমা যখন এলার আচরণে 'অসহিষ্ণু' হয়ে 'বয়সোচিত দুযোর্গের আশঙ্কা' করেছিলেন, তখন ঘূর্ণি হাওয়ার মতো আবির্ভাব হল ইন্দ্রনাথের, এই ঘূর্ণির তালে তালে ঝঙ্কৃত হল নাট্যকের দ্রুতসঞ্চারী গতি। এর পর থেকে কাহিনির উপর নেমে এসেছে নাটকের সর্বগ্রাসী অধিকার।

এটি একটি সর্ট নভেল। বড় পটভূমির উপরে তৈরী হলেও এর কেন্দ্রীয় বিষয়, দুই নর নারীর সম্পর্কের সূচনা বিকাশ ও পরিণতি একটি বৈচিত্র্যহীন ক্ষুদ্র আবর্তে সীমাবদ্ধ।

ভূমিকা অংশে রয়েছে (১) এলার স্বভাবের বীজ নির্দেশ করা, যাতে তার বর্তমান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে; (২) এলা কিভাবে বিপ্লবী দলে এল, তা জানানো। চার অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায় ১১ পৃষ্ঠা। এলার সঙ্গে কথাবার্তায় আদর্শ বনাম প্রেম ঘটিত সমস্যা বিষয়ে এবং কানাই গুপ্তের সঙ্গে কথায় তার রাজনীতি, স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য জানা গেল। দ্বিতীয় অধ্যায়:- ১২.৫ পৃ:। অন্তু-এলার প্রেমে আছে অতীতের স্মৃতি,ভালোবাসার সংকট,আছে বিতর্ক, সমাজে ও জীবনে নারী-পুরুষের স্থান নিয়ে। তর্কের বিষয়-সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি এবং দলীয় সংগঠন। অতীন চূড়ান্ত ভাবে এই মত ও পথের বিরোধী। তৃতীয় অধ্যায় ১১ .৫ পৃ: অতীনের গুপ্ত আশ্রয় হল ঘটনাস্থল। এখানে দুটি সাক্ষাৎকার আছে-(ক) অন্তু-এলা এবং (খ) এলা-ইন্দ্রনাথ। অন্তুর রাজনীতিবোধ, বিপ্লবপন্থায় আস্থা না থাকলেও সে আজও সে দলে আছে তার ব্যাখ্যা, সে শুধু কবি-হৃদয় প্রেমিক নয়, অন্য ভাবনায় পীড়িত। তার নিদর্শন আছে এই অধ্যায়ে। চতুর্থ অধ্যায়- ৮ পৃ:। অন্তু-এলার চিত্তের উত্তাপ, চির বিচ্ছেদের পটভূমিতে তীব্রতা বেড়েছে। আছে শ্বাসরোধী বর্তমানের মধ্যে পুরনো স্মৃতির সিঞ্চন। অতীনের হাতে এলার আসন্ন মৃত্যুর নাট্যগর্ভ ইঙ্গিতে কাহিনি শেষ হয়েছে।

যোগাযোগের কাহিনিকে তিনি নাটকীয় রূপ দিয়ে প্রকাশিত করেন মালঞ্চ-কে ও নাট্যীকৃত করেন তবে সে গ্রন্থ অপ্রকাশিত। 'চার অধ্যায়' শিল্পরূপে প্রায় একটি নাটক, এর আখ্যান আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত নাটকীয়। তার গতি যেমনি ক্ষিপ্র, তেমনি প্রায় পরিপূর্ণ কাহিনি সংলাপে বিন্যস্ত।

উপন্যাসের কাহিনি চারটি নাট্যরূপের অধ্যায়ে বর্ণিত, তার প্রথমেই একটি 'ভূমিকা', তারপর 'অধ্যায়' নামাঙ্কিত চারটি পরিচ্ছেদ। পাত্র-পাত্রীর সংখ্যাও সীমিত, ইন্দ্রনাথ, এলাবতী, অতীন্দ্র ও কানাই মূল চরিত্র, পার্শ্ব চরিত্র বটু ও অখিল। সশস্ত্র বিপ্লববাদকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির কাহিনি আবর্তিত। ইন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের ঋত্বিক, এলা তার কর্মযজ্ঞের সমিধ। ভূমিকায় এলার বিচিত্র ইতিহাস।

ভূমিকার পর প্রথম অধ্যায়ের রঙ্গমঞ্চ ''সামনে সদর রাস্তা, বাঁ পাশ দিয়ে গেছে গলি''। এমন একটি স্থানের একটি চায়ের দোকান। কবির সমকালীন নাট্যকার জর্জ বার্ণাড শ'র রীতিতে দোকানের মালিক ও দোকানের সাজ-সজ্জা অনুপুঙ্খ বর্ণিত।

চার অধ্যায়ের মূল কথাবস্তু এলা-অতীনের প্রেম। যৌবন প্রেমের মাধুর্যেই বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বদেশ ব্রতের নিগড় বাঁধা জীবনের মুক্তি নেই। আত্মার এ বন্দীদশা দেশের কোন্ মঙ্গল আনবে? হৃদয়হীন ইন্দ্রনাথের কাছে ভালোবাসা বসন্ত রোগের মতো। তাই ভালোবাসার জগৎ থেকে উমার নির্বাসন, দাম্পত্যের গঙ্গা যাত্রায় অন্ত্যেষ্টি সৎকারে।

মানুষের ব্যক্তিত্বকে, স্বাতন্ত্র্যকে হত্যা করার মত নিষ্ঠুরতা বুঝি আর কিছুই নেই। 'চার-অধ্যায়' সেই ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হত্যার কাহিনি। স্বদেশী কর্তব্যের জগন্নাথের রথের তলায় ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব নিষ্পেষিত হয়ে যায়। অন্ধশক্তির কাছে আত্মসমর্পণের এক ভয়াবহ ছবি ফুটে উঠেছে 'চার-অধ্যায়ে'। অতীন বলেছে - 'দেশ উপাধি দিয়ে যার মধ্যে আমার বাসা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল তোমাদের দলের বানানো দেশে -অন্যের পক্ষে যাই হোক আমার স্বভাবের পক্ষের সেই

তো খাঁচা'। স্বদেশী কর্মকাণ্ডের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে অতীন বলেছে, 'মন্ত্রদাতা বললেন, সকলে মিলে একখানা মোটা দড়ি কাঁধে নিয়ে টানতে থাকো দুই চক্ষু বুজে -এই একমাত্র কাজ। হাজার হাজার ছেলে কোমর বেঁধে ধরল দড়ি। কত পড়ল চাকার তলায়, কত হল চিরজন্মের মতো পঙ্গু। এমন সময় লাগল মন্ত্র উলটোরথের যাত্রায়। ফিরল রথ। যাদের হাড় ভেঙেছে তাদের হাড় জোড়া লাগবে না, পঙ্গুর দলকে ঝাঁটিয়ে ফেললে পথের ধুলোর গাদায়'।

উপন্যাসে বন্দী প্রমিথিউসের মতোই অতীনের কণ্ঠে আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে আত্মনিপীড়ন ও ব্যক্তিত্ব নিষ্পেষনের বিরুদ্ধে। আত্মার এই পরাভব ও গ্লানির মধ্য দিয়ে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। অতীন তাই বলেছে — 'দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণ বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা পৃথিবী শুদ্ধ ন্যাশানালিস্ট আজকাল পাশব গর্জনে ঘোষণা করতে বসেছে, তার প্রতিবাদ আমার বুকের মধ্যে অসহ্য আবেগে গুমরে গুমরে উঠছে- এই কথা সত্য ভাষায় হয়তো বলতে পারতুম, সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকোচুরি করে দেশ-উদ্ধার চেষ্টার চেয়ে সেটা হত চিরকালের বড়ো কথা।'

অতীন আরও বলেছে- ''পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে তাদের পেট্রিয়টিজম কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকো। মিথ্যাচরণ, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতা লাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের টেনে নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়''।

বলা বাহুল্য অতীনের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের বাণীই ধ্বনিত হয়েছে।

একুশ শতকেও চার দশকের রাজনীতির চরম মূল্যায়ণ আজও হয়নি। সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে একটি সুস্পষ্ট চিন্তা ছিল এবং সে চিন্তাধারা তা সে যত অপ্রিয়ই হোক না কেন, প্রকাশে তিনি অকুণ্ঠিত ছিলেন এই সত্যটুকুই তার উপন্যাস তিনখানিতে আমরা পাই। সামগ্রিকভাবে এবং নীতিগতভাবে উচ্ছ্বাসসর্বস্ব রাজনীতি বা সন্ত্রাসবাদের পঙ্কিলতাকে সোচ্চার নিন্দা করলেও ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ বাংলার মরণ-পাগল দামাল বিপ্লবী যুবশক্তির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, 'ছোট ও বড়ো' প্রবন্ধে তাঁর এই শ্রদ্ধা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে- ''কিন্তু একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, দেশভক্তির আলোকে বাংলা দেশে কেবল যে চোর ডাকাতকে দেখিলাম তাহা নহে, বীরকেও দেখিয়াছি। মহৎ আত্মত্যাগের দেবী শক্তি আজ আমাদের যুবকদের মধ্যে যেমন সমুজ্জ্বল করিয়া দেখিয়াছি এমন কোনো দিন দেখি নাই। ইহারা ক্ষুদ্র বিষয় বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়া প্রবল নিষ্ঠার সঙ্গে দেশের সেবার জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এই পথের প্রান্তে কেবল যে গবর্মেন্টের চাকরি বা রাজসম্মানের আশা নাই, তাহা নহে, ঘরের বিজ্ঞ অভিভাবকদের সঙ্গেও বিরোধে এ রাস্তা কন্টকিত । আজ সহসা ইহাই দেখিয়া পুলকিত হইয়াছি যে, বাংলাদেশে এই ধনমানহীন সংকটময় দুর্গম পথে তরুণ পথিকের অভাব নাই। উপরের দিক হইতে ডাক আসিল, আমাদের যুবকেরা সাড়া দিতে দেরি করিল না ; তারা মহৎ ত্যাগের উচ্চ শিখরে নিজের ধর্মবুদ্ধির সম্বল মাত্র লইয়া পথ কাটিতে কাটিতে চলিবার জন্য দলে দলে প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা কংগ্রেসের দরখাস্ত পত্র বিছাইয়া আপন পথ সুগম করিতে চায় নাই ; ছোটো ইংরেজ ইহাদের শুভ সংকল্পকে ঠিকমত বুঝিবে কিংবা হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে, এ দুরাশাও ইহারা মনে রাখে নাই।''[১২]

সেদিনের পরাধীন ভারত আজ স্বাধীন সার্বভৌমত্বের গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতার তিন দশক পরেও ভারতীয় রাজনীতির এই দেউলিয়া স্মৃতি আমাদের নতুন করে ভাবনার পথ দেখায়। দুর্নীতি, পারস্পরিক বিরোধ, হিংসাত্মক প্রবণতা, বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা প্রভৃতিতে দীর্ণ আজকের ভারতবর্ষের মূল সমস্যা চরিত্রের অবক্ষয়। এই অবক্ষয় তো একদিনে ঘটে না। দীর্ঘদিন তিলে তিলে আমাদের চরিত্রের ভিত্তিভূমি শিথিল হয়েছে, দুর্বল হয়েছে।তাই জাতীর সামগ্রিক চারিত্রিক সঙ্কটের কারণ অনুসন্ধানে রাজনৈতিক নীতিবোধের প্রশ্নকে উপেক্ষা করা চলবে না। সত্যদ্রষ্টা কবি রবীন্দ্রনাথ

তাঁর 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবাহে বলেছিলেন- 'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে ? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে ? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিস্ফলতাকে বহন করতে থাকবে ?'[১৩]

রবীন্দ্রনাথ আর এক জায়গায় বলেছেন : "আমিও দেশকে ভালোবাসি, তা যদি না হত তাহলে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের নয়, সে দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই, এবং সকলের ভাগ্যেও ফলেও না ; কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তাহলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করিনি"।

"যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক-আমি
তোমায় ছাড়ব না মা
-মাগো আমি তোমার চরণ করব শরণ।
আর কারো ধার ধারবো না মা।"

প্রত্যক্ষ রাজনীতির আঙিনায় তিনি বেশিদিন থাকতে পারলেন না। তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। ১৯০৬-এর এপ্রিলে তিনি লিখলেন :

'বিদায় দেহ ক্ষমো আমায় ভাই,
কাজের পথে আমি তো আর নাই।'

'বলাকা'তে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন "...... ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
ন হেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
পথে পথে অপিক্ষেছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ-
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কন্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্ত সর্পফণা।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ-
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।"
কিংবা,
"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথের ৭০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বক্সা দুর্গে আটক রাজবন্দীরা গুরুদেবকে আবেগে ভরপুর এক অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন। রাজবন্দীদের অভিনন্দনবার্তা পেয়ে অভিভূত কবি যে প্রত্যভিবাদন "বক্সা দুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি" পাঠান তা আজ ইতিহাস হয়ে আছে।

" নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর উর্দ্ধ স্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।

....

'অমৃতের পুত্র মোরা'- কাহারা শুনাল বিশ্বময়।

আত্ম-বিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল রে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়।

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায় তাঁর 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর, সত্য গুপ্ত এবং আরও কয়েকজন বিপ্লবীর আলাপের এক স্মৃতিলিপি লিপিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "............ হিংসা বা অহিংসা বড় কথা নয়। বড় কথা হল স্বাধীনতা লাভ।"[১৫]

নানা রঙের মেলা

শিল্পসৃষ্টির মূল কথা প্রকাশ। প্রকাশের সাধনাই শিল্পীর জীবনসাধনা! শিল্পীর মুক্তমন। সৃষ্টির নির্মেঘ আকাশে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ডানায় ভর দিয়ে তার মুক্তপক্ষ স্বচ্ছন্দ বিচরণ। 'সহৃদয় হৃদয় সংবাদী' আনন্দ সন্ধানই তাঁর অন্বিষ্টি। আবার সেই নিগূঢ় আনন্দের লীলাকে রূপে রেখায় গানে কথায় অন্যের অন্তরে সঞ্চারিত করে সহস্রদল পদ্মের উদ্ভাসেই শিল্পের পূর্ণতা। সাহিত্য, ছবি, গান এই পূর্ণতারই নানা রূপ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, যে জিনিস দেখে আনন্দ পাওয়া যায়, অন্যের অন্তরে যখন সে আনন্দের সঞ্চার ঘটানো যায় তখন সেটাই আর্ট। তা, ছড়িয়ে রয়েছে কী ছবিতে, কী গানে, কী সাহিত্যে। কথা যখন হার মানে, সুর যখন হারিয়ে যায় শব্দ ও সুরের সীমা পেরিয়ে মানব মনের নিগূঢ় উপলব্ধি যখন প্রকাশের পথ খোঁজে, চিত্রকলাই তখন শিল্পীর অবলম্বন হয়ে ওঠে। রেখা, রঙ, বর্ণময় অভিব্যক্তির সীমায়, অসীম নৈর্ব্যক্তিককে, রূপকে অতিক্রম করে রূপাতীত, রূপদক্ষকে আবিষ্কারের নেশায় পেয়ে বসে তাকে। রূপের মাধুরীর অনুসন্ধান চলে প্রতিপলে। চোখের আলোয় চোখের বাহিরকে দেখার ব্যাকুলতায় অশান্ত হয় তাঁর শিল্পীমন।

১৯১৩-র কিছু আগে থেকেই বিভিন্ন ছত্রের কেটে দেওয়া শব্দগুলিকে রেখার সাহায্যে সংযুক্ত করে ফুল, লতা, পাতার নকশা রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যায়, জীবনের শেষপর্বে এসে সৃষ্টির নতুন ক্ষেত্রে পদার্পণের বীজ নিহিত ছিল তাঁর বহুমুখী প্রতিভার অন্তস্থলে।

সচেতনভাবে ১৯২৮-এ যদিও তিনি চিত্ররচনার কাজ শুরু করেছেন, তবুও বলব এর আগেই শিলাইদহ পর্বেই এর সূত্রপাত। একান্তভাবে আত্মমগ্ন হয়ে মাত্র ১১-১২ বছর সময়ের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন প্রায় আড়াই হাজার ছবি - তাঁর কবিতা বা গানের সমানুপাতিকে। এ প্রসঙ্গে প্রতিমাদেবী বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন তখন রূপের রেখা বন্যার মত বেড়িয়ে আসত তাঁর তুলির টানে। অনেক সময় দিনে চার-পাঁচখানা ছবিও তিনি শেষ করতেন। তবুও অতৃপ্ত থাকত কবির হৃদয়।

চার অধ্যায় উপন্যাসের কয়েকটি জায়গায় নানা রঙের বিচিত্র প্রয়োগ নিচে উল্লেখ করা হল।

১) বেগনি রঙের খদ্দরের শাড়ি গায়ে, সেটাতে মলিনতা অব্যক্ত থাকে, তাই নিভৃত ব্যবহারে তার অনাদৃত প্রয়োজন।[১৬]

২) এলার হাতে একজোড়া লালরঙ-করা শাঁখা,[১৭]

৩) হাতির দাঁতের মতো গৌড়বর্ণ শরীরটি আঁটসাঁট,[১৮]

৪) খদ্দরের সবুজ রঙের চাদরে ঢাকা সংকীর্ণ লোহার খাট........।[১৯]

৫) দেয়ালে ঝুলছে কোনো একটি দূরবর্তী কালের ফটোগ্রাফের প্রেতাত্মা, ক্ষীণ হলদে রেখায় বিলীনপ্রায়।[২০]

৬) আজও চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি তোমার সেই ব্রাউন রঙের শাড়ি ;[২১]

৭) **অতীন :** সেই কল্পনার তুলির ছোঁওয়ায় জাদু লেগেছে মেয়েদের প্রকৃতিতে, তারা সংসারের ক্ষেত্রে এনেছে আর্টিস্টের সাধনা, রঙে সুরে আপন দেহে মনে প্রাণে অনির্বচনীয়কে প্রকাশ করছে। .... ঐ যে তোমার শাঁখের মতো চিকন রঙের কণ্ঠে সোনার হারটি দেখা দিয়েছে ওর জন্যে তোমাকে নোটবই মুখস্থ করতে হয় নি।[২২]

৮) গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি ফিকে-সবুজ গাঢ়-সবুজ হলদে-সবুজ ব্রাউন-সবুজ রঙের গুল্মে বনস্পতিতে জড়িত নিবিড়তা, ...[২৩]

৯) .... কালো পাড় দেওয়া তসরের শাড়ি,........[২]

উল্লেখপঞ্জী

১) রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, প্রমথনাথ বিশী
২) রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা: নীহাররঞ্জন রায়
৩) সংগ্রহ: রবীন্দ্র সৃষ্টির অলংকরণ, অভীককুমার দে
৪) চরকা, কালান্তর
৫) নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতির্ময় ঘোষ
৬) কবিতা পত্রিকা, সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু,১৩৫০, পৃ. ৪৫ (২৯ চৈত্র ,১৩৪১ সালে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র
৭) রবীন্দ্রজীবনী-চতুর্থ খন্ড ,প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৪
৮) The Art of Reading the Novel ip. Freund. P. 229
৯) চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য
১০) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১১) শ্রী অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্রাংশ, ২৯ চৈত্র, ১৩৪১দ্র. চিঠিপত্র (১১শ খন্ড) পৃ. ১৫৪
১২) ছোট ও বড়ো, কালান্তর
১৩) সভ্যতার সঙ্কট, কালান্তর
১৪) সুপ্রভাত
১৫) রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী, পঞ্চানন সাহা, পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রস্মরণ সংখ্যা, ১৪০৬
১৬) চার অধ্যায়, ২য় অধ্যায়
১৭) ঐ
১৮) ঐ
১৯) ঐ
২০) ঐ
২১) ঐ
২২) ঐ
২৩) চার অধ্যায়, ৩য় অধ্যায়
২৪) ঐ

।। পথের শেষ কোথায় ।।

যে কোন কথাসাহিত্য বস্তুত সৃষ্টির সৃষ্টি । এই পৃথিবী তার চতুর্দিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিত্য নতুন সৃষ্টির গতিতে এগিয়ে চলেছে। মানুষ, তার অস্তিত্ব সমাজ, ইতিহাস, আকাশ-মাটি-জল পরিব্যপ্ত অসামান্য প্রকৃতি পরিবেশ এক অমোঘ বিধানে, প্রবলতম বেগ-প্রতিবেগে নিত্য নতুন সৃষ্টির ধর্মে প্রাণবন্ত, প্রাগ্রসর। একজন সচেতন প্রতিভাবান লেখকের কলমে এই সৃষ্টিই আর এক সৃষ্টিতে ধন্য হয়ে ওঠে। লেখক নতুন জগত, মানুষ, সমাজের কথার সৃজনে হন বিভোর, গভীর-নিমগ্ন নব-ভাষ্যকার। এমন লেখকের হাতে এক একটি রচনা এই বিচিত্র পৃথিবীর অস্তিত্বেরই যেন বা খন্ড খন্ড অংশের নির্যাস হয়ে ওঠে। স্বভাবী পাঠক বাইরের জগত থেকে আর এক নতুন জগতে প্রবেশ করেন। এই নতুন জগত পরিচিত বিশেষকে দেখায় নির্বিশেষ করে।

একাধিক উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ এই বিশেষকে নির্বিশেষ করে দেখিয়েছেন। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চোখে রবীন্দ্রনাথ অম্লান আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমাদের পরিচয়-আমাদের জাতির আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের, আমাদের সংস্কৃতি ও সাধনার। তিনি এই বিশেষ দেশের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতিকে, ইতিহাস-ধর্ম-মানুষ ও কালকে গ্রহণ করে অতিক্রমণে বিস্ময়কর শিল্পী হয়েছেন উপন্যাসে। উপন্যাসে নিত্য নতুন বিষয় গ্রহণ, বিষয়ানুগ মানুষকে যথাযথ চিত্রণের মধ্যদিয়ে তিনি শিল্পীর জগতে হয়েছেন সর্বভারতীয়। আর এই সর্বভারতীয়ত্ব জাতিকতা থেকে বৃহৎ জাত্যাভিমানে সাবলীল উত্তরণ-সমস্তই সম্ভব হয়েছে তাঁর স্ব-কালের কারণেই। যে কোন একজন সচেতন শিল্প-প্রাণ মানুষকে গড়ে তোলে তাঁর কাল। কাল এখানে সীমা এবং অসীম-দুই অর্থেই গ্রহণীয়।

মলাটের বুকে অথবা প্রচ্ছদে কিংবা রচনায় লেখকেরও আগে 'আমি' থাকি। সর্বক্ষেত্রেই (বস্তু বা ভাব) ঘটে বলে আমার প্রথম পরিচয় সর্বনামেই ব্যক্ত করি। আসলে অন্যের কাছে আমি কখনই সর্বনামে আদৃত হইনা বলে, এ আমার নিতান্তই নিজস্ব, একান্ত। যদি ডাকলেই আমার সাড়া পাওয়া যেত তাহলে মাহাত্ম্যের বৈভব ধূলি নীলিমায় ব্যাপৃত হত না। আমি যথার্থ হলেই পরিচিত হই, সাড়া দিই, তোমাদের সঙ্গে সারাক্ষণ অনিয়ন্ত্রিত জগত- সায়রে অবগাহন করি। আমি তোমাদেরই একজন। কখনো প্রাত্যহিকতায়, কখনো ভিজে রৌদ্রের আঘ্রাণে, কখোনো ইতিহাস পর্যটনে, ভৌগোলিক সীমা ভেঙ্গে পারাবারে, আবার কখনো আভাসে-ইঙ্গিতে অনর্গল বকে যাই, চিত্রিত হই, ভাঙি, গড়ি, সৃষ্টি রহস্যের বর্ণালি গ্রহণ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। আমি এক হয়েও বহু অনন্ত। তাই তোমাতে আমাতে সবাতে আমার অভিসার। এ যেন নামকরণের আত্ম পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ উপন্যাসের নামকরণে কবিত্বের ছোঁয়া পাই। ব্যঞ্জনা বা প্রতীকতার সিঁড়ি বেয়ে উঠেও তা খুঁজে নেয় কবিত্বের অলিন্দ। ধ্রুপদী সংগীতে যেমন আরোহণ অবরোহণ, আলাপ, বিস্তার, তান-এই ক্রমিক পর্বের পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির ভিন্ন ভিন্ন নামকরণের কবি-প্রাণ- ছোঁয়া-তে।

কাব্যশাস্ত্রীরা বলেন 'অপারে কাব্যসংহারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।' প্রজাপতি ব্রহ্মার মতোই সাহিত্যস্রষ্টা নরনারী সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বিচিত্র স্বভাব ও মেজাজের এবং প্রেম, সাংসারিক ও দেশের সমস্যা ঘিরে চরিত্রগুলি চিত্রিত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রমণী চিত্রপটের বৃহৎ চিত্রশালার মধ্যেই কবি রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যায়। বাঙালী সমাজের সংকীর্ণ পরিসরে জীবনের বিচিত্রমুখী বিস্তার, ওঠা-নামা কম, তবু রবীন্দ্রনাথের 'নব নব বস্তু নির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা'- এরই মধ্যে উপাদান সংগ্রহ করেছে। সঙ্কুল বহির্ঘটনায় অভাবকে রবীন্দ্রনাথ দুভাবে পূরণ করেছেন: (ক) নিসর্গ প্রকৃতি ও ষড় ঋতু বৈচিত্র্যের রসধারায় কাহিনি ও চরিত্রকে অভিস্রাত করে। (খ) নরনারীর অপার জটিল, গূঢ় মনোজীবনের বিশ্লেষণ বা উদ্ভাসনে। বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব লেখকই- সে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর থেকে বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমরেশ বসু কথা সাহিত্যে চরিত্রের ভাব ও ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য মারাত্মকভাবে নিসর্গ প্রকৃতির প্রসঙ্গ এনেছেন।

চরিত্রের চেতনাকে প্লাবিত করেছে-প্রভাবিত করেছে সত্য কিন্তু সে প্রভাব চরিত্রের অন্তর্গত স্বভাবের বিরুদ্ধে নয়। সে চরিত্র হঠাৎ নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুন্ডলা যখন মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নিরাসক্তভাবে বলে- 'বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে পাইলেই সুখ' কিম্বা তারাশঙ্করের নিতাই কবিয়াল যখন গ্রীষ্মের দুপুরে লাইনের বাঁকে ঠাকুরঝিকে বিন্দুর মতো দেখতে পেয়ে গেয়ে ওঠে-'আহা ভালোবেসে এই বুঝেছি তখন' সে চরিত্র চকিত করে না- তার স্বভাবটিকেই স্পষ্ট করে মাত্র। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির পটভূমিকায় চেনা চরিত্রগুলি হঠাৎ পুরোপুরি নতুন এক মানুষ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রকৃতি প্রেমের উন্মেষে বা বোধনে সাহায্য করেছে যেখানে, সেখানে সে শান্ত, স্নিগ্ধ, আকুল অনুভবের আবেশ সৃষ্টিকারী। প্রেমের জটিলতা কিম্বা বিরহ-বেদনাকে করেছে সেখানে তীব্র-দুঃসহ, অথবা মিলনের আকুলতায় চঞ্চল সেখানে প্রকৃতি প্রয়শ শ্রাবণ রাত্রির মত্ত মুহূর্ত। আবার কখনো অতলান্ত বিচ্ছেদের শূণ্য বাসরে মেদুর স্মৃতিবাহী নয়তো সান্ত্বনাদায়ী প্রকৃতি, বাংলাদেশের সজল-শ্যামলতায় সাধারণ-জন-জীবনের মাঝখানে ঐশ্বর্যহীন আটপৌরে কিষাণীর মতো।

নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। ঘর-বাহির, ভবন- ভুবনের উনিশ শতকীয় দ্বৈত তার মধ্যেও ছিল, কিন্তু কবি এখানে থামেন নি, তাই মেয়েদের ভূমিকার ঐ দ্বৈত চিন্তাকে তিনি তাঁর সচেতন ভাবনায় কাটিয়ে ওঠেন জীবনের শেষ পর্বে : রূপনারায়ণের কূলে জেগে ওঠার মতোই। বঙ্কিম প্রফুল্লকে পরিবার থেকে বাইরে এনে, আবার পরিবারে ফেরৎ পাঠিয়ে তারপর এক অথরিয়াল হস্তক্ষেপে এক বৃহত্তর সম্ভাবনার মধ্যে নিয়ে আসেন। রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রীর পত্রে' ঐ পরিবারে নারীর আপন সত্তা ও অধিকারের বিকাশ দেখতে পান নি। আসলে বঙ্কিম যে য়ুটোপিয়ায় দুলেছিলেন পরের দু-তিন দশকেই সে য়ুটোপিয়ার অবাস্তবতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। জাতীয়তাবাদী যে রাজনীতি ঔপনিবেশিকতার ক্রিটিক হয়ে উঠেছিল, তা নারীর যে মুক্তির কথা ভাবে, সেটি আসলে আর এক বন্ধন: পরিবার, শ্রেণী, বাইরের জগতের ভিত অক্ষুন্ন রেখেই নারীকে এক মাতা ও রাজনীতির মাধ্যম ভাবা, যে রাজনীতিও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত। তাই 'স্ত্রীর পত্র'-র মৃণাল, পুরুষের অভ্যাসের অন্ধকার থেকে 'পরিবার' নামক স্পেস থেকে মুক্তি চাইল- কোথায় ? ''আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ''-অর্থাৎ উন্মুক্ত প্রকৃতিতে। সমাজে নয় কিন্তু। কারণ রবীন্দ্রনাথ জানতেন ১৯১৪-য় ঐ সমাজ নেই, বঙ্কিমের আহ্বান নিতান্তই একটি শিকড়হীন য়ুটোপিয়া মাত্র। ঐ সময়েই রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ'। ঘরে-বাইরের দ্বৈত তখনও রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ছাড়তে পারেন নি। 'চতুরঙ্গ'-র দামিনী পুরুষ জগৎ-কে অস্বীকার করতে চায়। এই প্রথম একটি নারী চরিত্র দেখা গেল যার স্বাধীনতাবোধে শরীরও অন্তর্ভূক্ত: শচীশ দামিনীকে ভয় পায়। শরীর ও মন মিলিয়ে পূর্ণজীবন দামিনী-শরীরের যন্ত্রনাতেই সে আর এক ইতিহাসহীন অসীমের অনুসন্ধানী, বলা ভালো ঔপনিবেশিক স্পেস থেকে মুক্তির যন্ত্রণায় অন্ধকারের শূন্যতায় লগ্ন হতে চাওয়া শচীশের পদাঘাতের অসুখ বক্ষে ধারণ করে। নারীর এই শরীরী মুক্তির কথা রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে বারবার বলতে চেয়েছেন-কিন্তু এই বলাতে রয়েছে ছবির ভাষা, কাব্যের ছন্দযতি। যে সমুদ্রের সামনে মৃণাল দাঁড়ায়, দামিনী নিজেই সেই সমুদ্র। 'চার অধ্যায়'-এ এলা প্রেমের তীব্রতায় কানাগলির ইতিহাস পেরিয়ে যেতে চায়। এলা সেই তীব্র প্যাশনের ভালোবাসায় মরতে চায়। এ ভালোবাসা নারীর স্বাধীন স্পেস। এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা যেমন সমাজবদ্ধ কবির অভিক্ষেপ তেমনি এই আকাশেই ইচ্ছের ভাষা, উদ্দেশ্য, বন্ধমুক্তি বলাকা হয়ে কাব্যাকাশে পাড়ি দিয়েছে।

একটা উপন্যাসের বিষয় নির্মিতির সঙ্গে সঙ্গে যখন চরিত্র সৃজন তারই অনুসঙ্গে অলংকার, প্রতীক এবং সিনটেক্সের অথবা সংলাপের বহুস্বরিক অভিযোজন লক্ষ করা যায় তখন সহজেই অনুমেয় হয় এই শিল্পী শুধুমাত্র আইডিয়ালিজম, সোসাইটি, সাইকোলজিক্যাল ওয়ার এগুলিকে প্রাধান্য দেননি, সেখানে কবিত্বের আয়োজন ঘটেছে পরতে পরতে। এই নতুনত্বের অথবা স্বাতন্ত্র্যের অভিমুখটি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসকে 'সম্ভাব্যতা'য় সূত্রে সাম্প্রতিক করে তুলেছে। তাই এই ২০০৭-এও যেখানে অর্থনীতি ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদকে সামনে রেখে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দরজা গুলোকে বাজারে মুক্ত করে দিয়েছে, সেখানে মানব চরিত্রের মনস্তত্ত্ব আরও বেশি বস্তুতান্ত্রিক অথবা চাহিদার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।

এই বাজারের প্রভাবে চরিত্র সেলফ্-সেন্টারড্, গন্ডিবদ্ধ-তা, একান্তই নিজের ব্যক্তি জীবনের এরিয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ছুটে চলা মানুষগুলো ক্লান্ত হয়, হাঁপিয়ে ওঠে, কিন্তু পুঁজির নিয়মানুসারে তারা আবার নির্দিষ্ট বলয়ের মাধ্যাকর্ষণে সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে। এখানেই রবীন্দ্র-উপন্যাসেই নির্ঝরিণী মনকে ভেজায়, চরিত্রগুলি এক অসম্ভব সূক্ষ্ম টানে ফেলে আসা অতীতের ঐশ্বর্যকে স্বীকরণে মানুষের মনের স্বপ্ন দেখাগুলোকে ফিরিয়ে আনে। রবীন্দ্র- উপন্যাসের সমাজে দেশ আছে, রাজনীতি আছে, নারীর মুক্ত মন ও শরীরের কথা আছে, ঔপনিবেশিকতার দূরূহ শাসন থেকে মুক্তির বাসনা আছে-কিন্তু এগুলি কখনো উচ্চকিত মেজাজের স্বরগ্রামে রুক্ষ, পাথুরে, বন্ধুর হয়ে ওঠেনি। শস্য শ্যামল বাংলাদেশের বুকে, নিসর্গের ছোঁয়ায়, ভাষার পেলব-ঋজুতার সংমিশ্রনে, এপিগ্রামের ঔজ্জ্বল্যে যেন এক কবি-প্রতীতির স্থানটিকে পাঠক মনে ধরিয়ে দেয়। এই শৈলী তাই সাম্প্রতিক লেখকদের কাছে আরাধ্য হয়, স্বাতন্ত্র্যে তা ভবিষ্যতের পাঠ্যও হয়ে ওঠে। কবি-কথাকারের স্বপ্ন অধ্যাসে রবীন্দ্র- উপন্যাস এখনো এবং হয়তো পরেও সাম্প্রতিকের স্থানটিকে বারবার ধরিয়ে দেয় বা দেবে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত	—	কাব্য জিজ্ঞাসা
অরবিন্দ পোদ্দার	—	রবীন্দ্র মানস, রবীন্দ্রনাথ / রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব
আদিত্য ওয়াদেদার	—	রবীন্দ্র সাহিত্যে সমালোচনার ধারা
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়	—	কবিগুরু
অমিতাভ চৌধুরী	—	একত্রে রবীন্দ্রনাথ,১ম, ২য়, সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	—	রবীন্দ্র বিতান
অশ্রুকুমার সিকদার	—	বাক্যের সৃষ্টি ঃ রবীন্দ্রনাথ
আবুসয়ীদ আইয়ুব	—	আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, পথের শেষ কোথায়, পান্থজনের সখা
গোপালচন্দ্র রায়	—	রবীন্দ্রনাথের ছিন্ন পত্রাবলী
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী	—	রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প, রবীন্দ্রনাথ বাংলা কথাসাহিত্য ঃ নানা দর্পণে
জ্যোতির্ময় ঘোষ	—	রবীন্দ্র বহ্নিলোক ও ঝড়ের পাখিরা নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টি-লোক,রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়
জলি মল্লিক বন্দ্যোপাধ্যায়	—	বাংলা মহাকাব্যিক উপন্যাস
জীবেন্দ্র সিংহরায়	—	রবীন্দ্র নির্মাণ ঃ কবিতার অবয়ব
দেবেশ রায়	—	রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদিগদ্য
দীপেন চট্টোপাধ্যায়	—	রবীন্দ্র বিরোধী সমালোচনা
নেপাল মজুমদার	—	রবীন্দ্রানাথ ঃ শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গ
নরেশ গুহ	—	কবির চিঠি কবিকে
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	—	কথাকোবিদ রবীন্দ্রানাথ
নীহাররঞ্জন রায়	—	রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা
পূর্ণেন্দু পত্রী	—	আমার রবীন্দ্রনাথ
প্রমথনাথ বিশী	—	রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিচিত্রা
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	—	রবীন্দ্র জীবনী, ১-৪ খণ্ড
বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়	—	রবীন্দ্র নন্দন তত্ত্ব
বুদ্ধদেব বসু	—	রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য
ভবতোষ দত্ত	—	রবীন্দ্র চিন্তা চর্চা
ভূদেব চৌধুরী	—	রবীন্দ্র উপন্যাস ঃ ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বাংলা-সাহিত্যের ইতিকথা (৩য় পর্যায় রবীন্দ্রযুগ)
রবীন্দ্র গুপ্ত	—	উপন্যাসে বাস্তবতা রবীন্দ্রনাথ
রণেন্দ্র নারায়ণ রায়	—	ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ
শঙ্খ ঘোষ	—	এ আমির আবরণ, নির্মাণ আর সৃষ্টি,ছন্দোময় জীবন
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	—	বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড

সত্যেন্দ্রনাথ রায়	—	সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
		বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা
অমিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	—	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১-৪ খন্ড
		বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১-৫ খন্ড
শিশির কুমার সিংহ	—	রবীন্দ্র সাহিত্য-মৃত্যুর অমৃত পাত্রে
		সৃষ্টির বৈচিত্র ঃ রবীন্দ্রনাথ
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	বাংলা উপন্যাসের কালান্তর
		রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা উপন্যাসের নব পরীক্ষা
		আলো আঁধারের সেতু ঃ রবীন্দ্র চিত্রকল্প
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য
সুবলচন্দ্র মিত্র(সংকলিত)	—	সরল বাংলা অভিধান
সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	—	উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ
ড. সুমিত্রা পাল	—	রবীন্দ্র উপন্যাসের পাঠান্তর
বাসন্তি মুখোপাধ্যায়	—	রবীন্দ্র কথা সাহিত্যে চরিত্র বাখ্যান
সনন্দা দত্ত	—	রবীন্দ্র কাব্য ভাষা
নন্দ দুলাল বণিক	—	রবীন্দ্র কাব্যে নিসর্গ প্রকৃতি
মানসী দাশগুপ্ত	—	রবীন্দ্র বীথা
অভিক কুমার দে	—	রবীন্দ্র সৃষ্টির অলঙ্করণ
জয়ন্তি সাহা	—	রবীন্দ্রনাথ ঃ উৎস ও প্রবাহ
অসীম রায়	—	রবীন্দ্রনাথ ও তার উত্তরাধিকার
উজ্জ্বলকুমার মজুমদার	—	রবীন্দ্রনাথ ঃ সৃষ্টির উজ্জ্বল স্রোতে
ড. মনোরঞ্জন জানা	—	রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস (সাহিত্য ও সমাজ)

NBU DARJEELING • LIBRARY